মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ

মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ

গৌতম ভদ্র

সুবর্ণরেখা ॥ কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৩ জানুয়ারি

প্রকাশক : ইন্দ্রনাথ মজুমদার
সুবর্ণরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রীমদনমোহন চৌধুরী
শ্রীদামোদর প্রেস, ৫২এ কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : তাপস কোনার

সূচিপত্র

উৎসর্গ

মায়ের স্মৃতির উদ্দেশে

রাজদণ্ড

রাজানুগ্রহ

জাহাঙ্গিরের গরিবি হঠাও

১

ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ : তত্ত্ব ও তথ্য

অ ব ত র ণি কা

লেখার গোড়াতেই কতকগুলো সীমা টেনে নেওয়া দরকার। এখানে 'মুঘলযুগ' বলতে প্রধানত বোঝানো হয়েছে—আকবর থেকে আওরঙ্গজেবের শাসনকালের সময়সীমা, অর্থাৎ খ্রী. ১৫৫৬ থেকে ১৭০৭ পর্যন্ত। 'ভারত' বলতে সাধারণত ধরা হয়েছে দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি রাজ্য, অর্থাৎ বেরার, বিদর, আহমদনগর এবং বর্তমান মহারাষ্ট্র সমেত উত্তর-ভারতের সমতলভূমি ও আসাম বাদে পূর্ব-ভারত। তবে ব্যাখ্যার খাতিরে বা উপকরণের সন্ধানে সময়সীমা বা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আলোচনা আবদ্ধ থাকবে না। অন্যান্য অঞ্চল থেকে ও অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস থেকেও আমরা তথ্য সংগ্রহ করেছি। এই দু'টি সীমা মেনে নেবার কারণ হচ্ছে, এই দুই সীমার মধ্যে মুঘল কৃষি-অর্থনীতির স্বকীয় ও চরম বিকাশ হয়েছিল। আবার এই সময়ে ভারতীয় অর্থনীতিতে অ-কৃষিজাত উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েও একথা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে : মুঘল অর্থনীতির মূলভিত্তি ছিল কৃষি। কারণ কৃষিই ছিল জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপজীবিকা এবং উদ্বৃত্ত সামাজিক শ্রমের বিপুল সম্পদ কৃষি থেকে সংগৃহীত হতো। শোষক ও শোষিতের সম্পর্কের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল কৃষি। তাই বর্তমান রচনার মধ্যে কৃষি-অর্থনীতির ওপর গুরুত্ব

আরোপ করা হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা এসেছে শুধু আলোচনা প্রসঙ্গে। 'শ্রেণী' শব্দটি প্রধানত মার্কসীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। উৎপাদন-পদ্ধতিতে উপকরণের মালিকানার ওপর ভিত্তি করে এক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। এই সম্পর্ক উৎপাদন-ব্যবস্থায় সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্থান নির্ণয় করে; সমষ্টিগতভাবে অনুরূপ বহু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থানকে শ্রেণী বলা হয়।

এখন বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য, তত্ত্বের চেয়ে তথ্যের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা। তাই বলে প্রথম দিকটা একেবারে বাদ দেওয়া হয়নি। প্রবন্ধের পর্বভাগ মোটামুটিভাবে পাঁচটি: মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতিতে গ্রামীণ সমাজের অস্তিত্ব নির্ণয় করা ও স্বরূপ নির্ণয় করা। এবং বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি, অবস্থান ও অধিকার বিচার করা; বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করার পর দ্বন্দ্বের বৈরী ও অবৈরীমূলক দিক আলোচনা করে অর্থনীতিতে সামাজিক সংঘর্ষের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া। কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য কতকগুলো বিষয় আলোচনা করা; সবশেষে একটা সামগ্রিক মূল্যায়ন করা।

এই প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন। ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতি বা অবনতি নিয়ে বহু পুরনো বিতর্ক চালু আছে।[১] এখানে সুনিশ্চিত রায় দেবার আগে মুঘল অর্থনীতির অবস্থা জানা একটা আবশ্যিক শর্ত। আবার সাম্প্রতিক কালে মার্কস-এর 'এশিয়াটিক সমাজ'-এর মডেল নিয়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচুর আলোচনা চলছে।[২] ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় এই তত্ত্বের যথার্থতা কতদূর তথ্য সহযোগে সমর্থিত, সেটার বিচারে মুঘল অর্থনীতির একটি চিত্র বোধহয় জানা প্রয়োজন। তৃতীয় বিচার্য বিষয় হচ্ছে যে, মুঘল অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনো বীজ উপ্ত ছিল কিনা, থাকলে ব্রিটিশের দ্বারা তার বিকাশ কতটা ব্যাহত হয়েছে ও অথবা ব্রিটিশ শাসনে আদৌ নিচের দিকে কোনো গুণগত পরিবর্তন এসেছিল কিনা।[৩] এদিক থেকেও বোধহয় প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামো না জানলে কোনো কিছুই ঠিক করা যাবে না। সবার শেষে, সমাজ-পরিবর্তনের জন্যে বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এই প্রচেষ্টায় কোনো কোনো রাজনৈতিক দল ভারতীয় রাষ্ট্রকে প্রায়ই 'আধা-সামন্ততান্ত্রিক' বলে ঘোষণা করেন। ভারতীয় অর্থনীতির একাংশ প্রাক্-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থারই জীইয়ে রাখা ঐতিহ্যকে বহন করছে, সে-রকম ইঙ্গিতই এই দলগুলির বিশ্লেষণে পাওয়া যায়। শোষণের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বুঝতে গেলে উৎসের সন্ধানে যাওয়া আবশ্যক। এই আবশ্যিকতার তাগিদই বর্তমান আলোচনার সবচেয়ে বড় প্রাসঙ্গিকতা।

ক. গ্রামীণ সমাজ : ব্রিটিশ আমলা ও মার্কস

ভারতের গ্রামীণ সমাজের অস্তিত্বের কথা নিয়ে প্রথম মাথা ঘামাতে শুরু করেন ব্রিটিশ শাসকবর্গ। মেটকাফ, মেইন, এলফিনস্টোন, মনরো, ফিলিপ ফ্রানসিস, শোর প্রমুখ বাঘা-বাঘা শাসকরা এই বিষয়ে মোটা-মোটা রিপোর্ট লিখতে থাকেন এবং এর অস্তিত্বের সপক্ষে বা বিপক্ষে রায় দেন।[৪] এই রকম আগ্রহের পেছনে নানা কারণ ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় (খ্রী. ১৭৭২ থেকে ১৮৩২) পর্যন্ত ব্রিটিশরা জমি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে ব্যস্ত ছিল। সেই সময়ে স্বভাবতই তারা নিজেদের মিত্র সন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে পড়ল। ফলে মুঘলযুগে জমির ওপর বিভিন্ন শ্রেণীর প্রকৃত অধিকার এবং রাষ্ট্র ও বিভিন্ন ধরনের রায়তের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে দেখা দিল। তার চেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পুরনো ব্যবস্থার সঙ্গে কতদূর আপোষ করবে এবং কতটা তাকে ভাঙবে। এটা শুধু রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক প্রশ্নই ছিল না, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ও সাম্রাজ্যবাদের নীতি কি হবে—তার সঙ্গেও জড়িত ছিল। চার্টার অ্যাক্টগুলো ব্রিটেনে আলোচিত হবার সময় ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোম্পানি, মিশনারি প্রভৃতির ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক হতো। ভারতীয় সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখা বা পশ্চিমী জ্ঞানালোকে উদ্বুদ্ধ করার সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি দেওয়া অনেকটা নির্ভর করত 'সুপ্রাচীন' ভারতীয় সভ্যতা ও তার ধারকদের প্রতি একজনের মূল্যায়ন কি হবে, তার ওপর। ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি কি ছিল, সেটাকে বোঝার জন্যে ব্রিটিশ শাসকরা আপ্রাণ চেষ্টা করল; কারণ তাদের শোষণকে সুষ্ঠুভাবে ও সূক্ষ্ম উপায়ে চালানো চাই। সাম্রাজ্যবাদের আপন তাগিদেই গড়ে উঠলো প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর ইতিহাসচর্চা।

মোটামুটিভাবে দেখা যাক, গ্রামীণ সমাজ বলতে ব্রিটিশ শাসকরা কি বুঝে-ছিলেন। এই সমাজের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে—জমিতে যৌথ মালিকানা। মেইনের ভাষায়—"গ্রামীণ সমাজ হলো একটি সংগঠিত ও স্বয়ংক্রিয় পরিবারগোষ্ঠী যারা একটি নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের ওপর যৌথ মালিকানার অধিকারী।"[৫] গোষ্ঠী বা জ্ঞাতি সম্পর্ক গ্রামীণ সমাজকে বেঁধে রাখত। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো—গ্রামীণ সমাজের বিচ্ছিন্নতা। চার্লস মেটকাফের ভাষায় গ্রামীণ সমাজ হলো—"ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র যারা নিজেদের চাহিদার প্রায় সবকিছুই নিজেরাই মেটায় এবং বাইরের কোনো রকম সম্পর্ক থেকে প্রায় মুক্ত।" এই সমাজ হলো স্থাণু। "যখন কোনো কিছুই টেঁকে না, তখনো তারা টিঁকে থাকে। একের পর এক রাজবংশ ভেঙে পড়ে, বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ হয়। কিন্তু গ্রামীণ সমাজ একভাবেই থেকে যায়।"[৬] এর সপক্ষে তাঁদের যুক্তি হলো গ্রাম্য পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব। তাঁদের মতে যেসব

জায়গায় পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব নেই, বরং বংশানুক্রমিকভাবে একজন লোক বিচার-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে সেখানেও সেই বিশেষ ব্যক্তি একটি বিশেষ গোষ্ঠী থেকেই নির্বাচিত হয়। আবার তাঁরা উনিশ শতকের 'ভাইয়াচারা' জমি-ব্যবস্থাকে গ্রাম্য সমাজের অস্তিত্বের প্রমাণ বলে দাখিল করেছিলেন। এই ব্যবস্থায় গ্রামের সমস্ত চাষযোগ্য জমি প্রথম বসবাসকারীদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হতো।

একথা অনস্বীকার্য যে মনরো, মেইন, মেটকাফ প্রমুখ ব্রিটিশ আমলারা তথ্যের চেয়ে অনেক বেশি তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের একটা উপায় ছিল মুয়েরারের গবেষণাকে ভিত্তি করে ভারতে জার্মানির 'মার্ক'-এর * অস্তিত্ব খুঁজে বার করা। কিন্তু সবচেয়ে বড় তাগিদ ছিল ভারতে তাঁদের শাসন পদ্ধতির দর্শনকে সমর্থন করা। গ্রামীণ সমাজকে 'আদর্শায়িত' করে তাঁরা ব্রিটেনকে সেই সমাজের রক্ষক বলে বর্ণনা করলেন এবং সেই সমাজকে যতদূর সম্ভব টিকিয়ে রাখাই তাঁদের কর্তব্য বলে ঘোষণা করলেন। অন্যদিকে ইংরেজদের 'পিতৃসুলভ মনোভাব'কে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিলেন এইভাবে যে, ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় ইতিহাসে অন্যান্য সাম্রাজ্যের উন্নততর সংস্করণ। সবশেষে ভারতীয় সমাজের স্থাণুতার বক্তব্য ব্রিটিশ শাসনের দীর্ঘস্থায়ী মেয়াদের প্রয়োজনীয়তার দাবিকেই জোরদার করল। অবশ্যই গ্রামীণ সমাজের প্রবক্তাদের মধ্যে মতামতের নানা খুঁটিনাটি পার্থক্য ছিল এবং কেউ কেউ কয়েকটি বিষয়ে মতামত পাল্টেও ছিলেন। তবে সেসব পৃথক আলোচনার বিষয়।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য জায়গায় গ্রামীণ সমাজের অস্তিত্বের কথা কার্ল মার্কসও স্বীকার করেন।[৭] তাঁর তত্ত্বের বিশেষ দিকগুলো একবার ভেবে দেখা দরকার। মার্কসের মতে, এশিয়াটিক সোসাইটির সবচেয়ে বড় লক্ষণ ছিল—গ্রামীণ সমাজের কৃষিজাত ও হস্তজাত শিল্পের ঐক্যবন্ধন।[৮] অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যবধান সৃষ্টি হয়নি। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ওপর ভিত্তি করেই একটি গ্রামে কৃষি ও শিল্পের জন্যে শ্রমশক্তি যৌথভাবে নিয়োজিত হতো। এর জন্যেই গ্রামীণ সমাজ পূর্ণভাবে স্বয়ংভর হতো, মার্কসের ভাষায় "শিল্প ও কৃষির ঐক্যবন্ধনের ফলে ক্ষুদ্র সমাজ সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংভর হয় এবং নিজের মধ্যেই উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত উৎপাদনের শর্তকে পূরণ করে।"[৯] দ্বিতীয় লক্ষণ হলো—জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি। "ভারতের ক্ষেত্রে আমাদের আর একটি লক্ষণ যোগ করতে হবে, গ্রামীণ সমাজ, যা গড়ে উঠেছিল জমির যৌথ মালিকানার ওপর।"[১০] আবার বলা হয়েছে—"প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্র সম্পত্তির আইনগত অনুপস্থিতি সূচিত করে বলে মনে হয়। বস্তুত এর ভিত্তিভূমি হচ্ছে উপজাতীয় বা যৌথ

---

* জার্মানিতে মূল গ্রাম ও তার থেকে উদ্ভূত নানা ছোট গ্রামের সমষ্টিকে বলা হতো মার্ক। মার্ক-এর আওতায় জমি যৌথভাবে চাষ করা হতো। এই প্রথা ক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে অবলুপ্ত হয়।

মালিকানা।"[১১] তৃতীয় শর্ত হলো—এই সমাজের নিশ্চলতা বা গতি-হীনতা। মার্কসের ভাষায়—"এশিয়াটিক ব্যবস্থা স্বভাবতই সবচেয়ে বেশিদিন ধরে, সবচেয়ে অনড় অবস্থায় টিঁকে থাকে।"[১২] এখানে পরিবর্তনের হার অত্যন্ত ধীর, কারণ প্রত্যেকটি গ্রামীণ সমাজ পারস্পরিকভাবে বিচ্ছিন্ন, স্বয়ংভর এবং নিজের কক্ষপথে নিজের গতিতেই আবর্তিত হচ্ছে। "স্বয়ংভর সমাজের উৎপাদন-পদ্ধতির সরলতা আমাদের এশিয়াটিক সমাজের পরিবর্তন-হীনতার সূত্রের সন্ধান দেয়। এই পরিবর্তনহীনতা এশিয়াটিক রাষ্ট্রের ও রাজবংশের ঘন ঘন অভ্যুত্থান ও পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটের তুলনায় বিরোধী। সমাজের কাঠামো মৌল অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আওতার বাইরে থাকে।"[১৩] সামাজিক শ্রম-বিভাগ এখানে অনুপস্থিত। ফলে, শ্রেণীর বিন্যাস অনুন্নত এবং শ্রেণী-সংঘর্ষ এখানে স্তিমিত। এখন যেটা সর্বশেষ বিচার্য বিষয় তা হলো—ব্রিটিশ আমলাদের বর্ণিত গ্রাম্য সমাজের ধারণা ও মার্কস-বর্ণিত 'এশিয়াটিক' সমাজের ধারণা কি এক?[১৪] আমাদের মতে, দু'টি ধারণার মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে পার্থক্য অনেক বেশি। প্রথম পার্থক্য হচ্ছে—দৃষ্টিভঙ্গিতে। যেখানে ব্রিটিশ আমলারা গ্রাম্য সমাজকে আদর্শায়িত করতে চেয়েছিলেন, জীইয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, সেখানে মার্কস এই সমাজের পশ্চাদভিমুখিতাকে ধিকার দিয়েছিলেন, সমাজের ভাঙনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।[১৫] দ্বিতীয়ত, মার্কস অনেক স্পষ্টভাবে কৃষি ও হস্তশিল্পের পারস্পরিক নির্ভরতা ও একতার কথা বলেছেন। তৃতীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—যৌথ মালিকানার ধারণাকে মার্কস দ্বান্দ্বিকভাবে দেখেছেন। 'ফোরম্যানে' এই ধারণাকে অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন মার্কস। তিনি এই এশিয়াটিক সমাজকে দুইভাগে ভাগ করেছেন—গ্রাম্য সমাজ ও তার উপর ঊর্ধ্বতন কোনো ক্ষুদ্রগোষ্ঠী। এই দুই ধরনের অস্তিত্বের ফলে দুই ধরনের অধিকার জন্ম নেয়—একক স্বত্ব ও বংশানুক্রমিক স্বত্ব।[১৬] মার্কস অনেক পরে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন—"রাষ্ট্র হলো তাহলে প্রভু। জাতীয় ক্ষেত্রে জমির মালিকানা সার্বভৌম শক্তির কুক্ষিগত। কিন্তু অন্যদিকে জমির কোনোরকম ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, যদিও জমির ব্যক্তিগত এবং যৌথ অধিকার ও ব্যবহার ছিল।"[১৭] মার্কস তাই এশিয়াটিক সোসাইটিতে জমির ওপর বিভিন্ন ধরনের অধিকারের কথা বললেন। নিচুতলার দিকে গ্রামীণ সমাজে কোনো ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা না থাকলেও ব্যক্তিগত ব্যবহারের অস্তিত্বের কথা মার্কস উল্লেখ করলেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রকে গ্রাম্য সমাজের ঊর্ধ্বতন কোনো শক্তি বা গোষ্ঠীকে সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের উপকরণের মালিক বলে স্বীকার করে মার্কস এশিয়াটিক সমাজের মধ্যে দুই ধরনের কাঠামোর কথা চিন্তা করলেন।

একদিকে হচ্ছে ঊর্ধ্বতন একটি গোষ্ঠী। এরা কতকগুলি সামাজিক ক্রিয়া-কলাপের পরিবর্তে গ্রামের উদ্বৃত্ত সম্পদের অংশকে ভোগ করে। অর্থাৎ জমিতে যদিও ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি হয়নি, তবুও একটি শোষক গোষ্ঠীর আবির্ভাব

হয়েছে। এদের প্রতিভূ হলেন সম্রাট। অন্যদিকে এই ঊর্ধ্বতন শক্তিগোষ্ঠীর কাছে আনুগত্য স্বীকার করেছে অসংখ্য গ্রামীণ সমাজ। তাই এই এশিয়াটিক ব্যবস্থায় আমরা দু'টি ব্যবস্থার পাশাপাশি অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছি। একদিকে শ্রেণীবিহীন গ্রাম্য সমাজ এবং অন্যদিকে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র-শক্তি,—এক ধরনের ঊর্ধ্বতন ক্ষমতা যার মধ্যে শ্রেণী-সমাজের বীজ লুকিয়ে আছে।[১৮] এশিয়াটিক সোসাইটি একদিকে শ্রেণীবিহীন আদিম সাম্যসমাজ, দাসসমাজ এবং শ্রেণীবিভক্ত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মাঝামাঝি একটা অবস্থা। এই দ্বান্দ্বিক দিক এবং জমিতে বিভিন্ন ধরনের অধিকারের স্বীকৃতি ব্রিটিশ আমলাদের রচনায় ছিল না। তবে মার্কস ও আমলারা ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি সম্পর্কে একমত। তৃতীয়ত, মার্কসের রচনায় স্থাণুতার ধারণা আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এশিয়াটিক সমাজে অন্যান্য সমাজ-ব্যবস্থার তুলনায় পরিবর্তন ধীর গতিতে আসে। যেহেতু এশিয়াটিক সমাজ দুই বিপরীত-ধর্মী সামাজিক কাঠামোর সমন্বয়ে গঠিত, সেই সমাজে তাই দ্বন্দ্ব থাকা অস্বাভাবিক নয়। এমনকি ঊর্ধ্বতন গোষ্ঠী কালক্রমে একটি পরিণত শোষক-শ্রেণীতে রূপান্তরিত হতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ আসার আগেই এশিয়াটিক সোসাইটি একটি পুরোপুরি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পরিণত হতে পারে।[১৯] সেদিক থেকে আমলারা ভারতীয় গ্রাম্য সমাজের পরিবর্তনহীনতাকে চরম সত্য বলেই মনে করেছিলেন।[২০]

খ. গ্রামীণ সমাজ : মুঘলযুগ

এখন তাত্ত্বিক আলোচনা ছেড়ে মুঘল কৃষি-অর্থনীতিতে গ্রামীণ সমাজের তথ্যগত আলোচনা করা যেতে পারে।

গ্রামীণ সমাজের যে কোনো আলোচনায় জমির উপর মালিকানার প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা সবাই এক কথায় বাদশাকে জমির মালিক বলে বর্ণনা করেছেন।[২১] কিন্তু আবুল ফজল সম্রাটের কর চাপাবার অধিকারকে শুধুমাত্র 'সার্বভৌমত্বের দাবি' বলে স্বীকার করেছেন—কারণ সম্রাট শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখেন।[২২] কোথাও রাজার সম্পদ ব্যবহারের জন্যে খাজনা হিসেবে রাজস্বকে বর্ণনা করা হয়নি।[২৩] এছাড়া 'ওয়াকাই-ই-আজমীর' ইত্যাদি ফারসি গ্রন্থ থেকে আমরা দেখি যে, শহরে বহু প্রজা তাদের ব্যক্তিগত জমি বাদশাহকে বিক্রয় করেছেন, এমনকি তার স্বত্ব নিয়ে বাদশাহের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়েছেন। গুজরাটের স্বাধীন সুলতানদের রাজত্বের শেষভাগে পুরনো গুজরাটি ভাষায় লেখা দলিলের ভিত্তিতে জানা যায় যে, শহরে জমি বাগান বাড়ি ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তি অবাধে কেনাবেচা হতো। গুজরাটের নভেশিরে ১৫৭০ সনে শেঠ ধ্যান রাণা ধার শোধ করতে না পেরে শেঠ জয়সিংকে

বাড়ি বিক্রি করেছিলেন। ১৫৭০-এর দশকে মায়ের চাক্তা পরিবাররা ধীরে ধীরে প্রচুর জমি-জায়গা ও বাস্তু সম্পত্তি মহাজন মেহেরজি রাণাকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এছাড়া পাঞ্জাবে বাটালা শহরে প্রাপ্ত বায়নামা (বিক্রয় কবালা পত্র) ও গিরভিনামা (বন্ধকী পত্র) অনুসারে বলা যায় যে, সপ্তদশ শতকের শেষে ও অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে অনুরূপ ভাবে হাভেলি কেনাবেচা চলেছে এবং ক্রেতা আধুনিক অর্থে সম্পূর্ণ মালিকানা স্বত্ব পেয়েছে।[২৪]

দেখা যায় যে, আকবরের সময় মথুরার কাছে গোকুলের বল্লভাচার্য গোঁসাইরা জাতিপুরা মৌজায় অর্থের বিনিময়ে জমিদারদের কাছ থেকে জমি ক্রয় করেন। শাহজাহানও সেই ক্রয়ের আইনগত যথার্থতা স্বীকার করে নেন।[২৫] জাহাঙ্গীরের আমলে লেখা একটি বিক্রয় কবালায় পূর্ণ মালিকানা স্বত্বের উল্লেখ আছে। রহিমাবাদে খোজা করিমুল্লা খোজা মহম্মদকে এক হাজার শাহজাহানি টাকার বিনিময়ে জমি সমেত বাড়ি বিক্রি করেছে। সেখানে বাড়ির মালিক সোচ্চারে ঘোষণা করেছে, সেই বাড়িতে অন্য কোনো শরিকি স্বত্ব (মুশরকানে গয়েরি) নেই এবং মালিকানা (মালিকানে মন) তার নিজস্ব। অপর দু'জন সাক্ষীও জানিয়েছে যে, বাড়ির পূর্ণ মালিকানা-স্বত্ব বিক্রেতার আছে (রজ্জব ওয়া ফুতু গাওয়াহি দাদন্দ কে অন্ খনে মালিকি ওয়া মৌরুশী বায়া মজকুর)।[২৬]

আসলে সম্রাট কর হিসেবে সামাজিক সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশ পেতেন। উচ্চতর সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্যে তিনি শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতেন। তারই মূল্য হচ্ছে কর। কিন্তু জমির মালিকের খাজনার হিসেবে তাঁর কিছু প্রাপ্য ছিল না। কিন্তু এর চেয়েও জরুরি কথা হলো যে, গ্রামীণ সমাজে কৃষক কি ব্যক্তিগতভাবে জমির মালিক ছিল? প্রথমেই বলা যেতে পারে যে, আইন-ই-আকবরী অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জমির উপর কৃষকদের অধিকার উল্লেখ করেছে। "এটা খুবই স্পষ্ট যে, সমস্ত কর্ষিত সম্পত্তির মালিকের সংখ্যা অগণ্য।"[২৭]

আমরা আইন-ই-আকবরী, নিগর-নামা-ই মুন্সি, মুহম্মদ হাসিমের প্রতি আওরঙ্গজেবের ফরমান এবং খাফিখানের রচনা থেকে জানি যে, জমিতে ব্যক্তিগতভাবে কৃষকের চিরস্থায়ী ও বংশানুক্রমিক দখলি স্বত্ব ছিল।[২৮] এবং এটা সব সময় মনে রাখতে হবে যে, তখনকার দিনে সমস্যাটা ছিল জমির নয়, বরং কৃষকদের। তখনো লোকসংখ্যা অপেক্ষা কর্ষণযোগ্য জমির অনুপাত তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল।"[২৯]

এইরকম অবস্থার একটি বিশদ বিবরণ মধ্যপ্রদেশ এলাকা থেকে পাওয়া গেছে। সময়টা অবশ্য ব্রিটিশ শাসনপর্বের মধ্যেই পড়ে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি জনবিরল ছত্রিশগড় অঞ্চলে কৃষিসমাজের বিস্তার প্রসঙ্গে এক অনামী লেখক বিস্তারিত বিবরণ পাঠিয়েছেন। কিন্তু যে কোনো জনবিরল অঞ্চলে কৃষিসমাজ বিস্তারের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে এই দলিলটি প্রাসঙ্গিক ও উদ্ধৃতিযোগ্য :

"আদিম বাসিন্দা দেখবে যে চাষের জন্যে প্রচুর অনাবাদী জমি পড়ে আছে। যদি সে অন্য লোকদের তার সঙ্গে আস্তানা গাড়তে প্রণোদিত করতে পারে তাহলে তার বসতির নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যই শুধুমাত্র বাড়বে না, সে গ্রামের সাধারণ উন্নতির জন্যে পরিশ্রম করতে পারবে। সে কিছু সেচকাজ শুরু করা ও নিচু জমিকে লাঙ্গলের আওতায় আনার সময় পাবে।···নতুন চাষীদের সাগ্রহে ডাকা হতো। জমির জন্যে নয়, বরং মানুষের জন্যেই প্রতিযোগিতা হয়।···এখানে জমির কোনো প্রতিযোগিতা নেই এবং তার ফলে স্বত্ব আদৌ বিতর্কিত নয়। স্বত্বতে কেউ হস্তক্ষেপ করে না।···জমি নিয়ে কোনো বাদ-বিসংবাদ নেই, কারণ তা নিয়ে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই।"[৩০]

১৬৩০ সন নাগাদ গুজরাটের ওলন্দাজ কোম্পানির কুঠিয়াল গেলিনসেন ঠিক এই ধরনের ছবি এঁকেছেন। তিনি লিখেছেন: "কৃষকদের জমি এইভাবে দেওয়া হয়। জমি চাষ করতে ইচ্ছুক লোক মুকদ্দম বলে কথিত গ্রামের প্রধানের কাছে যায় এবং তার পছন্দমতো জায়গায় খুশিমতো জমি চায়। তার অনুরোধ খুব কমই প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং প্রায়ই অনুমোদন করা হয় কারণ এখানে কর্ষণযোগ্য ভূমির এক-দশমাংশও চাষ করা হয় না। ফলে যে কেউ তার ইচ্ছামতো জমি-জায়গা পেতে পারে এবং সে সামন্তকে ধার্য মিটিয়ে দেবার শর্তে তার সাধ্যমতো জায়গা চাষ করতে পারে।"[৩১] এবং এরই ফলে কৃষকের মালিকানা-স্বত্ব একদিক থেকে অসম্পূর্ণ ছিল। সেটা হলো—কৃষক ইচ্ছে করলেই নিজের খুশিমতো তার জমি কাউকে বিক্রি করতে পারত না। এক্ষেত্রে নানা ধরনের রাষ্ট্রীয় ও গোষ্ঠীগত বাধা-নিষেধের মধ্যে তার অধিকার সীমিত ছিল। তাই একদিক থেকে জমি যেমন কৃষকের আয়ত্তে ছিল, কৃষকও জমির অধীন ছিল। অর্থাৎ কৃষকের অবস্থা সেদিক দিয়ে প্রায় ভূমিদাসের সমান ছিল। (পরে কৃষকদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় এই সাধারণ সত্যের কয়েকটি ব্যতিক্রম আমরা লক্ষ করব।)

মুঘল আমলে রাজশক্তি আপ্রাণ চেষ্টা করত যাতে কৃষকরা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যেতে না পারে। মহম্মদ হাসিমের প্রতি আওরঙ্গজেবের ফরমানের ২নং ধারায় স্পষ্টভাবে লেখা আছে—"যথেষ্ট বৃষ্টি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কৃষক চাষে অনিচ্ছুক হলে তাকে ভয় দেখাবে, জোর করবে, (তহদিব ওয়া তাগিদ আনহরা) এমনকি মারবে।" দিল্লি থেকে প্রাপ্ত 'দস্তুর-ই-আমল-ই-বেকাশে' উল্লিখিত আছে যে, কৃষকদের আপনাপন গ্রামে ধরে রাখার জন্যে গ্রামের আমলারা মুচলেকাবদ্ধ ছিল। ১৬৪১ সনে আহমেদাবাদ থেকে কিছু কৃষক নাভানগরে আশ্রয় নেয় এবং রাজাকে সামরিক চাপ দিয়ে বাধ্য করা হয় সেই কৃষকদের ফেরত পাঠাতে। এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রে অষ্টাদশ শতকের একটি বিস্তারিত দলিল পাওয়া যায়। নাসিক অঞ্চলের কৃষকরা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলে যায়, কারণ সেখানে প্রায় অর্ধেক রাজস্ব দিতে হয়। সরকার

কৃষকদের ফিরিয়ে আনবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল এবং সেইসব পলাতক কৃষকদের কাছ থেকে তাদের আদি অঞ্চলে প্রচলিত রাজস্ব বর্ধিত হারেই আদায় করেছিল।[৩২]

বাংলা সাহিত্যেও এর উদাহরণ পাওয়া যায়। ১১১১ সনে ঘনরাম রচিত 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে যখন কালু ডোমকে রায় লাউসেন নিজের অঞ্চলে নিয়ে যেতে চাইলেন তখন তাকে স্থানীয় অধিকর্তা গৌড় রাজার বিশেষ সম্মতি নিতে হয়েছিল। যথা—

"রায় কন যাও যদি আমার সংহতি।
রাখিব চাকর দূর করিব দুর্গতি॥
যো হুকুম যাইব রাজার আজ্ঞা পাই।
অনুগত হলে নাম জগতে জানাই॥
... ...
এত বলে গেলা রায় রাজ সন্নিধান।
কও কেন এলে পুনঃ ভূপতি সুধান॥
সেন বলে আজ্ঞা কর ডোম তের ঘর।
লোকজন চাই যদি রাখিতে চাকর॥
দিনু দিনু বলি রাজা দিল লিপিদান।
বিদায় হইল পুনঃ হইয়া নতমান॥
... ...
আসিয়া কালুকে দিল লিখন পরওয়ানা।
সাজিল সকল ডোম, দক্ষিণ ময়না॥"[৩৩]

এদিক থেকে মুঘল আমলে জমি থেকে উৎখাতের চেয়ে কৃষককে জমিতে বেঁধে রাখাই শাসকশ্রেণীর উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ ব্রিটিশ যুগের ঠিক বিপরীত অবস্থা ছিল মুঘল শাসনকালে। কৃষকের দখলি-স্বত্ব চিরস্থায়ী ও বংশানুক্রমিক ভাবে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু যেহেতু কৃষক স্বেচ্ছায় জমি ত্যাগ করতে পারত না, সেহেতু তার মালিকানা-স্বত্ব পূর্ণভাবে বজায় ছিল না। জমি এবং তার উৎপন্নের প্রতি সরকার জমিদার বা রায়তের বিভিন্ন ধরনের অধিকার ছিল, একচেটিয়া বা একক মালিকানা-স্বত্ব কারোই ছিল না।

এখানে মালিকানা বা স্বত্ব বিক্রির প্রসঙ্গে বোধহয় দুয়েকটা কথা বলে নেওয়া ভালো। মুহম্মদ হাসিমের প্রতি আওরঙ্গজেবের ফরমানে কৃষকের মালিকানা বা অন্য কাউকে স্বত্ব বিক্রয় করার প্রসঙ্গ বলা হয়েছে। কিন্তু হাসিমের প্রতি ফরমানের সঙ্গে যুক্ত টীকাতে এই মালিকানাকে স্পষ্টভাবে ফসলের উপর স্বত্ব বলেই নির্ধারিত করা হয়েছে, জমির উপর গ্রাহ্য স্বত্বকে হস্তান্তর করার কথা বলা হয়নি। ('অন ময়নি নিসথ কে ইন জমিনে মালিক উ আসথ কে মিলকে মুজারিয়ৎ দর অন জমিন আসথ' অথবা 'জমিনে খুদ রা ইয়ানি মুজারিয়াৎ

জমিনে খুদ রা বে ফুরুশদ্')।[৩৪]

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা গ্রামীণ সমাজের অস্তিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে ভেবে দেখতে পারি।[৩৫]

প্রথমেই আমরা মুঘল আমলের গ্রামীণ সমাজকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি — দেহাৎ-ই-তালুক এবং দেহাৎ-ই-রায়তি। দেহাৎ-ই-তালুক হচ্ছে সেই গ্রাম, যা বড় জমিদারের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে রাজস্ব দেয়। অন্যদিকে দেহাৎ-ই-রায়তির কৃষকরা সরাসরি রাষ্ট্রীয় আমলা বা গ্রাম-প্রধানের মাধ্যমে রাজস্ব দেয়।[৩৬] এখন দেহাৎ-ই-রায়তি জাতীয় গ্রামে রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গ্রামের লোকেরা প্রতিনিধি নির্বাচন করত। ফলে যৌথভাবে রাজনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারণ করার প্রবণতা সেখানে থাকতেও পারে। দেহাৎ-ই-তালুকে শক্তিশালী জমিদারের উপস্থিতি এই গ্রামগুলোকে কিছুটা স্বতন্ত্র চরিত্র দিয়েছে। কিন্তু মুঘল আমলে জমির ওপর বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন অধিকার থাকলেও সাধারণ ভাবে গ্রামীণ সমাজের যৌথ মালিকানার প্রমাণ পাওয়া যায় না। একটি কৃষক পরিবারকে এককভাবেই রাজস্ব আদায়ের সময় গণনা করা হতো এবং এরকম কোনো প্রমাণ নেই যে, কৃষি-সমাজের বিভিন্ন ধরনের উৎপাদকের দেয় রাজস্বের পরিমাণ নির্ণয় করা এবং বিভিন্ন ধরনের অধিকারের সম্পর্ক নির্ণয় করার দায়িত্ব গ্রামীণ সমাজের ছিল। 'পাট্টাদারি' ও 'ভাইয়াচারি' মালিকানা ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রামীণ সমাজের কোনো মিল নেই। এই জাতীয় জমির মালিকানার অর্থ হলো, জমিদারির কতকগুলি অধিকার কয়েকটি পরিবার একত্র ভোগ করে এবং দেয় রাজস্ব বাকি পড়লে তার দায়িত্বও অনুরূপভাবে ভাগ করে নেয়। কিন্তু গ্রামীণ সমাজের সমস্ত শ্রেণী এরকম অধিকার ভোগ করত না। উত্তর-পশ্চিম ভারতে দেখা যায় যে, অনেক সময় বহু বর্গা চাষী তাদের উৎপাদনের অংশ অন্য কাউকে দেবার বদলে একটি সাধারণভাবে দেয় অংশ বা 'খরচ-ই-দে' (গ্রামের খরচা) একটি সাধারণ ভাণ্ডারে জমা দিত। এখানে সারা গ্রামের কাছেই তার চাষ করার অধিকারের মূল্য গুনে দিচ্ছে বলে মনে করা যায়। এছাড়া 'মালবা' বলে অনুরূপ দেয় ধার্যের কথা আমরা পাই। এখন 'মালবা' ও 'খরচ-ই-দে' দুটোই রাজস্ব আদায়কারী আমলাদের আমোদ-প্রমোদ ও গতানুগতিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ধার্য হতো। তার মধ্যে 'মালবা' আকবরের সময় থেকেই একটি বেআইনি কর বলে ঘোষিত ছিল। এবং 'খরচ-ই-দে' কখনোই গ্রামীণ সমাজের যৌথ ভাণ্ডারের অঙ্গ ছিল না বা দখলি স্বত্বের বদলে দেয় অর্থ ছিল না, রাষ্ট্রের জন্যে ব্যয়ের নিজস্ব খাতেই তাকে ধরা হতো। পাটোয়ারিদের রক্ষিত বিভিন্ন খরচের খাতাই একথা প্রমাণিত করে।

গোচারণ ক্ষেত্র বা বনজঙ্গলও গ্রামীণ সমাজের অধিকারভুক্ত ছিল না। একথা ঠিক, যে কোনো কৃষক বন কেটে আবাদ করতে পারত এবং সেখানেই তার দখলি স্বত্ব জন্মাত। তবে তার জন্যে তাকে রাষ্ট্রকে কম হারে রাজস্ব দিতে

হতো। গোচারণ ক্ষেত্র ব্যবহারের অধিকার প্রত্যেক রায়তের ছিল। কিন্তু তার জন্যে জমিদার ও মুকদ্দমকে কিছু ধার্য অংশ দিতে হতো—সেগুলো 'নয়ের-ও-জিহাৎ'এর মধ্যে পরিগণিত হতো।

অন্যদিকে মনে রাখা দরকার যে, মুঘল আমলে ভারতের কৃষি-সমাজে প্রাথমিক উৎপাদকের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাস অত্যন্ত স্পষ্ট।[৩৭] গ্রাম্য পঞ্চায়েতের অস্তিত্বও মুঘল আমলে বড়ই ক্ষীণ। প্রধানত বিবাদের মীমাংসা চৌধুরি ও কানুনগোদের মাধ্যমেই করা হতো। সবার শেষে আসছে স্বয়ংভরতার এবং বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন। এখন একথা অনস্বীকার্য যে, গ্রামীণ সমাজ মোটেই বিচ্ছিন্ন ছিল না। মুঘল আমলে ব্যাপকভাবে বিবিধ শস্যের চাষ করা হতো—যেগুলো দূরের বাজারে বিক্রি করা যেতে পারে। তুলো, চিনি, তামাক ইত্যাদি গ্রামে উৎপন্ন করা হতো এবং দূরাঞ্চলে চালান দেওয়া হতো। তামাক চাষের ব্যাপক ও দ্রুত প্রসার এটাই প্রমাণ করে যে, কৃষক ব্যক্তিগতভাবে বাইরের চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে নিজের গ্রামে উৎপাদনে রত ছিল। অন্যদিকে শহরের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা মেটাত গ্রামীণ সমাজ। সেই চাহিদা মেটাবার কাজ শুধুমাত্র কাঁচামাল সরবরাহ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না, শিল্পীও সরবরাহ করা হতো। এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পীদের সঙ্গে কৃষি-জীবনের বিচ্যুতি ঘটেছিল, কয়েকটি জায়গায় বিশেষ ধরনের উৎপাদন গড়ে উঠেছিল ; গ্রাম থেকে নগরের চারপাশে তাঁতিদের এবং বিশেষত 'নকদ' বা রেশম সুতা নির্মাতাদের জমায়েত গড়ে উঠেছিল। সুরাট ও অন্যান্য অঞ্চলের বাজারের চাহিদা মেটাতে মির্জাপুরের সন্ন্যাসীরা রেশমের সুতা কিনবার জন্যে প্রতি বছর মুর্শিদাবাদের গ্রামাঞ্চলে আসত। এই সুযোগে 'চসর' বা গুটিপোকা পালকরা বিভিন্ন দেশীয় ব্যবসায়ী ও বিদেশি কোম্পানির চাহিদা বুঝে উৎপাদন করত বা দাম নির্ধারণে কিছুটা স্বাধীনতা পেত। স্থলপথে গ্রামাঞ্চল থেকে বিভিন্ন দ্রব্যের সংগ্রহ ও ব্যাপক বাণিজ্য চালাবার ভার ছিল 'বানজারা' বলে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর হাতে।[৩৮] সুতরাং মুঘলযুগে ভারতীয় গ্রামের বিচ্ছিন্নতার কথা বোধহয় বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে সমর্থন করা যায় না।

কিন্তু বিচ্ছিন্নতার কথা বাদ দিলেও স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা থেকে যায়। এবং এদিক থেকে ভারতীয় গ্রামের স্বয়ংনির্ভরতা ছিল। প্রথমত—আমরা কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্যধারা থেকে জানতে পারি যে, এই ধারা একমুখী ছিল। শহর গ্রাম থেকে দ্রব্য আহরণ করত, গ্রামে কিছু ফিরে যেত না।[৩৯] অর্থাৎ গ্রামীণ জনসাধারণের চাহিদা গ্রামেই মিটে যেত। এর কারণ বোধহয় গ্রামের সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত ছিল, দৈনন্দিন প্রয়োজনের বাইরে আর কিছু কেনার বিশেষ সামর্থ্য ছিল না। দ্বিতীয়ত, গ্রোভারের রচনা থেকে আমরা জানি যে, একটি গ্রাম হয়তো এককভাবে স্বয়ংভর ছিল না। অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় পাদেও এরকম উদাহরণ পাই। মেদিনীপুরের ওপর একটি সমীক্ষা এর

দিকনির্দেশ করতে পারে। যে রকম ছিল পরগনা নারায়ণগড়ে : মোট গ্রামের সংখ্যা ২৪৫টি, বাড়ির সংখ্যা ৩৬৫৪টি ; সেখানে রায়তদের চাহিদা মেটায় ৮১টি তাঁতিঘর। পরগনা ভূম্যতায় ৭৫টি গ্রামের জন্যে আছে ৫০ ঘর তাঁতি পরিবার। এবং পরগনা কেদারে ২১১টি গ্রামের জন্যে আছে ৩৭ ঘর তাঁতি পরিবার।[৪০]

কিন্তু একটি বিশেষ অঞ্চলে কতকগুলি গ্রাম তাদের পারস্পরিক চাহিদা মেটাত। কয়েকটি বিশেষ গ্রামে হয়তো কয়েকটি বিশেষ বৃত্তির সমাবেশ হতো। তারাই আশেপাশের গ্রামের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাত। অর্থাৎ একক গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতা না থাকলেও একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল তার দৈনন্দিন চাহিদা মেটাত। গ্রামীণ হাটের প্রয়োজনীয়তার উদ্ভব এখানেই।[৪১] উৎপাদনের বাইরে অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রেও গ্রামীণ সমাজের অস্তিত্ব মুঘলযুগে দেখা যায়।

গ্রামীণ সমাজের সভার পরিচয় ব্যাপকভাবে অঞ্চল ত্যাগ করার সময়, অথবা গ্রামে যৌথ ভাণ্ডার নির্মাণ করার সময়ে পাওয়া যায়। যৌথ ভাণ্ডার থেকে অনেক সময় বাকি রাজস্ব শোধ দেওয়া হতো বা ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা হতো। 'পাটোয়ারি' নামে একজন কর্মচারি থাকত, যার উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের স্বার্থের তদারকি করা এবং যৌথ ভাণ্ডারের দায়িত্ব রাখা। এবং যৌথ কাজকর্মের ভিত্তিই ছিল বর্ণ, কারণ অনেকগুলি গ্রামের উৎপত্তি মুঘল সাম্রাজ্যে বর্ণভিত্তিক ছিল। রাজস্থানে প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে দেখা যায়, যৌথভাবে কৃষকরা জমির ইজারা নিত বা টাকা শোধ দেবার জন্যে দায়ী থাকত। এছাড়া একথাও বলা যায় যে, পশ্চিম-ভারতের ও দাক্ষিণাত্যে গ্রামীণ সমাজের বন্ধন উত্তর-ভারতের গ্রামের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো ছিল। মনসাবেট ষোড়শ শতকের কোঙ্কনে একটি সুদৃঢ় পঞ্চায়েত বিশিষ্ট সমাজের কথা বলেছেন। মহারাষ্ট্রে গ্রামীণ সমাজে পঞ্চায়েত 'দাম দুপৎ' নামে এক জাতীয় নীতির মাধ্যমে মহাজনের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত। সুদ কখনো আসলের বেশি হতে পারত না এবং সেই ভিত্তিতে কৃষক 'কুনবি' মহাজন 'বানির' কাছে ধার নিত। অবশ্য এটা যে সবসময় কাজ করত তা নয়। আবার একটি গ্রামে নতুন কেউ স্থায়ীভাবে জমির উপর ভোগদখলি স্বত্ব নিয়ে বসবাস করতে চাইলে তাকে গ্রামীণ সমাজের সমবেত সম্মতির অপেক্ষা করতে হতো। যে রকম মুলতান গ্রামের একটি প্রাসঙ্গিক দলিল বলছে : "আমাদের (পাতিল ও গ্রামের মিরাসী চাষী) সকলের উপস্থিতিতে তুমি কাওয়াসজি ঐ গ্রামে মীরাসপাট্টার জন্যে আবেদন করেছ···আমরা তোমার আবেদন মঞ্জুর করে তোমাকে শোন বলে জমি দিচ্ছি।"[৪২]

১৫২৬ সনে গোয়ার পোর্তুগিজ শাসনকর্তা নুনহো-ডি কুনহার আর্থিক উপদেষ্টা আফোনসো মেইহা গোয়ার সন্নিকটস্থ গ্রামগুলোর ওপর একটি বিশদ প্রতিবেদন রচনা করেন। সেখানেও জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে গ্রামের উচ্চতর গোষ্ঠীর যৌথ সম্মতির কথা বলা হয়েছে : "যদি কোনো গাঁওকর (গ্রামের

প্রধান) বা অন্য কোনো লোক গ্রামে কোনো বংশানুক্রমিক সম্পত্তি বিক্রি করতে চায়, তাহলে তার গ্রামের সব গাঁওকরদের সম্মতি অবশ্যই প্রয়োজন। এবং অনুরূপ সম্মতি ছাড়া কেউ জমি কিনতেই পারবে না।"[৪৩]

মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামীণ কারিগরদের ক্ষেত্রেও গ্রামীণ সমাজের নিয়ন্ত্রণের কথা বলা যায়। সেখানে বলুতা বা কারিগররা সমস্ত গ্রামের সেবা করে, ব্যক্তিগতভাবে তারা কয়েকটি পরিবারের বেতনভুক নয়। সেখানে বলুতা সম্পর্কিত দলিলে কয়েকটি শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। 'গাঁওচি সোনারকি' (গাঁয়ের স্বর্ণকার), 'দেহাচ্যা কাজকাম' (গ্রামের কাজকর্ম) বা 'গাঁওকরি চাকরি' (গাঁয়ের সেবা) অথবা 'গাঁওকারি ওয়াতন'। তাদের বসতি স্থাপন বা অধিকার নিয়ে বিবাদ বিসংবাদ নিষ্পত্তি করার দায়িত্বও ছিল সামগ্রিকভাবে গ্রামের সমস্ত বাসিন্দাদের। পতিত জমি 'মিরাস' বা 'ইনাম' হিসেবে গ্রামের সবাই কাউকে দিচ্ছে এরকম নিদর্শনও আছে। সেখানে দলিলে স্পষ্টই লেখা থাকত—'মোকদ্দম ওয়া সমসাত পানধারি'। কিন্তু এরকম দানের পর মিরাসদারকে রাজস্ব দিতে হতো বা 'ইনামের' ক্ষেত্রে গ্রামের সবাইকে একসঙ্গে রাষ্ট্রকে রাজস্ব দিতে হতো। গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে সঙ্গে সরকার বা গ্রামের প্রধানও পতিত জমির বিলি-বন্দোবস্ত করার অধিকারী ছিল।[৪৪] অষ্টাদশ শতকের পাঞ্জাবের কৃষি-অর্থনীতির ওপরে রচিত সাম্প্রতিক গবেষণাগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, কৃষকরা গ্রামের কারিগরদের শস্যের শতকরা ৫ ভাগ দিত। একে বলা হতো হকুক-ই-কামিয়ানা।[৪৫]

তুলনামূলকভাবে গ্রামীণ সমাজের এতটা জোরালো ভূমিকা উত্তর-ভারতে বড় একটা দেখা যায় না। তবে বিশেষ রাষ্ট্রনৈতিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এই গ্রামীণ সমাজের প্রয়োজনীয়তা কৃষকরা মুঘল আমলে বারবার বুঝেছে।

তাহলে আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি যে, ব্রিটিশ আমলাদের বর্ণিত গ্রামীণ সমাজের ধারণা মুঘল আমলে অনেকটাই অবাস্তব। যৌথ মালিকানার অনুপস্থিতি, কৃষকের ব্যক্তিগত অধিকারের স্বীকৃতি এবং গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে দূরবর্তী বাজার ও নগরের ব্যাপক সংযোগ গোটা দুনিয়াটাকেই বদলে দিয়েছে।

কিন্তু মার্কসের গ্রামীণ সমাজের ধারণাকে অতটা সহজে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। জমিতে বিভিন্ন ধরনের অধিকারের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল সীমিত। কৃষক ব্যক্তিগত অধিকারের দিকে অনেক দূরে এগিয়ে গেলেও পুরোপুরি মালিকানা স্বত্বের অধিকারী তাকে বলা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, গ্রামীণ জীবনের নিজস্ব অর্থনীতির ধারা সম্পর্কে বোধহয় মার্কস ঠিক কথাই বলেছিলেন। অর্থাৎ ভারতীয় গ্রাম স্বয়ংভর এবং শিল্প ও কৃষি গ্রামীণ সমাজের অর্থনীতিতে পরস্পর পরিপূরক মাত্র। কিন্তু অন্যদিকে বাইরের অর্থনীতির টান বোধহয় হস্তজাত শিল্পকে ও কৃষিকে নিজেদের পরিপূরকতা

ছাড়িয়ে অন্য দূরবর্তী বাজারের চাহিদার দিকে সাড়া দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সুতরাং নিছক গ্রামের চাহিদার দিক দিয়ে শিল্প ও কৃষির গাঁটছড়া যেমন সত্য, ঠিক তেমনি ভাবেই বাইরের বাজারের চাহিদার দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে শ্রমের সামাজিক ব্যবধানের বীজ উপ্ত ছিল। অর্থাৎ গ্রামে দ্রব্যাদি শুধু নিছক ব্যবহারের জন্যে উৎপন্ন হচ্ছিল না, দূরের বাজারের জন্যে তার একটা বিনিময়-মূল্যও ছিল।

সুতরাং একদিক দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের গ্রামীণ সমাজের কতকগুলি অত্যাবশ্যক অর্থনৈতিক দিক অনুপস্থিত ছিল। অন্যদিক দিয়ে গ্রামীণ সমাজের একটি শর্ত, হস্তজাত ও কৃষি-শিল্পের ঐক্য ও আঞ্চলিক স্বনির্ভরশীলতা গ্রামের নিজস্ব চাহিদা মেটাবার দিক দিয়ে বজায় ছিল। তাই এশিয়াটিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মুঘল যুগের গ্রামীণ সমাজের অস্তিত্ব আংশিক সত্য মাত্র, কখনোই পুরোপুরি সত্য নয়। গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে দু'টি বিপরীতমুখী ঝোঁক মুঘলযুগে কাজ করেছে এবং ঐ ঝোঁক দু'টির পারস্পরিক টানাপোড়েন গ্রামীণ অর্থনীতির বিবর্তনকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

২

মনসবদার : প্রধান শাসকগোষ্ঠী

মুঘল রাষ্ট্র শুধুমাত্র শোষকশ্রেণীর রক্ষক ছিল না—যার মাধ্যমে শোষকরা আড়াল থেকে সম্পদ আহরণ করত। সম্রাট এবং তার পারিষদবর্গ নিজেরাই শোষকশ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। যে অঞ্চলের রাজস্ব আমলাদের মধ্যে বিতরিত হতো, তার নাম ছিল জায়গির।[১] এই জাতীয় রাজস্বের অধিকারীকে বলা হতো জায়গিরদার। জায়গিরদাররা সম্রাটের অধীনস্থ কর্মচারি মাত্র ছিল এবং তাদের বেতনের পরিবর্তে জায়গির দেওয়া হতো। অর্থাৎ জায়গিরদার ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত রাজস্বের একাংশের অধিকারী। সে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের একাংশ ভোগ করত, যদিও এর ফলে জমির উপর তার কোনো মালিকানা-স্বত্ব জন্মাত না। সাধারণত, সম্রাট সমেত এই জায়গিরদাররাই মুঘল অর্থনীতিতে প্রধান শোষকশ্রেণী বলে অভিহিত হতে পারে। এদের শ্রেণীচরিত্র ও বিন্যাস সম্পর্কে দুয়েকটি কথা জানা দরকার।

মুঘল শাসনব্যবস্থায় 'মনসব' বা পদের মাধ্যমে এই সমস্ত জায়গিরদারদের স্থান নির্ণয় হতো। আপাতত এর ঐতিহাসিক উদ্ভবের আলোচনার মধ্যে না গিয়ে বলা যেতে পারে যে, মুঘল আমলে এই মনসবের কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল।[২] প্রথমত—মুঘল আমলে প্রত্যেক মনসবদার সরাসরি সম্রাটের অধীন ছিল। এদিক দিয়ে দিল্লির তুর্ক-আফগান যুগের সামরিক ব্যবস্থা

একেবারে আলাদা ছিল। কারণ সেখানে উর্ধ্বতন সেনাধ্যক্ষের অধীনে বিভিন্ন শ্রেণীর অধস্তন সেনানী ছিল এবং শুধুমাত্র প্রধান প্রধান সেনাপতিরাই সুলতানের সরাসরি আজ্ঞাবহ ছিল। অবশ্য এই দুই সামরিক ব্যবস্থারই সৈন্য-সংখ্যা নির্ধারিত 'দশ' গুণিতকের ওপরই নির্ভরশীল।[৩] দ্বিতীয়ত—মনসবের দুটো দিক ছিল—'জাঠ' ও 'সওয়ার'। 'জাঠ' ছিল মুঘল সামরিক ব্যবস্থায় মনসবদারের ব্যক্তিগত পদমর্যাদা এবং প্রচলিত আয়-ক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নিজস্ব মাহিনার সূচক মাত্র। 'সওয়ার' সূচক দিয়ে মনসবদারের অধীনে কতগুলো ঘোড়সওয়ার ও সৈন্য থাকবে তা বোঝা যেত।[৪]

এই জাঠ ও সওয়ারের যৌথ ভিত্তিতে মুঘল মনসবদারদের বেতন ঠিক হতো। এই বেতন তারা সময়ে সময়ে নগদ অর্থে পেত, তখন তাদের বলা হতো 'নগদি'। কিন্তু বেশির ভাগ সময় সরাসরি বেতনের পরিবর্তে সাম্রাজ্যের একটি অংশের রাজস্ব তাদের মধ্যে বণ্টন করা হতো। সেই অংশের ভূমিরাজস্ব ও সম্রাটের অনুমোদিত বিভিন্ন করের অধিকারী হতো এই মনসবদাররা। এই জাতীয় মনসবদারদের নামই ছিল 'জায়গিরদার'। যে অংশের রাজস্ব সরাসরি সম্রাটের খাস তহবিলে জমা হতো, তাকে বলা হতো 'খালিসা'। যে অংশগুলি সাময়িকভাবে সম্রাটের সরাসরি আয়ত্তাধীনে আছে কিন্তু পরে জায়গিরে রূপান্তরিত হবে, তাকে বলা হতো 'পায়বাকি'। সাম্রাজ্যের বেশির ভাগ রাজস্বই জায়গিরদারদের আওতায় থাকত। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ দিকে খালিসার থেকে আয়ের পরিমাণ মোট রাজস্বের ২০ ভাগের একভাগ ছিল। শাহজাহানের সময় খালিসা থেকে আয় হতো ১২০ কোটি দাম—সেখানে মোট 'জমা' ছিল ৮৮০ কোটি দাম। অর্থাৎ গোটা সাম্রাজ্যের ৭ ভাগের এক ভাগ ছিল 'খালিসা' জমি। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের দশম বছরে রাজস্বের মোট ৯২৪ কোটি দামের মধ্যে ৭২৫ কোটি দামই জায়গিরদারদের ভোগে যেত। অর্থাৎ রাজস্বের ৫ ভাগের মাত্র একভাগ খালিসার আওতায় পড়ত। মনসবদারদের বেতন 'নগদ' দেওয়া হবে, না জায়গিরের মাধ্যমে দেওয়া হবে—সেটা ঠিক করার ভার ছিল সম্রাটের ওপর। জায়গিরের মধ্যেও দুটো ভাগ ছিল—'তনখা জায়গির' ও 'ওয়াতন জায়গির'। বেতনের পরিবর্তে যে জায়গির দেওয়া হতো, তার নাম 'তনখা জায়গির'। এবং 'ওয়াতন জায়গির' ছিল আসলে হিন্দু-সামন্তরাজার রাজ্য—যাদের অবস্থিতি মুঘল সাম্রাজ্যের আগে থেকেই ছিল এবং যারা আকবরের সময় থেকে মুঘল শাসনব্যবস্থার সামিল হয়েছিল। তাদের মনসবের আয় তারা নিজস্ব রাজ্য থেকেই সংগ্রহ করত এবং সেই আয় উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করতে পারত।[৫] 'ওয়াতন' কথাটার আক্ষরিক অর্থ বাস্তুভিটা। হিন্দু জমিদার বা রাজাদের রাজ্যগুলি স্বয়ংশাসিত ছিল। ফলে তারাই রাজ্যের রাজস্ব নির্ধারণ করত। সুতরাং মুঘল রাজস্ব-ব্যবস্থার 'জমা' এবং তদনুযায়ী মনসব বিতরণের সঙ্গে এর কোনো সরাসরি সম্পর্ক ছিল না। দ্বিতীয়ত—'ওয়াতন

জায়গির' বংশানুক্রমিকভাবে ভোগ করা চলত এবং সেখানে কোনো বদলি করা চলত না। এইসব সুবিধার জন্যে পরবর্তীকালে বহু জায়গিরদার তাদের 'তনখা জায়গির'কে 'ওয়াতন জায়গিরে' রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল।

যখনই নগদ বেতনের বদলে কাউকে জায়গির দেওয়া হতো, স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রকৃত বেতনের সমান রাজস্ব নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থেকে পাওয়া যাবে বলে ধরা হতো। এজন্যে রাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ নির্ণয় করা মুঘল শাসন-ব্যবস্থার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বিভিন্ন 'মহলে' বা শাসিত অঞ্চলের ক্ষুদ্রতম একক অংশ থেকে রাজস্বের নির্ধারিত পরিমাণের নাম ছিল 'জমা'। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল এই যে, জায়গিরদাররা নির্দিষ্ট জমার আনুপাতিক হারে রাজস্ব আদায় করতে পারত না। প্রকৃত সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণের নাম ছিল 'হাসিল'। এবং 'জমা' ও 'হাসিল'-এর পার্থক্য মুঘল শাসন-ব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। যতই দিন যেতে থাকে ততই জমা ও হাসিলের মধ্যে পার্থক্য বেড়ে যেতে থাকে।[৬] তাই কাগজ-কলমে আদায়ী রাজস্বের এক হিসাব এবং প্রকৃত ক্ষেত্রে তার চেয়ে কম রাজস্ব সংগ্রহ হওয়া পরবর্তী মুঘল শাসক-শ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্বের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল। কারণ প্রত্যেক মনসবদারই চাইত তার জায়গির এমন হবে যে, প্রকৃত আয় ও কাগজ-কলমে নির্ধারিত আয়ের মধ্যে ফারাক যতদূর সম্ভব কম থাকবে।[৭] জায়গিরদাররা যাতে অত্যধিক ক্ষমতাশালী হয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিতে না পারে, সেজন্যে তাদের জায়গিরকে ৩-৪ বছরের মধ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলি করা হতো।[৮] এছাড়া, মুঘল শাসনব্যবস্থা তার নিজস্ব কর্মচারিদের (কানুনগো, চৌধুরি, ওয়াকিয়ানবিশ, কাজী ইত্যাদি) মাধ্যমে জায়গিরদারদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করেছিল এবং জায়গিরদাররা আইনত সরকারি নির্দেশের এক-পাও বাইরে যেতে পারত না।[৯] এইভাবে মুঘল শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জায়গিরদাররা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল।

এখন বিচার করা উচিত: এই জায়গিরদার তথা মনসবদারদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিন্যাস কেমন ছিল, অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজের কোন কোন অংশ থেকে এই সামন্তরা শোষকশ্রেণী দলভুক্ত হতো? তত্ত্বগত দিক থেকে একথা বলা যায় যে, এই জায়গিরদাররা সম্রাটের ইচ্ছামতো নিযুক্ত হতো। কিন্তু আসলে দেখা যায়, জন্ম ও বংশের ওপরই যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হতো এবং সেদিক থেকে মুঘল সামন্তশ্রেণীর মধ্যে এমন কিছু অভিনবত্ব ছিল না। বিশেষত মুঘল সামন্তশ্রেণী কতকগুলো নির্দিষ্ট জাতি থেকেই নিজেদের জন্যে সদস্য সংগ্রহ করত। এই নির্দিষ্ট দলগুলির মধ্যে ছিল ইরানি (পারস্যদেশ থেকে আগত মুসলিম), তুরানি (মধ্য-এশিয়া থেকে আগত মুসলিম), আফগান, ভারতীয় মুসলিম বা শেখজাদা, দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাজ্য থেকে আগত মুসলিম এবং রাজপুত, মারাঠা প্রভৃতি হিন্দু মনসবদাররা।

এখানে কতকগুলি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমত—আকবর থেকে আওরঙ্গজেব মিত্র অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন এবং যখনি দেখতেন যে কতকগুলো ঐতিহাসিক কারণে কোনো গোষ্ঠী বা জাতি বিশেষ ক্ষমতাশালী হচ্ছে, তখনি তাদের 'মনসব' দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার মধ্যে আনবার চেষ্টা করতেন। আকবরের রাজপুত নীতি বা আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা মনসবদারের অত্যন্ত সংখ্যাবৃদ্ধি এই নীতির নিদর্শন। প্রাক্-মুঘল শাসনকালের বহু ক্ষমতাশালী জমিদার এবং স্বাধীন হিন্দুরাজা এইভাবে মুঘল শাসকদের দলে ভিড়ে পড়েছিলেন। দ্বিতীয়ত—মুঘল শাসকরা এই বিভিন্ন জাতিভিত্তিক গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখতে উৎসাহ দিতেন, যাতে করে এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অন্য গোষ্ঠীর লোকেদের কাজে লাগানো যায়। আবার, যাতে করে একটি পরিবার বা গোষ্ঠীর বংশানুক্রমিক আনুগত্য পাওয়া যায়, যাতে করে সাম্রাজ্যের প্রতি একটি আনুগত্যের ধারা সৃষ্টি করা যায়—সেটাও মুঘল সম্রাটদের একটা উদ্দেশ্য ছিল। এর ফলে রাজপুতদের মধ্যে বিভিন্ন রাজপরিবার 'ওয়াতন' জায়গিরের মাধ্যমে মুঘল শাসকদের কাছে বাঁধা পড়েছিলেন। মনসবদারদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ছিল 'খানাজাদ'রা। তারা হলো বংশানুক্রমিক ভাবে 'মনসবদার' বা 'মনসবদার'দের সঙ্গে রক্তসূত্রে সম্পর্কিত। দেখা যায়, ১৬৫৮-৭৮ খ্রীস্টাব্দে ৪৮৬ জন, ১ হাজার বা তদূর্ধ্ব মনসবদারদের মধ্যে ২১৩ জনকেই 'খানাজাদ' বলে অভিহিত করা হয়েছিল। তত্ত্বগতভাবে জায়গিরদারের মৃত্যুর পরই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি রাজদরবারে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেলেও সাধারণত জায়গিরদারদের বিশেষ কোনো সন্তান রাজদরবারে 'মনসব' পেতেন। স্বভাবতই প্রথমে তাকে উচ্চ 'মনসব' দেওয়া হতো না, কারণ সেখানে যোগ্যতার প্রশ্ন আছে।[১০] এবং এটাও লক্ষ্যণীয় যে, মুঘল সামন্তশ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আনুপাতিক হারের পরিবর্তনও মোটামুটিভাবে একটি সীমার মধ্যে রাখা হয়েছিল। যেমন ১৬২০ সনে উচ্চতম পর্যায়ের ১০০ জন মনসবদারের ২২ জন ছিল তুরানি, ৩৩ জন ইরানি, ৮ জন আফগান, ১১ জন ভারতীয় মুসলিম, ৪ জন অন্যান্য স্থান থেকে আগত মুসলিম, ২১ জন রাজপুত ও ১ জন মারাঠা। ১৬৫৬ সনে ২২ জন ছিল তুরানি, ৩৩ জন ইরানি, ৫ জন আফগান, ১০ জন ভারতীয় মুসলিম, ৩ জন অন্যান্য স্থান থেকে আগত মুসলিম, ২১ জন রাজপুত, ৫ জন মারাঠা ও অন্য সম্প্রদায়ের হিন্দু ১ জন। উচ্চতম পর্যায়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আনুপাতিক হারও খুব একটা বদলায় নি। যদি নতুন নিয়োগ বা উন্নতির ক্ষেত্রেও ধরা হয়, তবে এই ছবিই দেখতে পাওয়া যাবে।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথমভাগে যদি আমরা ২০০০/১৫০০ বা ততোধিক মর্যাদা বিশিষ্ট ২০২ জন মনসবদারদের অনুরূপভাবে বিশ্লেষণ করি তবে দেখা যাবে, তুরানিদের সংখ্যার হার বেড়েছিল শতকরা ১৮'৫%, ইরানিদের ৩৩'৫%, আফগানদের ৭'৫%, ভারতীয় মুসলিমদের ১৩%, অন্য মুসলিমদের ৭%,

রাজপুতদের ১৩·৫%, মারাঠাদের ৭%, অন্ত হিন্দুদের ১%। রাজত্বের শেষ পর্যায়ে এই হার যথাক্রমে—১৫·৫%, ২৪%, ৬·৬%, ১২·৫%, ১২%, ১০·৩%, ১৭%, এবং ৩%। রাজত্বের শেষে মারাঠাদের 'মনসব' পাওয়ার হার অনেক বেড়ে যায়, কারণ তখন দাক্ষিণাত্যের সংগ্রামে জয়লাভের জন্মে মারাঠা সর্দারদের কিনে নেওয়া একটা অপরিহার্য শর্ত ছিল।[১১]

সুতরাং আমরা মুঘল জায়গিরদার তথা মনসবদারদের গঠন সম্পর্কে দু-একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি। প্রথমত—মনসবদাররা কতকগুলো নির্দিষ্ট জাতিভিত্তিক গোষ্ঠী থেকেই নির্বাচিত হতো। হিন্দুদের মধ্যে মারাঠা ও রাজপুত ব্যতীত অন্তদের উপস্থিতি প্রায় ছিল না, এবং মারাঠারাও আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে বিপুল হারে 'মনসব' লাভ করে। আবার এইসব মনসবদারদের নির্বাচনে ক্ষমতা বা উচ্চ বংশের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মুসলিম বা রাজপুত মনসবদারদের নির্বাচনে পরিবার বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কই 'মনসব' প্রদানের সময় প্রধানত বিবেচিত হতো। 'নীলরক্ত'-র ভূমিকা মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না এবং সেদিক থেকে মুঘল সামন্তশ্রেণীর সদস্য হওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবার অন্তদিক থেকে যদি কোনো বিশেষ গোষ্ঠী সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন হতো তবে সবসময় তাদের তোয়াজ করার চেষ্টা চলত। আভিজাত্য অথবা তরবারি—এই দুই নীতির ওপর নির্ভর করেই মুঘল সামন্তশ্রেণী সংগঠিত হতো। এই দুই নীতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই ছিল মুঘল সম্রাটের কাজ এবং এই ভারসাম্য বিনষ্ট হলেই সামন্তশ্রেণী একটি রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হতো। দ্বিতীয়ত—প্রত্যেক গোষ্ঠীই চাইত তার দলের লোকেরাই বেশি করে 'মনসব'-এর অধিকারী হোক, অথবা যে প্রদেশে আপাতশান্তি রয়েছে সেই প্রদেশে 'জায়গির' লাভ করুক। আপন স্বার্থরক্ষার দরুন এই গোষ্ঠীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই থাকত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার চরম প্রকাশ ঘটত সিংহাসন নিয়ে দাবিদারদের মধ্যে লড়াইয়ের সময়। সুদক্ষ সম্রাট এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সুকৌশলে নিয়ন্ত্রিত করতেন। নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হওয়ার অর্থই ছিল শাসকশ্রেণীর মধ্যে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির ফলজাত সম্পদ নিয়ে তীব্র দ্বন্দ্বের সূচনা ও প্রসার। তৃতীয়ত—এই সামন্তশ্রেণীর একটা অংশ প্রায় ভূমিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। রাজপুত ও মারাঠারা, যারা ওয়াতন জায়গিরের অধিকারী তাদের ক্ষেত্রে এই চরিত্র খুবই স্পষ্ট। অন্তদিকে তথাকথিত 'বিদেশী' মুসলিম সামন্তরা, যাদের এদেশে কোনো ভূমিকেন্দ্রিক স্বার্থ ছিল না, তারা ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে এদেশের শাসনব্যবস্থায় একটা 'মৌরুসি' স্বত্বের বন্দোবস্তে সচেষ্ট ছিল। ইরানিরা অনেক বেশি পরিবার কেন্দ্রিক ছিল এবং তারা ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার মাধ্যমে শাসনব্যবস্থায় নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু তুরানিরা অনেক বেশি জাতিগত ভিত্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করত এবং তাদের গোষ্ঠী ফলত

অনেক বেশি সংঘবদ্ধ ছিল, অন্য জাতির লোকেরা তাতে 'স্থান পেত না।

সুতরাং শাসন-ব্যবস্থার ধারাবাহিকতার ঐতিহ্য সৃষ্টি করে, জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ও চেতনার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করে এবং নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত আয়ের জায়গির বণ্টন করে একটি বংশানুক্রমিক 'আমলা' শ্রেণী মুঘল সামন্তশ্রেণীর অপর একটি ভিত্তি ছিল। এরা কিন্তু প্রথমোক্তদের মতো স্থায়ীভাবে ভূমির ওপর নির্ভরশীল বা স্বতন্ত্র ও দেশীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল না। অবশ্য মুঘলযুগের পতনের পরে এদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন স্থানে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থায়ীভাবে বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। তুরানি দলের নেতা চিন্‌কিলিচ খান ওরফে প্রথম আসফ খাঁ নিজাম-উল্-মুল্ক-এর নেতৃত্বে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা—এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

তবে আমাদের আলোচ্য সময়ে মুঘল সামন্তশ্রেণীর দুই দলের এই দুটো ভিত্তির কথা, অর্থাৎ একদিকে ভূমিভিত্তিক দেশজ রাজনৈতিক ক্ষমতা, অন্যদিকে গোষ্ঠী ও পরিবার-ভিত্তিক শাসনতন্ত্রে একটি কায়েমি স্বার্থ ও ঐতিহ্যগত ক্ষমতা, মনে রাখা বিশেষ দরকার। আরো বলা প্রয়োজন, এই দুটো ভিত্তির মধ্যে মোটামুটি একটা সীমারেখা টানা চলতে পারে। বহু জায়গায় বিশেষত প্রথমোক্তদের ক্ষেত্রে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সীমারেখা মিলিয়ে যেত। তথ্যের স্বার্থে আরো বলা যেতে পারে, মনসবদারদের একটি নগণ্য অংশ বিদ্বান ও নানা বিষয়ে দক্ষ লোকেদের নিয়েও গঠিত হতো। সামন্তদের মধ্যে অনেকে বাণিজ্যে লিপ্ত থাকলেও বণিকশ্রেণী থেকে কাউকে বড় একটা মনসবদার করা হয়নি।[১২]

এখন কৃষিতে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির ফল আহরণে এই জায়গিরদারদের ভূমিকা বিচার করা যেতে পারে। রাজস্বের পাঁচ ভাগের ৪ ভাগই জায়গিদাররা পেতেন। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যায় যে, আকবরের সময় রাজস্বের ৮২ শতাংশ ভোগ করত ১,৫৭১ জন মনসবদার। মাত্র ১২ জন মনসবদার ভোগ করত নির্ধারিত জমার ১৮ শতাংশ এবং মাত্র ১২২ জনের হস্তগত ছিল মোট জমার ৫২ শতাংশ। বাকি ১,১৪৯ জন মনসবদার জমার শুধুমাত্র ৩০ শতাংশ ভোগ করত।[১৩] শাহজাহানের রাজত্বের বিংশতিতম (১৬৪৭ খ্রী.) বৎসরে মোট রাজস্বের পরিমাণ ৮৮০ কোটি দাম; তার মধ্যে প্রথম সারির ৪৪৫ জন মনসবদারের বেতনের সামগ্রিক পরিমাণ ছিল ৫৪ কোটি ১০৯ লক্ষ দাম। সমস্ত মনসবদারের সংখ্যা ছিল ৮ হাজার, অর্থাৎ মনসবদারদের শতকরা ৫.৬ ভাগ সমস্ত রাজস্বের শতকরা ৬১.৫ ভাগের অধিকারী ছিল। এদের মধ্যে প্রথম ৭৩ জন অর্থাৎ সমস্ত মনসবদারদের মাত্র ০.৯% রাজস্বের প্রায় ৩৭.৬%-এর অধিকারী ছিল। অন্যদিকে ৭,৫৫৫ মনসবদার অর্থাৎ সমস্ত মনসবদারদের শতকরা ৯৪.৪ ভাগ শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ রাজস্বের অংশীদার ছিল। বাকি অংশ 'খালিসা'র খরচা বা মনসবদারদের নগদ বেতনে খরচ হতো।[১৪] অর্থাৎ প্রায় ৪১০ জন লোক গোটা সাম্রাজ্যের পাঁচ ভাগের ৩ ভাগ রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ করত। সম্পদের এই

প্রচণ্ড কেন্দ্রীকরণ মনসবদারদের মধ্যে দ্বন্দ্বকেও স্বভাবতই তীব্র করেছিল।

সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের রাজস্বের দাবির পরিমাণ করতে পারলে সংখ্যাতথ্যগুলি আরো অর্থবহ হয়। সামগ্রিক উৎপাদনের পরিমাণের আনুপাতিক হারে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিজাত উৎপাদন জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই। সাম্প্রতিক এক হিসাব অনুসারে জানা যায় যে, আকবরের সময় গড়পড়তা রাজস্বের হার ছিল বিঘা প্রতি ৪৫ দাম, সেখানে প্রকৃতপক্ষে হাসিল হতো ৩০ দাম। উত্তর-প্রদেশের সংখ্যাতথ্যই এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি। অর্থাৎ জায়গিরদার জমার মাত্র ৬৬·৭% হাসিল করত। এক্ষেত্রে জমা ও হাসিলের পার্থক্য সহজেই অনুমান করা যায়। নানা কারণে এই জমা ও হাসিলের পার্থক্য হতে পারে। কিন্তু সবকিছু বিচার করলেও রাষ্ট্র সমস্ত কৃষি সম্পদের ন্যূনতম এক-চতুর্থাংশ ভোগ করত।[১৫] তবে কয়েকটি প্রদেশের সংখ্যাতথ্য এবং সাধারণভাবে কয়েকটি দলিলের ভিত্তিতে মোটামুটিভাবে কৃষি-অর্থনীতিতে বিপুল রাজস্বের চাপ অনুমান করা যায়। কৃষক তার জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের জন্যে অতিরিক্ত যাকিছু উৎপন্ন করত, তার সবকিছুই রাষ্ট্র করায়ত্ত করত।[১৬] অসংখ্য পর্যটকের বর্ণনার মধ্যে একটি প্রতিনিধি স্থানীয় বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। পেলসার্ট লিখেছেন:

"কৃষকরা তাদের জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই আয় করত না। পোল্যাণ্ডের ভূমিদাসের সঙ্গে তাদের প্রভেদ সামান্যই ছিল, কারণ এখানে কৃষককে শস্য রোপণ করতে হবে এবং তাদের শ্রমের উপরে কেষ্টবিষ্টু লোকেরা নিজেদের জীবন ও মর্যাদা বজায় রাখত···যখন কর্তিত শস্য জমা করা হতো তখন তার তিনভাগ সামন্ত পেত এবং একভাগ কৃষকের কাছে যেত। তার গৃহস্থালীর প্রয়োজনের চেয়ে সেই অংশ যৎসামান্য বেশি। ফলে এখানে খুব কম লোকেরই সম্পদ আছে এবং জমা হবার আগেই তার অংশ সে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে ভোগ করে।"[১৭]

আকবরের সময়ে প্রত্যেক শস্যের গড়পড়তা উৎপাদনের যে নির্দিষ্ট হার বেঁধে দেওয়া হয়েছিল তার এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসেবে রাষ্ট্রের প্রাপ্য ছিল। যেহেতু রাজস্বের দাবি সাধারণত আর্থিক মূল্যমানে নির্ধারিত হতো এবং সেই মূল্যমান শস্য বপনের সময়ের দামের ভিত্তিতেই ঠিক করতে হতো, সেহেতু কৃষকদের প্রকৃতপক্ষে এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে অনেক বেশি রাজস্ব দিতে হতো। কারণ শস্য কাটার সময়ে বেশি শস্য আমদানির জন্যে বাজারে শস্যের দাম স্বভাবতই কম থাকত। আওরঙ্গজেবের সময় সরাসরিভাবে স্বীকার করাই হলো যে, রাজস্বের পরিমাণ শস্য উৎপাদনের গড়পড়তা হারের অর্ধেকের কম হবে না। এর সঙ্গে আমরা যদি জিজিয়া, বিভিন্ন ধরনের বাজার, হাট, ফলের বাগান, বাণিজ্য ইত্যাদির ওপর আইনসংগত কর এবং জায়গিরদার ও রাজস্ব কর্মচারিদের বে-আইনি অথচ নির্দিষ্ট ধার্যের কথা ভাবি, তবে কৃষি-অর্থনীতিতে

উদ্বৃত্ত উৎপাদন কিভাবে রাজস্বের মাধ্যমে একটি ক্ষুদ্র সামন্তশ্রেণীর মধ্যে বণ্টিত হতো, তার ধারণা করতে পারব।[১৮]

এইসব তথ্যের ভিত্তিতে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, সম্রাট সমেত বিভিন্ন জায়গিরদাররা উদ্বৃত্ত উৎপাদনের এক বিপুল অংশ নিজেরা ভোগ করত। এই জায়গিরদারেরা প্রধানত সামরিক কাজের জন্যেই নিয়োজিত হতো এবং আইন ও শৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করত। তাদের আয়ের চার ভাগের ৩ ভাগই এর জন্যে ব্যয়িত হতো। নিম্নলিখিত সারণি (table) থেকে এই তথ্য অনুধাবনযোগ্য।[১৯]

মনসব	মোট আয় (লক্ষ দামে)	'জাঠ'-এর জন্য আয় (লক্ষ দামে)	মোট আয়ের শতকরা	সওয়ারের জন্য আয় (লক্ষ দামে)	মোট আয়ের শতকরা
জাঠ ৭০০০ ও তদূর্ধ্ব	৭২৪	১২৪	১৭'১	৬০০	৮২'৯
জাঠ ৫-৭০০০	১৪১৭'৭	২২৯'৭	১৬'২	১,১৮০	৮৩'৮
জাঠ ৩-৪০০০	১০৮০'২	২৬৬'৬	২৪'৭	৮১৩'৬	৭৫'৩
জাঠ ৫-৯০০	৭৩৫	২০৯'৬	২৮'৫	৫২৫'৭	৭১'৫

বস্তুত, এরা একটি পরশ্রমজীবী শ্রেণীমাত্র ছিল এবং যেহেতু রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ও স্বার্থে এদের সৃষ্টি, সেহেতু এদের প্রধান শোষকশ্রেণী বলে অভিহিত করা যেতে পারে। আবার এরাই মুঘল রাষ্ট্রশক্তিকে পুষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত করত। স্বাভাবিকভাবে এদের স্বার্থ ও মুঘল রাষ্ট্রশক্তির স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। উদ্বৃত্ত শ্রমজাত সম্পদ সমাজের মুষ্টিমেয়, নগণ্য কয়েকজনের হাতে কুক্ষিগত ছিল। তার থেকে মুঘল কৃষি-অর্থনীতিতে শোষণের তীব্রতা ও চাপ সহজেই অনুমান করা যায়।

৩

জমিদার : প্রকারভেদ ও চরিত্র

জমিদার॥ ভারতের কৃষি-অর্থনীতিতে কৃষকের অনেক কাছের মানুষ জমিদার। গত পাঁচশ' বছর ধরে ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতি সরাসরিভাবে যে শক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, সেই শক্তির একটি প্রধান রূপ হচ্ছে এই জমিদার। সুতরাং এই শ্রেণীর চরিত্র নির্ধারণ ও সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতিতে এদের ভূমিকা স্থির করা, যে কোনো ইতিহাসবিদের কাছে একটি আশু কর্তব্য। প্রথমেই বলে রাখা ভলো যে, জমিদার শ্রেণীটি ব্রিটিশদের সৃষ্টি নয়। অবশ্যই ব্রিটিশ ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার পরে পুরনো চরিত্রে আমূল পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু জমিদার শ্রেণী হিসেবে জন্ম নিয়েছে মুঘল আমলে।[১]

মুঘল আমলে রাজস্ব সম্পর্কিত দলিলে 'জমিদার' শব্দটির সঙ্গে 'মালেক' কথাটির ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। মুসলিম আইনে 'মালেক'-এর অর্থ সম্পত্তির অধিকারী। দলিলে 'জমিদারি' কথাটি দু'ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রথমত—মিলকিয়াৎ-এর (মালিকের অধিকার) বিশেষ রূপ হচ্ছে 'জমিদারি'। দ্বিতীয়ত—জমির ওপর সব রকমের মিলকিয়াৎ-এর অধিকারের কথা 'জমিদার' শব্দের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। আনন্দরাম মুখলিশ লিখেছেন, জমিদারের আক্ষরিক অর্থ হলো—এমন লোক যে জমির কর্তা (সাহিব-ই-জমিন)। কিন্তু বর্তমানে যে লোক গ্রাম বা শহরের জমির অধিকারী এবং কৃষিকার্যে নিয়োজিত, তাকেই

জমিদার বলা হয়।[২] অর্থাৎ কেবল জমি থাকলেই কেউ জমিদার হয় না। যদি বিভিন্ন লোকের দখলিকৃত জমির ওপর কারোর ব্যাপক অধিকার থাকে, সে-ই হচ্ছে জমিদার। দলিলে জমিদারের সঙ্গে জমির চেয়ে গ্রামের সংযোগের কথা বারবার বলা হয়েছে। খাজা ইয়াসিন লিখেছেন—"জমিদারের বিভিন্ন অধিকার হলো মালিকানা, নানকর, সির, যৌথ ইত্যাদি।"[৩] অর্থাৎ জমিদারির সঙ্গে কতকগুলি বিশেষ দাবি সংশ্লিষ্ট এবং সেগুলো একটি বিশেষ শ্রেণীর করায়ত্ত। এই শ্রেণীটি কৃষকের থেকে স্বতন্ত্র এবং কৃষকদের ওপরেই তাদের বিশেষ দাবিগুলি প্রয়োগ করে। সার্বিকভাবে সেইসব অধিকার বা সব রকমের মিলকিয়াৎ-এর অপর নাম জমিদারি। এই শ্রেণীর সঙ্গে জায়গিরদারদের পার্থক্য কি, সেটা স্পষ্ট করে বলা দরকার। জায়গিরদাররা বংশানুক্রমিকভাবে একই জায়গির ভোগ বা হস্তান্তর করতে পারে না। পাঁচহাজারি মনসবের ছেলে পাঁচহাজারি মনসবদার হবেই, তার কোনো অর্থ নেই। জমিতে কোনো প্রকারের মালিকানা স্বত্ব জায়গিরদারদের থাকে না। কিন্তু জমিদাররা বংশানুক্রমিকভাবে জমিদারি ভোগ করতে পারে এবং জমিতে উৎপন্ন সম্পদে তাদের বিশেষ ধরনের অধিকার-স্বত্ব আছে। দ্বিতীয়ত—যে কোনো জায়গিরদারকে সম্রাট যখন খুশি যেখানে খুশি বদলি করতে পারেন এবং জায়গিরদার তার জায়গির নিজের খেয়ালখুশিতে হাতবদল করতে পারে না। সেখানে জমিদার তার অধিকার বিক্রি করতে পারে এবং জমিদারকে সম্রাট নিজের ইচ্ছামতো স্থানান্তরিত করতে পারেন না।[৪] একজন জমিদার যদি ইচ্ছা করে তবে তার জমিদারি বিক্রি করতে পারে। কিন্তু নির্দিষ্ট ত্রুটি ছাড়া কোনো আমলা বা সরকার তার জমিদারি অধিকার কাড়তে পারে না।[৫]

রায়ত-এর সঙ্গে জমিদারের পার্থক্য অধিকার সংক্রান্ত। কৃষক বহু জায়গায় মালিক বলে উল্লিখিত হলেও একমাত্র সেসব কৃষককেই জমিদার বলা যায়—যাদের গ্রামের ওপর কোনোরকম মিলকিয়াৎ অধিকার আছে। যে কৃষক কোনোরকম স্বতন্ত্র বা বিশিষ্ট অধিকারের দাবিদার নয়, তাকে মোটেই জমিদার শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। জমিদার শ্রেণীর উত্থান আমরা মুঘলযুগেই প্রথম দেখতে পাই। দিল্লির সুলতানি আমলে এদের বিক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে মাত্র। মুঘল আমলে এদের উত্থান ভারতীয় ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু কোনো শ্রেণীর উত্থানই একদিনে হয় না, এর পেছনে এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন কাজ করে। এখনো এই প্রক্রিয়ার কথা স্পষ্ট ভাবে জানা যায়নি। এইসব দিকে গবেষণাও অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে। ভারতীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ফাঁকগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম। গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে ভারতীয় ইতিহাসে আমরা পরিবর্তনের আভাস পাই। সেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গেই জমিদার-শ্রেণীর উৎপত্তি জড়িত। কিন্তু প্রচুর উপাদান থাকা সত্ত্বেও সেই যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে

আজও ভালো গবেষণা হয়নি। তাই সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে।

সাধারণ ঐতিহাসিক বাতাবরণ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, গুপ্তযুগের পরে ভারতীয় অর্থনীতিতে একটি ব্যাপক বিপর্যয় দেখা যায়। এ সময় দেখা যায় যে, রোমান বাণিজ্যের অবসান ঘটছে, বন্দর ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং শ্রেষ্ঠী ও কারিগররা প্রতিপত্তি হারাচ্ছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। অষ্টম শতকের পর থেকে বন্দর হিসেবে তাম্রলিপ্তির আর কোনো উল্লেখ নেই; হাজারিবাগের 'দূতপাণি' শিলালিপিতে তাম্রলিপ্ত বন্দরকে অতীতের বিষয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো সামুদ্রিক বাণিজ্য-বন্দর গড়ে ওঠেনি। চতুর্দশ শতকে আমরা সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রাম বন্দরের উল্লেখ পাই। গুপ্তযুগের পরে ভারতে স্বর্ণমুদ্রার সঞ্চয় আবিষ্কৃত হয়নি। অন্তর্বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ স্তূপগুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এর পেছনে ছিল বণিককুলের সমর্থন। তাছাড়া স্তূপগুলি নিজেরাই ব্যবসা ও বাণিজ্য পরিচালনা করত। এই সংঘারামগুলিও তাদের বাঁচার তাগিদে ক্রমশ ভূমিদানের ওপর নির্ভর হয়ে পড়েছিল।

অর্থনীতির এরকম পরিবর্তন সমাজের অন্যান্য ঘটনা দিয়ে চিহ্নিত করা যায়। বাংলাদেশে প্রাপ্ত ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রপট্টলি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, বণিক ও কারিগররা এই সময়ে ক্রমশ সামাজিক প্রতিপত্তি হারাচ্ছিলেন। পঞ্চম শতকে কুমারগুপ্তের 'দামোদরপুর' লিপিতে দেখতে পাই যে, শাসনযন্ত্রের প্রধান সহযোগী হিসেবে বণিক ও কারিগর প্রধানদের জ্ঞাতসারে ভূমি দেওয়া হচ্ছে। নবম শতকে নারায়ণ পালের 'ভাগলপুর' লিপিতে আর আমরা বণিক ও কারিগরের কোনো উল্লেখ পাই না, বরং অনেক রাজপুরুষের নাম পাই। দ্বাদশ শতকের শেষভাগে লক্ষ্মণসেনের 'সুন্দরবন' লিপিতে ভূমিদানের সময় ভূমিজ সামন্তগোষ্ঠীকে সহযোগিতার জন্যে স্পষ্ট আহ্বান করা হচ্ছে। অন্যদিকে বণিকদের নিজস্ব উৎসব শক্রধ্বজ স্থাপনের সময় বলা হতো যে, শক্রধ্বজ বহনকারী বণিকরা আজকাল আর নেই এবং তাদের ধ্বজ আজকাল লাঙ্গলের কাঠ বা পশুবন্ধনের খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কারিগর ও বণিকগোষ্ঠীর সামাজিক প্রতিপত্তি হারানো এবং ভূমিজ গোষ্ঠীর উদ্ভব ক্রমশ সমাজকে কৃষিনির্ভর করছে। এর সঙ্গে মিশেছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। গুপ্তযুগের পতনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শক্তি শিথিল হচ্ছে এবং আঞ্চলিক শক্তির অভ্যুত্থান ঘটছে। পাল, রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার ইত্যাদি শক্তি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আঞ্চলিক রাজ্যগুলি আরো ক্ষুদ্র স্থানিক রাজত্বে রূপান্তরিত হয়। পাল আমলেই চন্দ্র ও বর্ম বংশ রাঢ় ও বঙ্গালদেশে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিহার রাজত্ব ভেঙে চান্দেল্ল ও হিন্দুশাহী রাজবংশের উদ্ভব এবং চালুক্য সাম্রাজ্য থেকে হোয়সল,

কলচুরি ও কাকতীয়দের শক্তি সঞ্চয় এই জাতীয় প্রবণতাকে সুস্পষ্ট করে। স্থানীয় ও প্রান্তিক আত্ম কর্তৃত্বের আদর্শে নিমগ্ন এই রাজ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকত। এইসব রাজ্যগুলির রাজস্ব ছিল সীমিত এবং এদের এলাকাও ছিল সীমাবদ্ধ। কেন্দ্রীয় শাসন বজায় রাখা এই শাসকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে প্রাথমিক উৎপাদকদের কাছ থেকে সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহ করা এদের পক্ষে দুষ্কর ছিল। হয়তো গ্রামাঞ্চলে এর জন্যে এক মধ্যবর্তী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। রাজস্বের জন্যে স্থানীয় শক্তিকে এইসব শ্রেণীর সঙ্গেই বোঝাপড়ায় আসতে হয়েছিল। মণ্ডলিক প্রভৃতি গ্রামীণ নেতৃত্ব এই সময়েই নিজেদের শিকড় অনেক গভীরে প্রসারিত করেছিল এবং এদের উৎপাটিত করা সকলের পক্ষেই শক্ত হয়ে উঠেছিল। বারনির মতে এদের সম্পর্কেই আলাউদ্দিন নাকি বলেছিলেন :

"খুৎ এবং মুকদ্দমরা (খুতান ওয়া মুকদ্দমান) সুন্দর ঘোড়ায় চড়ে, সুন্দর কাপড় পরে (জামাপুরি পকিজে মিপুশান্দ)...নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে...কিন্তু খেরাজ, ঘিজিয়া, কারি এবং চারির জন্যে তারা একটিও জিতল দেয় না।...চাওয়া হোক বা না হোক, এদের মধ্যে অনেকে রাজস্ব দেয় না, বা আমার লোকদের আদর্শ মানে না।"[৬] এইসব শক্তিকেই শায়েস্তা করার জন্যে আলাউদ্দিনের কঠোর নীতি এবং এদের বশে আনার জন্যেই গিয়াসউদ্দিন তুঘলক এদের নানারকম ছাড় দেন। মুহম্মদ-বিন তুঘলকের আমলে দোয়াবের কৃষক বিদ্রোহে এদের ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। নিচুতলা থেকে গ্রাম ও ভূমি-কেন্দ্রিক একটি শক্তির উদ্ভব হয়েছে। তার ফলে যে কোনো শক্তিই আসুক না কেন, নিচুতলার এই শক্তিকে অস্বীকার করার কোনো উপায় তার নেই। মনে হয়, দিল্লির সুলতানি আমলের শাসনের ঐতিহ্য থেকে মুঘলরা এটা ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন। এইসব শক্তিকে শাসনতন্ত্রে স্থান দেবার জন্যেই মনসব বিতরণ, জমিদারদের অধিকারকে নানাভাবে স্বীকার করে নেবার প্রচেষ্টা চলেছিল।[৭]

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র বা কাজের সঙ্গে জমিদারি অধিকারের যোগ ছিল। বহু সময় বহু পরিবার বন কেটে বসত করত, আবাদি জমির ওপর থেকে তাদের স্বতন্ত্র অধিকার রাষ্ট্রশক্তি স্বীকার করত। আনুমানিক ষোড়শ শতকে কোঙ্কনের রত্নগিরি অঞ্চলে মাকুদা গ্রামের এই জাতীয় আবাদি হবার নিদর্শন দেখা যায়। গঙ্গাধর ভট্ট নামে এক ব্রাহ্মণসাধু এই গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। জানা যায়—

"তিনি রুদ্রভূমির (শ্মশান) অঞ্চল পাবার জন্যে প্রার্থনা করলেন এবং জঙ্গল হাসিল করলেন। এই অঞ্চলে গোরু চরাবার চারণভূমি নেই। ফলে তিনি গ্রাম আম্বদা থেকে জমি নিলেন। [রাজা নির্দেশ দিলেন] ওয়াতন হিসাবে সাধু ছাড়া জমির উপর কারো স্বত্ব নেই।" গঙ্গাধর ভট্ট নিজের গোষ্ঠী বা

জাতির মধ্যেই কৃষি এলাকা বণ্টন করলেন। তিনি বিভিন্ন এলাকায় গরুড় স্তম্ভের নির্দেশনামা মারফৎ ১৩টি চিৎপাবন ব্রাহ্মণের বসতি স্থাপন করলেন এবং উৎপন্ন শস্যে তাদের স্বত্বও নানাভাবে বেঁধে দেওয়া হলো।[৮] রাজপুত সামন্তদের উৎপত্তির সঙ্গেও এই প্রক্রিয়া কিছুটা জড়িত। নবম শতকে মাণ্ডুর প্রতিহার রাজবংশের শিলালিপিগুলিতে এইভাবে নতুন আবাদ করে নানা স্বত্ব-দখলের নিদর্শন আছে।[৯] মুঘল আমলে আমরা দেখি যে, গ্রাম জনশূন্য হবার জন্যে এক 'প্যাটেলের' অধিকার নষ্ট হচ্ছে এবং এই আবাদ করার কাজে সফল অন্য 'প্যাটেল' সেই অঞ্চলে 'মালিকানা' অধিকার পাচ্ছে।[১০]

মেইন্‌হা লিখিত পোর্তুগিজ দলিলে গোয়ায় গ্রামের উৎপত্তি নিয়ে বলা হয়েছে :

"প্রত্যেক গ্রামেই কিছু গানকর (গ্রামের প্রধান) আছে। কোথাও এরা সংখ্যায় বেশি, কোথাও সংখ্যায় কিছু কম। এই গানকররা হচ্ছে শাসনকর্তা ও রক্ষক। তারা এই পদ পেয়েছে কারণ পুরনো সময়ে দ্বীপে বা অন্যান্য পতিত জমিতে চারজন লোক নতুন করে আবাদ করেছিল এবং এতটা উন্নতি ঘটিয়েছিল যে সময়ে সেখানে বিরাট বসতি গড়ে ওঠে। সুশাসন সুবন্দোবস্ত ও কৃষিকাজের প্রসার করার জন্যে আদি বাসিন্দাদের গানকর বলা হয় এবং অন্যদের উপর প্রভুত্ব কায়েম করার ও উচ্চতর ক্ষমতা স্থাপন করার অধিকারী তারা হয়।"[১১]

গ্রাম আবাদি করার প্রক্রিয়া থেকেই উচ্চতর ক্ষমতাভোগী শ্রেণীর উদ্ভবের কথা এখানে বলা হয়েছে। মূল আদি গ্রামগুলো বিশেষ সামাজিক মর্যাদা পেত। এই দলিল অনুসারে, গোয়ার ৩১টি গ্রামের মধ্যে ৮টি গ্রাম সামাজিক ক্রিয়াকলাপে মুখ্য ভূমিকা নিত। আবার তার মধ্যে দুটি গ্রামের মর্যাদা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। উত্তর-ভারতে এইরকম গ্রামের অস্তিত্ব দেখা যায়। মূল আদি গ্রামকে বলা হয় খেরা। তার থেকে বেরিয়ে আসা ছোট গ্রামকে বলা হয় 'মাজরা' বা গরহি।

জলন্ধর দোয়াবে বিলায়েতপুর গ্রামে সহোতা জাঠদের বসতি স্থাপনের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, পঞ্চদশ শতকে ঐ অঞ্চল 'ধকদার' নামে গাছের জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বরাপিন্দ এলাকায় প্রথম ঐ জাঠরা এসে বসতি স্থাপন করে এবং এই এলাকাকে ঘিরে আরো গ্রাম স্থাপন করে। প্রথম পর্যায়ে ৬টি গ্রামের একই সীমা ছিল এবং বন কেটে বসত করে জমির উপজাত সম্পদের ওপর ঐ গোত্রের জাঠরা কর্তৃত্ব বিস্তার করে।[১২]

এর পেছনে আরেক ধরনের প্রক্রিয়াও কাজ করেছে বলে মনে হয়। বর্ণসমাজ প্রসারিত হয়ে নিজেদের অধিকার বিস্তারিত করে সেই অঞ্চলের পুরনো গোষ্ঠী-দের ওপর নিজেদের স্বতন্ত্র দাবি স্থাপিত করেছিল—তারও কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকে ফররুখাবাদ অঞ্চলে প্রাপ্ত দলিল থেকে দেখা যায়,

কচ্চি ও চামাররা গ্রামের প্রাচীন অধিকর্তা ছিল। পরবর্তীকালে তাদের অধিকার শেখজাদা ও হিন্দু উচ্চবর্ণের কাছে হস্তান্তরিত হয়।[১৩] আবার গোরখপুর অঞ্চলে দেখা যায় যে, আদিবাসী ডোমদের কাছ থেকে শ্রীনেৎ রাজপুতরা স্বত্ব কেড়ে নিয়ে নিজেদের উচ্চতর অধিকার দাবি করেছিল।[১৪]

বিহারের মুঙ্গের অঞ্চলে কাহালগাঁওয়ের জমিদার ভরাকর রাজ পরিবারের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণ। তারা রায়বেরিলি থেকে এই অঞ্চলে আসে। কালওয়ার বর্ণভুক্ত (মদ চোলাইকারী বা কামার) জানকীরাম তখন এই অঞ্চলের জমিদার। এই কালওয়ার গোষ্ঠীকে সশস্ত্র সংগ্রামে পরাস্ত করে ব্রাহ্মণ হীরানন্দ অঞ্চলে জমিদারি লাভ করেন। এলাহাবাদের পরগনা বারায় ভার উপজাতিকে রাজপুতরা বিতাড়িত করে নিজেদের জমিদারি কায়েম করে। উনাওতে কোলোর ও লোধদের তাড়িয়ে গুহিলোট ও চান্দেলরা তাদের অধিকার কায়েম করে।[১৫]

রাজস্থানেও উপজাতিদের দাবিয়ে রাজপুত গোষ্ঠীর কৃষিজাত সম্পদ আহরণে বিশেষ অধিকার দাবি করার আভাসও শিলালিপিতে ও চারণগীতিতে পাওয়া যায়। রাঠোর, গুহিলোট, চৌহান, ভীল, শবর, মীনা, মেদা ইত্যাদি উপজাতিদের ওপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সামন্ত অধিকার পায়।[১৬] বেরিলিতে ধোবা ও পালকিবাহক ইত্যাদি উপজাতি ও নিম্নবর্ণের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে ত্রিলোকচাঁদের নেতৃত্বে বায়েস রাজপুতরা শক্তিশালী হয়।[১৭]

আবার কেউবা মুঘল সাম্রাজ্যবিস্তারে সহযোগিতা করেও এই অধিকার পান, বা অধিকার বিস্তৃত করে। সুসঙ্গ জমিদারি বা শাহজাহানের আমলে আসামের গোয়ালপাড়ার জমিদারি অনেকটা এই প্রক্রিয়াজাত। বর্ধমান জমিদারের আদিপুরুষরা মহাজনী ও ব্যবসা করতেন। আবু রায় এক সংকটপূর্ণ অবস্থায় সংগ্রামরত মুঘল সৈন্যকে খাদ্য সরবরাহ করে ১৬৫৭ সনে 'চৌধুরি'র অধিকার পান। ভবানন্দ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহকে সাহায্য করে কানুনগোগিরি পান ও কৃষ্ণনগরের রাজপরিবার স্থাপন করেন।

১৬৮০ সনে রাজস্থান থেকে পাওয়া ফরমানে জানা যায়, পরগনা মলপুরের জমিদারি হরি সিংকে দেওয়া হচ্ছে, কারণ ঐ অঞ্চলে আইন ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁকে জমিদার হিসেবে ঐ অঞ্চলের মুকদ্দমরাও স্বীকার করেছে।[১৮]

এখন এই জমিদারদের মালিকানা অধিকারের (মিলকিয়াৎ) অর্থ কি, সেটা বিচার করতে হবে। এই অধিকারের মৌল উদ্দেশ্য হলো জমিদারদের কিছু আয়ের উপায় স্থির করা। অযোধ্যা থেকে প্রাপ্ত দলিল থেকে আমরা জানতে পারি, জমিদারের দুটি দাবি আছে—রসুম-ই জমিদারি ও হকুক-ই জমিদারি।[১৯] অর্থাৎ জমিদাররা কৃষকের উৎপাদনের একটি অংশের দাবিদার। এই দেয় অংশটি কিন্তু রাজস্ব থেকে পৃথক। জমিদারদের বিশিষ্ট অধিকার যে রাষ্ট্রের

অধিকার থেকে পৃথক, তা আরেকটি ব্যবস্থায় খুব স্পষ্ট। যখন রাষ্ট্র সরাসরি রাজস্ব আদায় করে তখন কিন্তু জমিদারকে রাষ্ট্র তার রাজস্বের কিছু অংশ দেয়। "মালিকানা জমিদারের অধিকার। যখন তারা জমিদারের জমিকে সরাসরিভাবে নিজেরাই পরিমাপ করে ও রাজস্ব সংগ্রহ করে তখন তারা জমিদারকে একশত বিঘা বা শত মণ প্রতি কিছু অংশ দেয় (শর্ত অনুযায়ী), কারণ জমিদার হচ্ছে মালিক।"[২০] অর্থাৎ জমিদারের যে একটি বিশেষ স্বত্ব আছে সেটা মুঘল রাষ্ট্র স্বীকার করেছিল। আবার, বাংলা দেশে জমিদাররা রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট রাজস্ব দিয়ে দিত এবং তার নিজের সংগ্রহের সঙ্গে দেয় রাজস্বের পার্থক্যটাই ছিল তার লাভ। সেখানে সে রাষ্ট্রের জন্যে রাজস্ব সংগ্রহকারী হিসেবে বিনা খাজনায় কিছু জমি দখল করতে পারত। "যেখানে সে নিজেই রাজস্ব সংগ্রহ করে সেখানে সে মালিকানার অধিকারী নয়, বরং 'নানকারে'র অধিকারী (সেবার জন্যে কিছু ভাতা)।"[২১]

জমিদাররা তাদের প্রাপ্তি নগদ অর্থে বা খাজনামুক্ত জমির মাধ্যমে লাভ করত। গুজরাটের ক্ষেত্রে বলা হয় তাদের গ্রাম ও জায়গার এক-চতুর্থাংশ, যাকে গুজরাটি ভাষায় বলা হয় 'বন্‌দ্'—যেখানে তাদের রাখা হলো। বাকি ৩ ভাগ, যাকে বলা হয় 'তলপাদ্'—তা সরাসরিভাবে রাষ্ট্রের আয়ত্তে থাকল।[২২] কিন্তু গুজরাটের পোরবন্দরের জমিদার মোট রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ নগদ অর্থেই সংগ্রহ করতেন। সুবা অনুযায়ী জমিদারের মালিকানার শতকরা হার-এর মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। উত্তর-প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই হার ছিল রাজস্ব সংগ্রহের শতকরা ১০ ভাগ, যেখানে গুজরাটে ধার্য হতো চার ভাগের ১ ভাগ। এছাড়া, জমিদারদের কিছু অতিরিক্ত কর ধার্য করার ক্ষমতা ছিল। যেমন, বিবাহের ওপর কর, বাড়ির ওপর কর, নিজেদের এলাকায় ব্যবসায়ীদের ওপর কর এবং বিভিন্ন অঞ্চলে হাটতোলা থেকে আয় ইত্যাদি জমিদারদের সমৃদ্ধির অন্যতম উৎস ছিল।[২৩] জমিদার ইচ্ছা করলে কিছু কিছু নিম্নবর্ণের কাছে নিখরচায় শ্রমও দাবি করতে পারত।

অতএব জমিদারের অধিকারের দুটি স্বরূপ আছে। একদিকে—জমিদারদের জমির ওপরে বিশেষ একজাতীয় স্বতন্ত্র অধিকার আছে। অন্যদিকে—বহু জায়গায় জমিদাররা গ্রামে রাজস্ব সংগ্রহ করে। আবার, তারাই কৃষকের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংযোগ রক্ষার অন্যতম প্রধান সূত্র। এই দুটি অধিকারই স্বীকৃত এবং স্বতন্ত্র। যদি কোনো জমিদার কোনো গ্রামের বা অঞ্চলের নির্দিষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ না করে, তবুও সে তার বিশেষ মালিকানা অধিকারের আয় থেকে বঞ্চিত হয় না। তখন রাষ্ট্র নিজে রাজস্ব সংগ্রহ করলেও জমিদারকে কোনো-না কোনো উপায়ে উদ্বৃত্ত শ্রমজাত সম্পদের কিছু অংশ প্রদান করে। জমিদারের এই যৌথ অধিকারই কৃষক ও জায়গিরদারদের কাছ থেকে তাকে পৃথক করেছে।

একথা বলে রাখা দরকার যে, উদ্বৃত্ত সম্পদে জমিদারদের হিস্যা রাজস্বের দাবির পরিমাণের চেয়ে অনেক কম। একথা জমি কেনাবেচার দলিল থেকে সহজেই প্রমাণ করা যায়। জমিদারির বিক্রয়মূল্য সাধারণত তার বার্ষিক আয়ের ৩ বা ৪ গুণ। (অর্থাৎ আগামী ৩ বা ৪ বছরের আয় ঐ দামের মধ্যে ধরা হতো।) কিন্তু এই আয় রাজস্বের চেয়ে খুব বেশি হতো না। যেখানে ইংরেজরা কলকাতার জমিদারি ১ হাজার টাকায় কেনে, সেখানে তাদের বার্ষিক খাজনা দিতে হতো ১,১৯৪ টাকা। অযোধ্যার পরগনা হিসামপুরের দুটি গ্রামে জমিদারির বিক্রয়মূল্য ৩০১ টাকা,—সেখানে দেয় খাজনা হচ্ছে ২৩৯ টাকা। অর্থাৎ রাষ্ট্র রাজস্ব গ্রহণ করার পর উদ্বৃত্ত অংশের যা কিছু বাকি থাকত, তাই জমিদার পেত।[২৪]

জমিদারদের অধিকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এই অধিকার বিক্রয়ের যোগ্য ছিল এবং বংশানুক্রমিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমস্ত লক্ষণই এর মধ্যে ছিল। "মাওয়ারের জমিদার হলো রাজা যশোবন্ত সিংয়ের সম্পত্তি। তার মৃত্যুর পরে অধিকারক্রমে ও বংশানুক্রমিক ভাবে তার সন্তানদের কাছে যাওয়া উচিত।"[২৫] জমিদারির অধিকার একক হিসেবে ধরা হতো না, বরং তা বিভাজ্য ছিল। কারণ অনেক সময় এই অধিকার একাধিক উত্তরাধিকারীর মধ্যে বণ্টিত হতো। ফলে বহু জায়গায় একটি গ্রামের জমিদারির আয়ের এক অংশমাত্র একজনেরই ভাগে পড়ত। অর্থাৎ এই বিক্রয়ক্ষমতা এবং উত্তরাধিকার আইনের পূর্ণ প্রয়োগ প্রায়ই জমিদারি ব্যবস্থার চরিত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন আনবার সুযোগ করে দিয়েছিল। অনেক সময়েই বিশাল জমিদারি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে, বা ছোট ছোট জমিদারি থেকে বড় জমিদারির সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, মহাজন শ্রেণীও অনেক জায়গায় জমিদারির অধিকার কিনেছে।

এখানে একটা কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। জমিদার কিন্তু তার গ্রামের কৃষকদের জমির মালিক নয়। জমিদারের অর্থ জমির ওপর সম্পত্তির অধিকার নয়। এটা উদ্বৃত্ত সম্পদের ওপর একটি অধিকার এবং জমিতে অন্যান্য অধিকারের সঙ্গে এই অধিকারও পাশাপাশি বজায় ছিল। কিন্তু জমিদারের গ্রামে নিছক জমির ওপর ভোগদখল বা অন্যান্য ব্যক্তিগত অধিকারের স্বত্ব কৃষকেরই থাকত। জমিদারের নিজস্ব কিছু জমি ছিল—যেখানে সে কৃষক হিসেবে নিজে চাষ করত বা চাষের জন্যে ভাগচাষী লাগাত। কিন্তু যে জমিতে কৃষক নিজে সেচ-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করেছে, সেই জমিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার সাধারণত জমিদারের থাকত না। দ্বিতীয়ত—জমিদারির কেনাবেচায় জমিদারের রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার এবং নিজের মিলকিয়াৎ-এর জন্যে রাজস্বের থেকে নিজের হিস্যা বিক্রি হতো। কখনো সেই গ্রামের বিভিন্ন ধরনের কৃষকদের জমির ওপর বিভিন্ন ধরনের দখলি ভোগস্বত্ব বিন্দুমাত্র ব্যাহত হতো না। অর্থাৎ 'দেহাত-ই তালুক'-এর জমি থেকে কৃষকের পরিশ্রমলব্ধ উদ্বৃত্ত শ্রমের

ওপর জমিদারের অধিকার বিক্রয় হতো মাত্র, কৃষিযোগ্য জমি নয়। অবশ্য জমিদারের দেহাৎ-ই-তালুকের জমির ওপর অন্য জাতীয় অধিকারও ছিল। নতুন কৃষক বসাবার ক্ষমতা বা কৃষকের কেউ না থাকলে, তার জমির বন্দোবস্ত করা জমিদারের আয়ত্তাধীন ছিল। বিশেষত, গ্রামে নতুন কৃষক বসানো এবং যাকে খুশি জমি দেবার ক্ষমতা জমিদারের বিশেষ অধিকারের মধ্যে ছিল।[২৬]

জমিদারের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আরো কয়েকটি কথা বলে রাখা দরকার। প্রথমত—জমিদার যদি বিদ্রোহী বা 'জোর তলব' না হয়, তবে জমিদারকে তাঁর অঞ্চলে মোটামুটিভাবে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দেওয়া হতো। কিন্তু যেহেতু জমিদারকে সাধারণত রাজস্ব আদায়ের জন্যে দায়ী থাকতে হতো, সেজন্যে তার অধিকারকে বলা হতো 'খিদমৎ' বা সেবা।[২৭] এরই ফলে রাষ্ট্র দাবি করত যে, যদি কোনো জমিদার বিদ্রোহ করে বা ঠিকমতো 'মালগুজারি' বা রাজস্ব না দেয়, তবে মুঘল সম্রাট তাকে সরিয়ে দিয়ে অন্য কোনো অনুগত লোককে তার জায়গায় বসাবেন। "সম্রাট যে কোনো জমিদারকে নাকচ করতে পারেন যদি জমিদার কোনো দোষ করে।"[২৮] সাধারণত দেখা যায় যে, ঠিক মতো খাজনা না দিলে বা বিদ্রোহ করলেই জমিদারকে সরানো হতো। অন্যথায় জমিদারের অধিকারে সম্রাট হস্তক্ষেপ করতেন না। দ্বিতীয়ত—জমিদারকে দেখতে হতো যে তার এলাকায় সব জমি চাষ হচ্ছে কিনা এবং নিজের এলাকার শান্তিরক্ষার দায়িত্বও তাদের ছিল। তৃতীয়ত—স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকলেও মুঘল জমিদার যা খুশি তাই করতে পারত না। উদ্বৃত্ত সম্পদে জমিদারদের অংশ আইন ও প্রথা অনুযায়ী নির্ধারিত ছিল, ইচ্ছামতো তার হার জমিদার বাড়াতে পারত না। যখনই জমিদাররা সেই হার বাড়াতে চেষ্টা করেছে তখনই সেটা অন্যায্য বলে সমসাময়িকদের কাছে মনে হয়েছে, এবং তার বিরুদ্ধে সম্রাটের কাছে আবেদন করার রীতি ছিল।[২৯]

সাধারণভাবে জমিদারের অধিকার বর্ণনা করা হলো। এই ব্যাখ্যা থেকে সুস্পষ্ট যে, একদিক থেকে জমিদারদের অধিকার মুঘল রাষ্ট্রের আশ্রয় ছাড়াই স্বতন্ত্রভাবে ঐতিহাসিক কারণে গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে কিছু দায়িত্ব দিয়ে মুঘলরা তাদের নিজেদের শাসন-ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করতে চাইছিল। কিন্তু জমিদারদের নিজেদের মধ্যেও নানা স্তরভেদ ছিল এবং সেই স্তরভেদে মুঘলদের নীতিও পৃথক ছিল।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, জমিদারশ্রেণীর মধ্যে স্তরভেদ ছিল। একদিকে ছিল ভূম্যধিকারীরা। তারা স্থানীয়ভাবে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী ছিল। অপরদিকে ছিল প্রাথমিক স্তরে খুদে জমিদাররা—যারা একদিকে কৃষক ও অন্যদিকে জমিদার। আর এদের মধ্যে আরেক জাতীয় অন্তর্বর্তী জমিদারদের অস্তিত্ব ছিল। বহু ক্ষেত্রেই এই ৩টি স্তরের মধ্যে সংমিশ্রণ ও সংযোগ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জমিদারশ্রেণীর মধ্যে এই ৩টি স্তরের অবস্থিতি সুস্পষ্ট।[৩০]

সাধারণত প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল নানা ধরনের সামন্ত মহারাজারা। এঁরা রাজা, রানা, রায় ইত্যাদি উপাধিভূষিত ছিলেন। এই সমস্ত সামন্ত রাজারা নিজেদের রাজ্যে স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতেন। 'মনসব' ও 'জায়গির'-এর মাধ্যমে মুঘল সম্রাটরা এদের মুঘল শাসনব্যবস্থার অঙ্গীভূত করতেন। দ্বিতীয়ত—অনেক সময় উত্তরাধিকার প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করে মুঘল সম্রাট নিজের অধিকার বজায় রাখতে চাইতেন। জাহাঙ্গীর বিকানিরের রাজার মৃত্যুর পর ছোট ছেলের দাবিকে নাকচ করে বড় ছেলেকেই রাজা বলে স্বীকার করেছিলেন। আবার, শাহজাহান মাড়ওয়ারের ক্ষেত্রে উল্টো নীতি অনুসরণ করে যশোবন্ত সিংকেই স্বীকার করলেন। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং দরবারে সামন্ত রাজাদের একজন প্রতিনিধি হাজির থাকার নিয়ম সমস্ত নৃপতিদের ওপর মুঘলদের অধিকারকেই প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তৃতীয়ত—অনেক সময় মুঘলরা সরাসরিভাবে বহু সামন্ত রাজার অধীনস্থ সর্দারদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করত; এমনকি সর্দারদের নবাগত অনেক সৈন্য-সামন্ত রাজার চেয়েও উচুস্তরের হতো। মাড়ওয়ারে দুর্গাদাসের নিদর্শনএর সবচেয়ে বড় প্রমাণ।[৩১] চতুর্থত—বেশির ভাগ সামন্তরাজাই ছিল 'পেশকাশী'। সাধারণত, এই জমিদাররা একটা নির্দিষ্ট রাজস্ব দিত। অন্যান্য জমিদারদের মতো এদের জমি ও ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে জরিপ করা হতো না, বা সেই ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারিত হতো না। এদিক দিয়ে এরা মাল-ওয়াজির' (অর্থাৎ যাদের রাজস্ব ক্ষেত্রের জরিপের ভিত্তিতে ধার্য করা হতো)—জমিদারদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল।[৩২] তথাপি বহু জায়গায় সম্রাটরা কৃষির বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং অনেক সময় বহু 'পেশকাশী' জমিদারকে 'মাল-ওয়াজির' জমিদারে পরিণত করেছেন। বীরভূমের রাজাই তার অন্যতম উদাহরণ।[৩৩] আবার, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে নানারকম নিয়ম-কানুনও অনেক সময় সামন্ত রাজাদের মুঘল শাসনের আওতায় আসতে বাধ্য করেছিল।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও সামন্তরাজারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীনই ছিল। আইন ও শৃংখলা বজায় রেখে এবং মুঘল শাসনের কাছে সামরিক ও অন্যান্য দিক দিয়ে আনুগত্য স্বীকার করলে নিজেদের 'ওয়াতন' জায়গিরের উদ্বৃত্ত সম্পদ বণ্টনের নিরংকুশ অধিকার তাদের ছিল। সেই সম্পদের সিংহভাগ অন্যান্য জমিদারদের তালুকের মতো রাষ্ট্র দখল করত না। তার বণ্টনের বিধান ও নিয়ন্ত্রণ সামন্তরাজার শাসনব্যবস্থা অনুযায়ী হতো। মাড়ওয়ারে 'পাট্টাদারি' ব্যবস্থার প্রচলন সামন্ত রাজাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ আহরণে ও বণ্টনে দক্ষতা, ক্ষমতা ও স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন।

দ্বিতীয় শ্রেণী বা মধ্যবর্তী জমিদাররা হচ্ছে প্রাথমিক জমিদার এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যোগসূত্র বিশেষ। এদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এই অধিকারের সঙ্গে জমির ওপরে কোনো স্বতন্ত্র অধিকার বা স্বত্বের সম্পর্ক জড়িত ছিল না।

এর সঙ্গে জড়িত ছিল সেবার সম্পর্ক, কাজের সম্পর্ক; মধ্যযুগীয় দলিলে যাকে বলা হয় 'খিদমৎ'। এই জাতীয় জমিদাররাই মধ্যবর্তী শ্রেণীতে অবস্থান করত। রাজস্ব সংগ্রহে ও আইন-শৃংখলা রক্ষায় রাষ্ট্রকে এই জমিদাররা সাহায্য করত এবং তার ফলে নানারকম সুযোগ সুবিধা পেত ও উদ্বৃত্ত সম্পদের একাংশ ভোগ করত। চৌধুরি, মুখিয়া, মুকদ্দম, কানুনগো, দেশমুখ, দেশাই, দেশপাণ্ডে, তালুকদার ইত্যাদি নামে এই শ্রেণীকে অভিহিত করা হতো। মুকদ্দম বা মুখিয়া সাধারণত গ্রামের প্রাথমিক জমিদারদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত করা হতো। সাধারণত চৌধুরি নির্বাচিত হতো পরগনার ভিত্তিতে। তার কাজ ছিল জায়গিরদার বা রাষ্ট্রকে রাজস্ব সংগ্রহে সাহায্য করা। কানুনগোর কাজ ছিল জমি সংক্রান্ত সমস্ত সংখ্যাতথ্য জোগাড় করা, তা রক্ষণাবেক্ষণ করা ও জরিপের সময় রাষ্ট্রের সহযোগিতা করা. দাক্ষিণাত্যে চৌধুরি ও মুকদ্দমের অধিকারকেই দেশমুখ বা দেশপাণ্ডে বলে স্বীকার করা হতো। তালুকদারও হলো এক বিশেষ ধরনের জমিদারদের অধিকার। অযোধ্যা ও বাংলাদেশে এই অধিকার প্রচলিত থাকলেও এদের রূপ হলো স্বতন্ত্র। বাংলাদেশে সাধারণত তালুকদার হলো সেইসব ভূম্যধিকারী, যারা জমিদারের মাধ্যমে সরকারকে রাজস্ব দিত। আবার অযোধ্যায় তালুকদার হলো সেই সমস্ত জমিদার—যারা অন্য জমিদারদের হয়ে সরকারকে খাজনা জমা দিত।

অযোধ্যায় তালুকদারদের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। তালুকদার শুধু নিজেই জমিদার নয়, অন্যান্য জমিদারি গ্রামের রাজস্ব সংগ্রহের জন্যে দায়ী। ইজারাদারি ও তালুকদারি অধিকারের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, ইজারাদার জমিদার নয়—বা তার অধিকার বংশানুক্রমিক নয়। আবার, ইজারাদার যেখানে সরকারের প্রতিনিধি এবং অনেক সময়েই গ্রামীণ জগতের বাইরের লোক, তালুকদার সেখানে জমিদারের প্রতিনিধি। বাংলা দেশে তালুকদারদের ভূমিকা স্বতন্ত্র। সাধারণত, জমিদারি অধিকারের বিভিন্ন 'হিস্যা' বা অংশের ব্যাপক ক্রয়-বিক্রয় থেকে এই মধ্যস্বত্ব ভোগীদের উদ্ভব হয়। তালুকদার ও জমিদারদের অধিকারের ধরন একই ছিল। কেবল তালুকদারদের জন্যে সব সময় রাষ্ট্রীয় অনুমোদন বা সনদের দরকার পড়ত না। তালুকদারি অধিকার সাধারণত দুইভাগে বিভক্ত ছিল—হুজুরি ও মজকুরি। হুজুরি তালুকদাররা সরাসরি সরকারকে রাজস্ব জমা দিত। মজকুরি তালুকদাররা অন্য জমিদারদের মাধ্যমে রাজস্ব পাঠাত।

এইসব জমিদারদের নানারকম অধিকার ছিল। তারা তাদের সেবার বদলে নিজেদের রাজস্ব থেকে ছাড়, আবওয়াবের অংশ, নিষ্কর জমি ইত্যাদি লাভ করত। সাধারণত এই জমিদাররাও বংশানুক্রমিক ভাবে অধিকার ভোগ করত, কিন্তু রাষ্ট্র ইচ্ছা করলেই এদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারত। আকবর এলাহাবাদের চৌধুরিকে বরখাস্ত করেছিলেন, কারণ সে ত্রিবেণীর তীর্থযাত্রীদের ওপর হামলা করত। আওরঙ্গজেব একটি পরগনায় দুটির বেশি চৌধুরি থাকলেই তাদের

পদচ্যুত করার আদেশ দিয়েছিলেন। আবার, অনেক সময় মুঘল সম্রাটরা এই ধরনের জমিদারিও সৃষ্টি করেছেন। আকবর আইন ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্যে ত্রিহুতে গোপালদাসকে চৌধুরি ও কানুনগোর অধিকার দেন এবং তারই ফলে দ্বারভাঙ্গার রাজবংশের জন্ম হয়। সুতরাং এদের এই জাতীয় অধিকার মুঘল রাষ্ট্রশক্তির ওপরই নির্ভরশীল ছিল।[৩৪]

মধ্যবর্তী স্তরের জমিদারদের নিচেই থাকত 'মালগুজারি' জমিদাররা। জমির ওপর এদেরই একটি স্বতন্ত্র ধরনের স্বত্ব থাকত। এরা শুধুমাত্র নিজেরা বা অন্যের সাহায্যে চাষই করত না, গ্রামের ওপরে 'মালিকানা'র অধিকারও তাদের ছিল। এদের মাধ্যমেই কৃষকদের ওপর রাজস্ব ধার্য হতো এবং নিজেদের স্বত্বের পরিবর্তে এরা রাজস্বের একটা অংশ লাভ করত। এর সঙ্গে সেবার কোনো সম্পর্ক নেই, বরং স্বত্বের সম্পর্ক জড়িত ছিল।

জমিদারদের স্তর-বিভাগের বিশ্লেষণ শেষ করে আমরা মুঘল জমিদারদের সামগ্রিক শ্রেণী-চরিত্র সম্পর্কে দুয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। প্রথমত—এই শ্রেণী একটি সশস্ত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিল। আবুল ফজল লিখেছেন—"জমিদারদের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ৪৪ লাখেরও বেশি।"[৩৫] এছাড়া আইনের সংখ্যাতথ্যের সারণিতে 'জমিদার' কল্যাণের পাশেই পদাতিক ও অশ্বারোহীর হিসাব দেওয়া আছে। এলাহাবাদের বিভিন্ন পরগনায় প্রাপ্ত দলিল থেকে জানা যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদাররাও নিজেদের সশস্ত্র দল নিয়ে রাজস্ব আদায়ের জন্যে ছোট ছোট মাটির কেল্লা তৈরি করত এবং তা সম্পূর্ণ আইনসম্মত ছিল। এই কেল্লার রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্যে জমিদাররা সশস্ত্র অনুগামী দল রাখত। বর্ণ বা গোত্র অনুযায়ী গ্রাম গঠিত হবার ফলে জমিদাররা নিজেদের জাতি বন্ধনের মাধ্যমেই সামরিক শক্তি গড়ে তুলত। মধ্যযুগীয় দলিলে বর্ণ বা গোত্রের সঙ্গে 'উলুস' (মধ্য এশিয়ার উপজাতি ভিত্তিক সামরিক বাহিনী) শব্দের ব্যবহার বিশেষ অর্থবহ। এছাড়া, নানারকম নিষ্কর জমি (পাইকান, চাকরান ইত্যাদি) দিয়ে জমিদাররা অন্যান্য বর্ণ বা গোত্রের লোকদেরও নিজেদের সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করত। সমস্ত দলিলে 'জমিনদারান্ জোরতলব' এবং 'রাইয়তি সরকশথ'-এর উল্লেখ আছে এবং তার অর্থই হচ্ছে—বিদ্রোহী জমিদার ও কৃষকদের দলবল। দ্বিতীয়ত—জমিদাররা এক জাতীয় বিশেষক্ষমতার অধিকারী ছিল এই ক্ষমতা যেরকম সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী থেকে উদ্ভুত হচ্ছে, অন্যদিক থেকে স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে যোগাযোগ থেকেও তার জন্ম হয়েছে। গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে বর্ণ বা জাতিগত যোগাযোগ, জমির উৎপাদন ক্ষমতা এবং স্থানীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে ধ্যানধারণা জমিদারকে এক বিশিষ্ট ক্ষমতায় ভূষিত করেছে। অবশ্য এই ক্ষমতা স্থানীয়, ব্যাপক নয়। জমিদারদের মধ্যে নানা গোত্র ও বর্ণের অবস্থিতি এবং ভৌগোলিক অবস্থা তাদের বিচ্ছিন্নতা বোধকে জাগিয়ে রাখত। ফলে, 'মুঘল-ই আজম'-এর ব্যাপক ও কেন্দ্রীভূত শক্তির বিরুদ্ধে জমিদারদের

স্থানীয় শক্তি দুর্বল বলেই প্রতিভাত হয়। আবার, বিচ্ছিন্ন ও বিস্তৃত বলেই জমিদারদের বিদ্রোহকে দমন করা বা তাদের অবজ্ঞা করা কখনোই কেন্দ্রীভূত মুঘল-শক্তির পক্ষে সম্ভব হয়নি। তৃতীয়ত—জমিদাররা নিশ্চিতভাবে একটি শোষক শ্রেণী। কিন্তু এই শ্রেণী জায়গিরদারদের থেকে আলাদা। উদ্বৃত্ত সম্পদের একাংশ মাত্র এরা ভোগ করত, সিংহভাগ রাষ্ট্রই পেত। সেখানেই সুপ্ত ছিল সংঘর্ষের বীজ। চতুর্থত—জমিদারদের ভিন্ন স্তরভেদ থাকলেও একশ্রেণীর জমিদার প্রায়ই অপর শ্রেণীর জমিদারে রূপান্তরিত হতে পারত। একটি গ্রামের প্রাথমিক-জমিদার কিন্তু অন্য গ্রামে মধ্য জমিদারের ভূমিকা পালন করতে পারত। এছাড়া, বহু জমিদারই বিভিন্ন ধরনের অধিকার ক্রয় করেছিল বা করবার চেষ্টা করেছিল।[৩৬]

মধ্যবর্তী স্তরের জমিদারদের ক্ষেত্রে এরকম নিদর্শন বোধহয় দেওয়া যায়। কেউ কেউ মুঘল সম্রাটদের সাহায্য করে বিস্তৃত জমিদারি পেয়েছিল। আকবরের আমলে দ্বারভাঙ্গার জমিদার মহেশ ঠাকুর ও তার পুত্র গোপালদাস 'চৌধুরি' ও 'কানুনগো' অধিকার লাভ করে। ত্রিহুতে তাদের চৌধুরির 'রসম' ছিল বিঘা প্রতি এক টাকা ও কানুনগোর 'রসম' ছিল বিঘা প্রতি ১/৪ টাকা মাত্র। মোরাঙ্গের জমিদারদের ধ্বংস করতে তাদেরই উত্তরপুরুষ মহীনাথ ঠাকুর আওরঙ্গজেবকে সাহায্য করে। তার পরিবর্তে আওরঙ্গজেব এই হিন্দু ব্রাহ্মণ বংশকে প্রায় ১০০টি পরগনার ওপর সদর জমিদারি দেন এবং 'খিলাৎ' দিয়ে তাদের বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেন। এইভাবে তারা মাঝারি জমিদার থেকে প্রায় সামন্ত মহারাজাদের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল।[৩৭]

আবার, শাহজাহানের আমলে সৃষ্ট আসামের গোয়ালপাড়ার গৌরীপুর জমিদারির ইতিহাসও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নিজেদের লোকদের অপর জমিদারদের কাছারিতে বসিয়ে খাজনা বকেয়া করে দেবার চক্রান্ত করে এবং ঠিকমতো খাজনা না দেবার অজুহাতে সেই জমিদারিগুলো নিজেদের কবজায় আনতে এই পরিবার সিদ্ধহস্ত ছিল। ১৬৮৭ সনে গোকুলচন্দ্র ধর্মরাজকে, ১৭০১ সনে কুঞ্জমোহন দিলজিৎকে, ১৭২৪ সনে বালচন্দ্র পশুপতিকে, ১৭৩৮ সনে বুলচন্দ্র প্রীতমকে অপসারিত করে কয়েক পুরুষের মধ্যেই নিজেদের মূল জমিদারিকে প্রায় দেড়শো গুণ বাড়িয়ে নেয়।

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—নদীয়ার জমিদারদের সম্পর্কে। ভারতচন্দ্র খ্যাত ভবানন্দ কানুনগোর পরিবার নদীয়ার রাজবংশ। সেই বংশের অন্যতম রাজা রুদ্র ১৬৭০ সন নাগাদ মুলগড় পরগনা ও আঙ্গুরিয়া পরগনার বিষ্ণুদেব, রাঘবানন্দ, রামনাথ ও রামবিনোদ সময়মতো মালগুজারি দাখিল না করায়, ঐ দুই পরগনার চৌধুরিরা তালুকদারি ও জমিদারি-স্বত্ব আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে আদায় করেন। পরবর্তীকালে পাটুলির জমিদারদের হাত থেকে কৌশলে নদীয়ার রাজপরিবার অগ্রদ্বীপের স্বত্ব আদায় করে।

মেদিনীপুর রাজের ইতিহাসেও অনুরূপ ঘটনা দেখা যায়। যেমন, ১৭১১ সনে যশোবন্ত সিংহের সময় কমললোচন ভূঁইয়ার কাছ থেকে ঢেকিয়ারাজ্য ও আরেকজন জমিদারের কাছ থেকে টপ্পা বাহাদুরপুর আত্মসাৎ করে মেদিনীপুর রাজ পরিবর্ধিত হয়। অর্থাৎ প্রাথমিক জমিদারদের সঙ্গে মধ্যবর্তী জমিদারদের স্বত্ব নিয়ে বিরোধ মুঘলযুগে তীব্রই ছিল।[৩৮]

৪

নিষ্কর জমির ভোক্তা ও মহাজন

ক. মদৎ-ই-মায়েশ গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই শ্রেণীটির সংখ্যাগত গুরুত্ব কম হলেও গ্রামীণ অর্থনীতি ও গ্রামীণ জীবনের চিন্তাধারা নিরূপণে এদের গুরুত্ব কিছু কম ছিল না। এই শ্রেণীকে ফারসিতে বলা হয় 'মদৎ-ই-মায়েশ' বা নিষ্কর জমির উপভোগকারীর দল এবং এদের অবস্থিতি সরকারিভাবে স্বীকৃত ও সমর্থিত ছিল। এই জাতীয় নিষ্কর জমি দানের ও দেখাশোনার জন্যে একটি স্বতন্ত্র বিভাগই ছিল, তাকে বলা হতো 'সদর-উস্-সুদুর'। সুবা অনুযায়ী এর শাখা ছিল, এবং পরগনায় এর ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ছিল 'মুতাওয়াল্লিস'। অতএব মুঘল শাসন-ব্যবস্থায় নিষ্কর জমি প্রদান একটি স্বীকৃত প্রথা ছিল।[১]

'লস্কর-ই-দুয়া' বা 'প্রার্থনার সৈন্যবাহিনীর' কথা জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত আছে।[২] এই সৈন্যবাহিনীর বেতন ছিল 'মদৎ-ই-মায়েশ'। আবুল ফজল তাঁর গ্রন্থে সাধারণত কাদের এই ধরনের জমি দিতে হবে, তা স্পষ্ট উল্লেখ করে গেছেন: ক. যারা বিদ্যাচর্চা করে, খ. ধর্মীয় লোকেরা, গ. যাদের জীবিকার অন্য কোনো উপায় নেই, এবং ঘ. উচ্চবংশীয় অভিজাতরা, যারা অন্য কোনো উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করে না।[৩] সাধারণত প্রথম দুই শ্রেণীর লোকেরাই বেশির ভাগ 'মদৎ-ই-মায়েশ'-এর উপভোক্তা হতো। কারণ সে যুগে এরাই ছিল বুদ্ধিজীবী এবং গ্রামাঞ্চলে এরাই কৃষকদের কাছে রাজমহিমা কীর্তন

করত। 'মদৎ-ই-মায়েশ' দান করার একটি নির্দিষ্ট ধারাই ছিল এই যে—"তারা যেন বর্তমান বংশের স্থায়িত্বের জন্যে প্রার্থনা করে এবং জমি থেকে উৎপাদিত দ্রব্য দ্বারা নিজেদের রক্ষা করে।"[৪] অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে আজানের সময় সম্রাটের মহিমা কীর্তন গ্রামের কৃষকদের চিন্তাধারাকে নানা স্তরে প্রভাবান্বিত করত। এছাড়া গ্রামের বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহেও এই শ্রেণীকে কাজে লাগানো হতো। যেহেতু এরা রাষ্ট্রের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল, এদের স্বার্থ ও রাজবংশের স্থায়িত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল।[৫] মদৎ-ই-মায়েশ জমি দান করার সঙ্গে সঙ্গেও কৃষিকার্য বিস্তারে সাহায্য করার একটি উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের ছিল। দেখা যায় যে, মদৎ-ই-মায়েশ প্রদত্ত জমির একাংশ জমি পতিত কিন্তু কৃষিকাজের উপযুক্ত। (বনজর ওফতাদে লায়েকে জেরায়ৎ)। সেই জমিকে হাসিল করার দায়িত্ব মদৎ-ই-মায়েশ ভোক্তার ওপর বর্তায়।[৬] হিন্দু বা মুসলমান সমভাবেই এই জাতীয় জমি পেত। আওরঙ্গজেবও জাখবরের যোগীদের জমি দিয়ে এবং তাদের বিষয়ে আগ্রহ প্রদর্শনে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। বিহারে প্রাপ্ত প্রচুর সনদ থেকে জানা যায় যে, হিন্দু মন্দিরের জন্যে ক্ষেত্র বিশেষে আওরঙ্গজেব নিষ্কর জমি দান করেছেন। আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণ্যে মধ্যযুগের জৈন-সাহিত্যও প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিল।[৭]

সাধারণভাবে মদৎ-ই-মায়েশের চরিত্র সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে। প্রথমত—এই জমির উপভোগকারীরা সাধারণত কোনো রাজস্ব প্রদান করত না এবং জমি থেকে পাওয়া রাজস্ব ভোগ করত। কিন্তু তারা রাষ্ট্রের নির্ধারিত চাহিদার অতিরিক্ত কিছু চাইতে পারত না। কৃষক বা জমিদারের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার কোনো ক্ষমতা এদের ছিল না। দ্বিতীয়ত—আকবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত এই জাতীয় দানকে সাধারণত 'আরিয়াৎ' বা ধার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই জাতীয় দান দেবার বা বাতিল করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা সম্রাটের ছিল। আইনত এই দান বিক্রি করবার অধিকারও কারোর ছিল না। তবে আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগ থেকে এই জাতীয় দান বংশানুক্রমিক হয় এবং অষ্টাদশ শতকে এর ব্যাপক ক্রয়-বিক্রয় শুরু হয়। ১৭২৮ সনে দেখা যায়, খান্দেশে ২০ বিঘা 'আয়মা' জমি ২৫ তঙ্কায় হস্তান্তরিত হয়েছে।[৮] তৃতীয়ত—গোটা কৃষিযোগ্য ভূমির তুলনায় এর পরিমাণ খুবই সামান্য ছিল। বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এটা প্রমাণ করা যায়। আকবরের সময় থেকে মহম্মদ শাহের সময় পর্যন্ত (১৭৪০ খ্রী.) গুজরাটে সামগ্রিক রাজস্বের অনুপাতে মদৎ-ই-মায়েশের, জমির রাজস্বের অংশ ১'৮ পর্যন্ত বেড়ে ছিল। আলিবর্দির আমলে ইসলামাবাদে (বর্তমান চট্টগ্রাম) ৬২টি মৌজায় এই জাতীয় জমির পরিমাণ সমস্ত কর্ষণযোগ্য জমির শতকরা ৬ ভাগ মাত্র ছিল। সাধারণত, সমস্ত নিষ্কর জমি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকেই দান হিসেবে দেওয়া হতো। চতুর্থত—জমিদার ও জায়গিরদাররাও এই জাতীয় দান

করবার অধিকারী ছিলেন। জমিদার প্রায়শই নিজের 'নান্‌কর' জমি থেকেই এই জাতীয় দান করতেন। সময় সময় (যেমন, মীরজুমলার আমলে) এই জাতীয় দান অস্বীকৃত হলেও, জমিদারদের এই অধিকারকে রাষ্ট্র কার্যত স্বীকার করেছিল।

এই প্রসঙ্গে আরো দু-একটি কথা বলা যায়। প্রথমত—কয়েকটি ক্ষেত্রে মদৎ-ই-মায়েশের জমি 'মশরুথ' বা শর্তাধীন হতো। 'কাজী' বা পরগনার বিচারকের ক্ষেত্রে এই রীতির ব্যাপক প্রসার দেখা যায়। দ্বিতীয়ত—এই জাতীয় দান এবং জমিদার কর্তৃক প্রদত্ত সেবার জন্যে দানের মধ্যে পার্থক্য করা দরকার। দ্বিতীয় ধরনের দান (সাগিদ পেশ)-এর জন্যে সামান্য হলেও বার্ষিক খাজনা দিতে হতো। অবশ্য পরবর্তীকালে, একমাত্র ব্রহ্মোত্তর ছাড়া অন্য ধরনের নিষ্কর জমির ওপরেও (যেমন মহোত্তরাণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের লোককে প্রদত্ত জমি) সামান্য খাজনা ধার্য করা হতো। এটা উদ্বৃত্ত সম্পদের ওপর রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান চাপকেই সূচিত করে।[৯] অষ্টাদশ শতকের প্রথমে মদৎ-ই-মায়েশের ভোগদখলকারীরা ক্রমশ জমিদারির অধিকার আয়ত্ত করার জন্যে নিজেদের ক্ষমতাকে বাড়াতে থাকে। সম্রাটের কাছ থেকে পাওয়া মদৎ-ই-মায়েশের লোকদের সঙ্গে জমিদারদের সংঘর্ষ প্রায়ই লেগে থাকত। এছাড়া জমিদাররা নিজেদের লোকদের অনেক সময় ক্রমবর্ধমান হারে নিষ্কর জমি প্রদান করত এবং নান্‌করের পরিবর্তে তা মদৎ-ই-মায়েশের নির্দিষ্ট জমি থেকেই দেওয়া হতো। ফলে দুই শ্রেণীর মদৎ-ই-মায়েশের ভোগদখলকারীদের মধ্যে সংঘর্ষের বীজ থেকে গিয়েছিল।[১০]

খ. মহাজন॥ গ্রামীণ সমাজে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী হলো মহাজন। এদের অবস্থিতির গুরুত্ব বিদেশী পর্যটকদেরও দৃষ্টি এড়ায় নি। তাভারনিয়ের লিখেছেন—"সেই গ্রাম খুবই ছোট, সেখানে একজনও সরাফ নেই।" এখন এই 'সরাফ', মহাজন এবং নগদ মূলধন রক্ষা ও সঞ্চয়ে নিয়োজিত লোকদের গ্রামীণ অর্থনীতির চরিত্র রক্ষায় ও তার পরিবর্তন সাধনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।[১১]

প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে, মহাজনদের গুরুত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রের ভূমিকা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এটা এখন মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে, রাজস্ব আদায় টাকা ও দ্রব্য দুটোতেই করা হলেও মুঘল রাষ্ট্র বেশির ভাগ সময় অর্থেই রাজস্ব সংগ্রহ পছন্দ করত।[১২] জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষভাগে প্রায় ২৫০ লক্ষ টাকা গোটা অর্থনীতিতে চালু ছিল। জাহাঙ্গীর তাঁর রাজত্বের শেষভাগে বার্ষিক প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করতেন। শাহজাহানের সময় খালিসার ব্যয় হয় ২৮ লক্ষ টাকা এবং আওরঙ্গজেবের আমলে ৩৬ লক্ষ টাকা।[১৩] ফলে, গ্রামকে অনেক সময়ই টাকার বাজারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

এছাড়া আগেই বলা হয়েছে যে, বিরাট ধানচালের কারবার, বাণিজ্যিক

শস্যের উৎপাদন এবং দূর-দূরান্তের বাজারের জন্যে বস্ত্রশিল্পের বিরাট প্রসার সপ্তদশ শতকের গ্রামীণ অর্থনীতিতে মুদ্রার গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মহাজনদেরও প্রভাব ক্রমশ প্রসারলাভ করেছিল।[১৪] গ্রামাঞ্চলে মহাজনী সুদের ব্যাপকতা অষ্টাদশ শতকের শেষে মহারাষ্ট্রের লোনি গ্রামের উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। মোট ৮৪ জন চাষীর মধ্যে ৭৯ জনই দু'জন মাড়োয়ারি ও চারজন জৈন ব্যবসায়ীর কাছে ঋণী। লোনি কৃষকদের ধার ছিল ১৪,৫৩২ টাকা। অবশ্য সবাই সমানভাবে ঋণী ছিল না। খাতকের ঋণের পরিমাণ ছিল ৫০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত।[১৫]

বলে রাখা ভালো যে, কৃষক প্রধানত রাষ্ট্রের রাজস্বের দাবি মেটাবার জন্যেই মহাজনের দ্বারস্থ হতো। সাধারণভাবে কৃষকের ধার করার কতকগুলি কারণ নির্দেশিত হয়েছে। যেমন—ক. রাজস্বের দাবি বা অতিরিক্ত করের দাবি মেটাবার জন্যে, খ. তাদের গৃহপালিত পশু মারা গেলে পশু কেনার জন্যে, গ. নানারকম অনুষ্ঠান করার জন্যে, অথবা ঘ. নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ চালাবার জন্যে।[১৬]

মহাজনরা শুধুমাত্র তাদের ধার দেবার বন্দোবস্ত কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখত না, গ্রামীণ সমাজের অপেক্ষাকৃত সম্পদশালী শ্রেণীরাও তাদের কাছে ঋণে আবদ্ধ থাকত। নানাভাবে জমিদাররা মহাজনদের কাছে ঋণী থাকত। অনেক সময় জমিদাররা নিজেদের জমি আবাদ করার জন্যে মহাজনদের কাছ থেকে ধার নিত। এছাড়া রায়তকে কৃষিকর্মে ঋণ দেবার সময় প্রায়ই ধার পরিশোধের জন্যে জামিন থাকত জমিদাররা। কিন্তু মহাজনদের ভূমিকা অন্যদিক থেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যখনই জমিদাররা নিয়মিত রাজস্ব দিতে পারত না, তখনই তাদের মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হতো। জোহর দেখিয়েছেন যে, আফগান জামদাররা নিজেদের ভৃত্যদের স্ত্রী-পুত্র বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছে। এছাড়া অষ্টাদশ শতকের বাংলায়, রিসালা-ই-জিরায়ৎ অনুসারে মহাজনরাই জমিদারদের হয়ে রাজস্বের দাবি মেটাত এবং নানা হারে উৎপাদিত শস্য ও জমিদারদের রাহা থেকে একটি অংশ লাভ করত। ইজারাদারি বা তালুকদারি ব্যবস্থায় মহাজন ইজারাদার বা তালুকদারের পক্ষে সর্বদা 'মালজামিন' থাকত। সাধারণত, মহাজন জামিনদার থাকলেই একজনকে ইজারা দেওয়া হতো। তার পরিবর্তে মহাজন ইজারাদারের লাভের একাংশ পেত।[১৭]

বাংলায় যে কোনো তালুকের কেনাবেচার দলিল লক্ষ্য করলে অন্তত একজন মহাজনের নাম দেখা যাবেই। সাধারণত তালুক-বিক্রেতা সব সময় 'সিক্কা' টাকায় দাম বুঝে নিত এবং তার ফলে ক্রেতাকে মহাজনের দ্বারস্থ হতেই হতো।[১৮] অর্থাৎ মহাজনদের শক্তির মূল উৎস ছিল গ্রামাঞ্চলে মুদ্রার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ। তারাই সাধারণত কাঁচাটাকা নিয়ন্ত্রণ করত এবং যে কোনো

ধরনের হস্তান্তর বা কার্যকলাপ যা নগদ অর্থের মাধ্যমে হতো, তাতে তাদের ভূমিকা অপরিহার্য ছিল। যেহেতু মুঘল আমলে বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং বিভিন্ন ধরনের মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রিত করা সরাফ ও মহাজনদেরই কাজ ছিল, তাই গ্রামাঞ্চলের সকলেই বিনিময়ের জন্যে তাদের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল।

প্রধানত রাজস্ব সংগ্রহের জন্যেই কৃষককে মহাজনের কাছে হাত পাততে হতো। দেখা যায় যে, অজন্মার সময় কৃষক ধারের মাধ্যমেই রাজস্ব দিত। সপ্তদশ শতকের একটি গ্রন্থে দেখা যায়, গোটা গ্রামের কৃষকই মহাজনের কাছে ধার করেছে। প্রায় ৮০ টাকা অর্থাৎ সে বছরের নির্ধারিত রাজস্বের অর্ধেক, মহাজনের ধার শোধেই ব্যয়িত হয়েছে। এই ধার নিশ্চয় আগের কোনো বছরে রাজস্ব দেবার জন্যে নেওয়া হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের ফরমানে আছে যে, গরিব কৃষক বা 'রেজা' রাইয়তের 'জিজিয়া' দিতে হবে না। কারণ "বীজধান ও গোরুর জন্যে' তারা ঋণে সম্পূর্ণ আবদ্ধ।

আরেকটি কারণে কৃষকরা প্রায়শই মহাজনের আওতায় পড়ত। আবাদের জন্যে মূলধন সংগ্রহ মহাজনদের কাছ থেকেই করতে হতো। আবাদকল্পে মূলধনের জন্যে ধারের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কিন্তু রাষ্ট্র অনেক সময়েই নিজে জামিনদার হয়ে মহাজনের মাধ্যমেই টাকা দিত। নগদ টাকা দেওয়া ছাড়াও মহাজন গোরু, বীজধান ইত্যাদি ধার দিত, এবং নগদ টাকার সমান হারেই সুদ নিত। এই রকম বহু নিদর্শন রাজস্থানে ছড়িয়ে আছে।

এই মহাজনদের সুদের হার অত্যন্ত চড়া ছিল। রিসালা-ই-জিরায়তে এই প্রসঙ্গে নানারকম তথ্য পাওয়া যায়। সাধারণত মাসিক সুদের হার ছিল টাকায় দেড়-আনা। এর ওপর সেলামি ছিল এবং ধার শোধ দেবার সময় প্রতি টাকায় এক পাই করে অতিরিক্ত দিত। এর ফলে টাকায় দু-আনা বা তার চেয়ে বেশি সুদ দাঁড়াত, অর্থাৎ বার্ষিক হার ছিল শতকরা ১৫০ ভাগ। সাধারণত দুই বা তিন মাসের জন্যেই ঋণ দেওয়া হতো। সময়মতো দিতে না পারলে আসলের সঙ্গে সুদ যোগ করে সেই ভিত্তিতে কৃষকদের কাছ থেকে নতুন তমসুক নেওয়া হতো। "এইভাবে কেবল চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নিয়ে তারা কৃষকদের ধ্বংসকে ডেকে আনত।" বহু সময় কৃষকরা একবার ধার করেই মহাজনদের ফাঁদে পা দিত। কারণ, আবার নতুন ধার করে পুরনো সুদ মেটানো ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় থাকত না। এর নিদর্শনও পাওয়া যায়। শ্রীধর শর্মা ও কণিরাম শর্মা নামে বিষ্ণুপুরের এই দুই রায়ত আনন্দরাম রায়ের কাছে ১৪৭ টাকা ধার করে। এবং তারা প্রথম কিস্তি শোধ দেবার জন্যে রাধাকৃষ্ণ পোদ্দারের তহবিল থেকে ৭ সিক্কা টাকা ধার করে। এখানে প্রথমে একজনের কাছে ধার করে ধার শোধ দেবার জন্যে ক্রমশ রায়তকে দু'জন মহাজনের কবলে পড়তে হয়েছিল।[১৯] রাজস্থানের গ্রামাঞ্চলের ছবিও এরকম ছিল।

সেখানেও সুদের হার শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ ছিল। ছয় মাসের জন্যে ধার দেওয়া হতো এবং সময়মতো ধার শোধ না দিলে বাংলা দেশের মহাজনদের মতোই রাজস্থানের মহাজনরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নিত।[20] কৃষকদের ওপর অত্যধিক চাপের দুটি নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। যেমন ১৭৬২ সনে কসবা-চাৎসুর কৃষকরা কৃষিকাজ থেকে বিরত ছিল। কারণ দুর্ভিক্ষের সময় নেওয়া ঋণের দরুন মহাজন রায়তদের কাছে শস্যের অর্ধেক দাবি করেছিল। এরও ওপর ছিল রাষ্ট্রের দাবি। ফলে রায়তদের নিঃস্ব হয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো গতি ছিল না, এবং খালিপেটে তাদের পক্ষে চাষ করাও সম্ভব ছিল না। ১৭২৭ সনে পরগনা ফানীতে গ্রামীণ মহাজনকে গাড়িভর্তি ধান দিয়েও সন্তুষ্ট করতে না পেরে এক কৃষক আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করে। ব্রিটিশ আমলে সুদের ভারে অবনত কৃষকরা মুঘল আমলের রায়তদেরই উত্তরসূরী।

এখন এই মহাজনদের ধার দেওয়া বা শোধ নেবার পদ্ধতি সম্পর্কে দুয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথমত—সমষ্টিগত বা এককভাবে কৃষকরা ধার পেত। বহু জায়গায় গোটা গ্রামই ধার করত। যখন সামগ্রিক-ভাবে একটি গ্রাম ধার করত, তখন প্যাটেল বা জমিদার তার জামিনদার হতো। সেই ধার শোধ দেবার দায়িত্ব গ্রামের প্রতিটি বাসিন্দারই ছিল। এই ক্ষেত্রেও মহাজনরা যে তাদের সুদের চাপ কমাত—তার কোনো বিশেষ নজির পাওয়া যায় না। কারণ, ১৭৭৪ সনে রাজস্থানের একটি পরগনায় টাকা সময়মতো শোধ দিতে না পারায় গ্রামের প্রতিটি রায়তকে দিনে ৮ আনা করে 'তলব' দিতে হতো।[21] দ্বিতীয়ত—বহু জায়গায় মহাজনরা টাকার বদলে ধান দিয়েই ধার শোধ চাইত, কারণ অনেক 'বক্কাল' বা ধানের ব্যবসায়ী মহাজন ছিল। এবং এই ধার কৃষকরা যখন চাষে ব্যস্ত থাকত তখনি দেওয়া হতো, আর ধান কাটার সময় শোধ নেওয়া হতো। রিসালা-ই-জিরায়তে বলা হয়েছে যে, মহাজন নিজেই ধানের পরিমাণ ঠিক করত এবং প্রতি দুই মণে আধমণ ধান সেলামি হিসেবে নিত। খাজা ইয়াসিন এই ধরনের রীতির কথা উল্লেখ করেছেন—"শস্য এখনো ক্ষেতে ওঠেনি, কিন্তু একজন তা আগে থেকেই কিনে রেখেছে এবং শস্য উঠলেই তা দখল করবে।"[22] আনন্দিরাম রায়ের ছেলে দেবীপ্রসাদ রায় রায়তের জমি দখল নিতে অস্বীকার করে এবং তার পরিবর্তে উৎপন্ন শস্যের বিক্রয়মূল্যে কিস্তির শোধ নিতে স্বীকৃত হয়। "দেবীপ্রসাদ রায় স্থানে পূর্ব মোকামে ধান্য বিক্রী করিয়া সাতষট্টি টাকা লইয়াছে।"[23] সপ্তদশ শতকে সুরাট বা আগ্রায় এই জাতীয় দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সুরাটের দালালরা গ্রামবাসীদের ধান ধার দিয়ে সুতা নিয়ে নিত। আগ্রায় মহাজনরা আগেভাগে টাকা ধার দিত এবং নির্দিষ্ট হারে নীলে ধার শোধ নিত।[24] এর ফলে মহাজনদের নানারকমের সুবিধে হতো। মহাজনরা আগাম টাকার সঙ্গে শস্যের বা শস্যের সঙ্গে অন্য উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যমানের হার খুশিমতো ধার্য করত এবং ফেরত পাবার সময়

শস্যের ওজনেও কারচুপি করা হতো। মহাজনের নির্ধারিত মূল্যমান এবং বাজারে সেই দ্রব্যের মূল্যমানে অনেক তফাৎ থাকত। ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মণপ্রতি নীল ৩৫ থেকে ৩৬ টাকা দরে বিক্রি করলেও তাদের দালালরা 'দাদনের' সাহায্যে গ্রামে ২৪ টাকা হারে প্রতিমণ কিনত।[২৫] গোটা 'দাদন' ব্যবস্থায় অর্থাৎ রায়তদের আগে টাকা দিয়ে পরে তার বিরুদ্ধে শস্য সংগ্রহ করার মধ্যেই মহাজনদের কর্জ দেবার রীতি লুকিয়ে আছে। তৃতীয়ত—মহাজনদের নিজেদের মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়া ছিল। সাধারণত প্রত্যেকের হুণ্ডি বা বিল প্রত্যেকে মানতো এবং পারস্পরিকভাবে কেউ কাউকে রীতিভঙ্গ করে ঠকাতে চাইত না। একজনের খাতককে হস্তান্তর করার নিয়মও প্রচলিত ছিল। যেমন "সনাতন গন্ধবণিকের স্থানে রায় মহাশয়ের ৫০ টাকা কর্জ ছিল। রায়জির বণিকের এক টিপ ঐ টাকার ছিল। সেই টিপ শর্মাদিগের (শ্রীধর শর্মা ও ফণিরাম শর্মা) স্থানে দিয়া বণিককে টাকা দিতে থাকিবে না করিয়া দিলেন।"[২৬] এই খাতক-হস্তান্তর রীতি কয়েকটি দিককে স্পষ্ট করে তোলে। প্রথমত—যদি কোনো মহাজনের কাছে সাময়িকভাবে নগদ অর্থ না থাকে তাহলে সে তার খাতকদের খতের বিরুদ্ধে অন্য মহাজনের কাছে টাকা ধার করতে পারে। দ্বিতীয়ত—এই খাতক-হস্তান্তর রীতি মহাজনদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার কথা এবং খাতকদের ওপর তাদের ব্যাপক ক্ষমতাকেই প্রমাণ করে।

এখন এই গ্রামীণ মহাজন কারা ছিল? ইরফান হাবিবের মতে, মহাজনী নিছক বৃত্তি হিসেবে একটা বর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেই বর্ণ হলো বানিয়া।[২৭] এই মতামত আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। মহাজনী ব্যবস্থায় যে গ্রামাঞ্চলে সকল বর্ণের লোকেরা অংশগ্রহণ করত, সে বিষয়ে প্রচুর তথ্য আছে। রাজস্থানের বহু জায়গায় ব্রাহ্মণরা মহাজনী করেই দিন গুজরান করত এবং বহু ইজারাদারের 'মালজামিন' হতো।[২৮] অষ্টাদশ শতকে বাংলা দেশেও আমরা যেসব মহাজনের নাম পাই, তাতে সোনার বেনে থেকে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত প্রায় সকল বর্ণের ও সম্প্রদায়ের লোকেরাই আছে। যেমন—দুলাল নন্দী, বাঞ্ছারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাচরণ মিত্র, শক্তিরাম বিশ্বাস, মথুর পোদ্দার প্রভৃতি।[২৯] গ্রামীণ সমাজে কিছুটা সম্পন্ন লোকই মহাজনী ব্যবসায়ে হাত দিত —এটা মনে করা খুব অযৌক্তিক হবে না। তবে এটা ধারণা করা যেতে পারে যে, ব্যবসায়ীরা বিশেষত যারা গ্রাম ও শহরের সঙ্গে ব্যবসা উপলক্ষে জড়িত—তারাই ব্যাপকভাবে মহাজনী কারবার করত। বক্কালদের সঙ্গে মহাজনদের যোগাযোগ এবং সময় সময় মহাজনদের প্রতি 'বক্কাল' শব্দের প্রয়োগ ধানের ব্যবসায়ের সঙ্গে মহাজনী ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ যোগকেই প্রমাণিত করে। জোহরের মতানুযায়ী ষোড়শ শতকে পাঞ্জাবের আফগান জমিদাররা ধানের ব্যবসায়ীদের খাতক ছিল। রিসালা-ই-জিরায়তে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সন্ন্যাসীরা টাকা ধার দিত। মোহান্ত ও গোঁসাইদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের

বহু নিদর্শন পাওয়া যায় এবং তারা মূলত ব্যবসায়ী। দ্বিতীয়ত—জমিদারের কর্মচারিরাও টাকা ধার দিত। তৃতীয়ত—বহু সম্পন্ন কৃষকও মহাজন ছিল। রাজস্থানে সেই মহাজনরাই ইজারা নিত, যারা নিজেরা সম্পন্ন কৃষক ছিল। চতুর্থত—সরাফরা মহাজনী ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকত। এখানে অবশ্য নিছক মহাজন ও সরাফদের (যারা নানা ধরনের মুদ্রার হার ঠিক করত) মধ্যে পার্থক্য মনে রাখা দরকার। এছাড়া, 'মহাজন' ও 'সাহুকার' নামেও পেশাগত মহাজন ছিল। তারাও শস্যে ধার শোধ নিত এবং তাদের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্পর্কই অনেক বেশি ছিল।[৩০]

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মহাজনী মূলধন কোথা থেকে আসত? ধানের ব্যবসায়ী, সন্ন্যাসীরা সহজেই বাণিজ্যে তাদের লাভকে সুদে খাটাতে পারত। সম্পন্ন কৃষক বা জমিদারদের লোকেরা কৃষি থেকে গৃহীত উদ্বৃত্ত সম্পদের একাংশ মূলধন হিসেবে খাটাত। এছাড়া অনেক সময় মহাজনী ব্যবস্থায় মূলধন নিজে থেকেই বর্ধিত হতো। কিন্তু সুজন রায় তাঁর 'খুলাসাৎ-উৎ-তওয়ারিখ'-এ আমানতের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের লোক মহাজনদের কাছে টাকা রেখে নির্দিষ্ট হারে সুদ পেত এবং সেই টাকাই মহাজনরা খাটাত। আজমিরে আওরঙ্গজেবের আমীন ও ক্রোরী রাজস্বের জন্যে সমস্ত আদায়ীকৃত টাকা এইভাবেই মহাজনদের কাছে জমা রেখেছিল। মহাজনদের কাছে যে কাঁচা টাকা প্রচুর থাকত তারও প্রমাণ পাওয়া যায় আওরঙ্গজেব তাঁর সাহুকারদের কাছ থেকে একবার ৫ লাখ টাকা পান। আর একবার পাঞ্জাবের একটি গ্রামের মহাজনদের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা নেওয়া হয়।[৩১]

এখন দেখা যাক, রাষ্ট্র ও অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে মহাজনদের কী সম্পর্ক ছিল। প্রথমত—কোরানে সুদ নেওয়াকে মহাপাপ বলে উল্লেখ করলেও রাষ্ট্র মহাজনদের সর্বতোভাবে রক্ষা করত। আওরঙ্গজেবের মতো ধর্মভীরু লোকও সিংহাসনে আরোহণের সময় মহাজনদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন।[৩২] শাহজাহানের ১৬৫৩ সনের ফরমানে দেখা যায়, শরাফুদ্দিনপুর গ্রামে জমিদারদের অত্যাচার থেকে শর্বন প্রমুখ হিন্দু মহাজনদের রক্ষার জন্যে সম্রাট ফৌজদারকে কঠোর আদেশ দিচ্ছেন।[৩৩] এর কারণ প্রধানত দুটো। রাষ্ট্র কৃষকদের কৃষিঋণ দেবার জন্যে ও যুদ্ধ চালাবার জন্যে অনেক সময় মহাজনদের দ্বারস্থ হতো। হুমায়ুন কিভাবে ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বা সুবিধা বুঝে কিভাবে তার থেকে উদ্ধার পেতেন, এর নানা নিদর্শন জৌহর দিয়েছেন।[৩৪] আবার, রাষ্ট্র নিজেই তার কর্মচারিদের ধার দিত। দ্বিতীয়ত—জমিদারদের সঙ্গে মহাজনদের সম্পর্ক ছিল দ্বন্দ্ব-মধুর। জমিদাররা অর্থনৈতিক কারণে মহাজনদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। সেইজন্যে তারা বলত "ওই জায়গার মহাজনরা ধর্মে ও বিশ্বাসে আলাদা হলেও, আমাদের সঙ্গে এক এবং আমাদের ভাই ও বন্ধুর মতো।"[৩৫] আবার, জমিদাররা মহাজনদের আক্রমণ করছে, এমন

নিদর্শনও আছে। আক্রমণটা অবশ্য প্রতিবেশী গ্রামের মহাজনদের ওপরই হতো এবং সেটার উদ্দেশ্য ছিল লুঠ করে অর্থ সংগ্রহ করা। কিন্তু আবার যখন মহাজনরা টাকা ধার দিয়ে জমিদারকে বেঁধে ফেলত এবং রাজস্ব আদায়ে খবরদারি করত, তখন নিশ্চয়ই উভয়ের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা ছিল।[৩৬] তৃতীয়ত—রায়তদের সঙ্গে মহাজনদের সম্পর্ক মধ্যযুগে উত্তর-ভারতের ভক্তিবাদী আন্দোলনের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কবীর, নানক বা সৎনামী সম্প্রদায়ের লোকেরা কখনো মহাজনদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেন নি, যদিও সরকারি রাজস্ব কর্মচারি, জায়গিরদার প্রভৃতির বিরুদ্ধে উত্তর-ভারতীয় ভক্তিবাদী সাহিত্যে প্রচুর বিষোদ্‌গার করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের মতো এসব ধর্মে সুদ নেওয়া নিষিদ্ধ নয়। ভক্ত ও ঈশ্বরের সম্পর্ককে প্রায়ই মহাজন ও খাতকের সম্পর্কের অনুরূপ বলে মনে করা হয়েছে। যেহেতু এই ভক্তিবাদী আন্দোলনের অনেক নেতাই সমাজের নিচুতলার লোক এবং গ্রামের কৃষকদের ও শহরের শিল্পীদের মধ্যেই এর প্রসার হয়েছিল, সেহেতু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এদের সাহিত্যে কৃষকদের বাস্তব মনোভাব যথার্থরূপে চিত্রিত হয়েছিল।[৩৭] সাহিত্যে রূপায়িত এই মনোভাব অন্যান্য তথ্য দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে। ১৭৫৯ সনে রাজস্থানে চাৎসু পরগনায় একটি গ্রামের মহাজন প্যাটেলের ভাইয়ের হাতে মারা যাবার দরুন রাষ্ট্রের অনুরোধ ও অর্থের প্রলোভনেও গ্রামবাসীরা প্যাটেলকে গ্রামে আর বসবাস করতে দেয়নি।[৩৮] রিসালা-ই-জিরায়তেও মহাজনদের প্রতি রায়তের সহনশীল মনোভাবের কথা বলা হয়েছে।[৩৯]

এইসব উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, কৃষকদের জীবনধারণের সঙ্গে মহাজনের ঋণ ওতঃপ্রোত ও ব্যাপকভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে, কৃষকদের কাছে মহাজনী ব্যবস্থা উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবেই প্রতীয়মান হয়েছিল। বোধহয় ব্রিটিশ আমলের আগে মহাজনরা ব্যাপক হারে কৃষককে জমি থেকে উৎখাত করত না, বরং কৃষিঋণ দিয়ে কৃষককে তার নিজের জমিতেই চাষ করাত। শুধুমাত্র উৎপন্ন ফসলের একাংশ নিজের হস্তগত করত। জমির সঙ্গে কৃষকের সংযোগ তখনো ছিন্ন হয়নি। ফলে কৃষকের বিচ্ছিন্নতাবোধ' জনিত রাগ মহাজনদের বিরুদ্ধে সেযুগে দানা বাধেনি। এছাড়া কৃষিকাজে মূলধন জোগাবার প্রায় একচ্ছত্র অধিকারী ছিল মহাজন। ব্রিটিশ শাসনের মাঝামাঝি সময়ে মহাজনদের প্রতি কৃষকের মনোভাবের পরিবর্তন গ্রামীণ অর্থনীতিতে মহাজনদের সামাজিক ভূমিকার রদবদলের বোধহয় প্রতিফলন মাত্র। কিন্তু তা স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি ভাঙাগড়ার দিনগুলিতে গ্রামীণ মহাজনদের ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। অবশ্যই এইসময় তাদের বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে এবং কেবল তারপরেই তাদের সম্পর্কে দুয়েকটি স্থির সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। এইসময় যুদ্ধবিগ্রহের জন্যে রাষ্ট্রের

খরচা বেশি হবার দরুন রাজস্বের দাবি বেড়ে যাওয়ায় ও ব্যাপক হারে ইজারা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে ও জমিদারি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মহাজনদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। রাজস্থানে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মহাজনরা ব্যাপকভাবে ও বর্ধিত হারে ইজারা নিতে থাকে।[৪০] বাংলা দেশেও মহাজনরা এইসময় জমিদারি অধিকার কেনার জন্যে উদ্গ্রীব ছিল।[৪১] কিন্তু তারা কখনোই এগুলো বেশিদিন হাতে রাখত না, বরং কমদামে দেউলিয়া জমিদারের কাছ থেকে এই অধিকার কিনে অন্যদের বেশিদামে বিক্রি করত। কারণ জমিদারি রাখলে রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব বহন করা এবং রাজস্বের ক্রমবর্ধমান দাবি মেটানো শক্ত ছিল। তবে মহাজনদের এই পরিবর্তিত ভূমিকা সম্পর্কে আরো অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

আপাতত গ্রামীণ অর্থনীতিতে মহাজনদের ভূমিকা কতকগুলো দিককে পরিষ্কার করে। প্রথমত—আবাদযোগ্য জমি ও কৃষকের আনুপাতিক হার মধ্যযুগে কৃষকের সপক্ষে হলেও কৃষির আওতায় আরো বেশি জমি আনতে গেলে মূলধনের সমস্যা ছিল এবং সেখানে মহাজনের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয়ত—মহাজনদের এই জাতীয় ভূমিকা গ্রামীণ সমাজের বিচ্ছিন্নতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারণার বিরুদ্ধে একটি স্পষ্ট প্রমাণ এবং মধ্যযুগের অর্থনীতিতে মুদ্রার গুরুত্বকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তৃতীয়ত—এটা মনে রাখতেই হবে যে, মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ও মহাজনী মূলধন বৃদ্ধির অর্থই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার জন্ম নয়, কারণ এই মহাজনী মূলধন, পুরনো উৎপাদন ব্যবস্থার পদ্ধতিকে জীইয়ে রেখেছিল, সেই কাজেই নিয়োজিত হতো।[৪২]

৫

কৃষক : স্তরভেদ

ক. কৃষক ॥ মুঘল সাম্রাজ্যের একটা বিশেষ চরিত্র ছিল এবং সেই চরিত্রই ছিল তার স্থায়িত্বের অন্যতম কারণ। এই সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক বিস্তৃতি ও সময়সীমার মধ্যে একটি সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল—যা সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতেও সমভাবেই কার্যকর ছিল।[১] অর্থাৎ সাম্রাজ্যের প্রতিটি অংশ থেকে উদ্বৃত্ত সম্পদ আহরণের বন্দোবস্ত মুঘল শাসক-শ্রেণী করতে পেরেছিল। ফলে তাদের আওতায় পড়েছিল হাজার হাজার মানুষ—যারা কৃষিকর্ম থেকে নিজেদের দৈনন্দিন আহার সংগ্রহ করত। মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি ছিল কৃষক এবং তাদের অধিকার আর কর্তব্যের সীমা নির্ধারণ করা নিয়ে মুঘল শাসকশ্রেণীর চিন্তার অন্ত ছিল না।

মুঘল আমলে কৃষকের অধিকার নিয়ে কিছু কথা আগেই ভিন্ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। একথা সবসময় মনে রাখা দরকার যে, কৃষকের শ্রম জমি থেকে সম্পদ আহরণের জন্যে অপরিহার্য। ফলে, মুঘল রাষ্ট্র সবসময় জমি চাষের জন্যে কৃষকের অধিকারকে স্বীকার করত। 'আইন'-এ সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, 'রাইয়তি কশথ' জমিকে মদৎ-ই-মায়েশরা কখনোই নিজেদের 'খুদ কশথ' জমিতে রূপান্তরিত করতে পারবে না। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরে 'জমিন-ই-রেইয়া'-এর প্রতি অনুরূপ আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।[২] আর, মুহম্মদ হাসমের

প্রতি আওরঙ্গজেবের ফরমানে বলা হয়েছে -"যদি কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতি কিনতে কৃষক অক্ষম হয়, অথবা জমি ছেড়ে পালিয়ে যায়, তবে আরেকজনকে জমিটা দাও।...এবং যখনই ভূতপূর্ব মালিকরা জমি চাষ করতে সমর্থ হবে, তখনই তাদের জমি ফিরিয়ে দাও।"[৩] (ওয়া হরগাহে আরবাবে জমিন কুদরথে জিরায়ৎ বে হম রসানন্দ জমিনে আনহ ওয়াপস বেদেহান্দ।) 'নিগর নামা-ই-মুনশী'তেও এই নীতির সমর্থন পাওয়া যায়। একটি পরিত্যক্ত গ্রামে একজনকে চাষের ও পুনর্বাসনের অধিকার দেওয়া হতো তখনই—যখন ভূতপূর্ব মালিক সেখানে নিঃশর্ত সম্মতি প্রদান করত।[৪] অর্থাৎ জমির উপর কৃষকের ভোগ দখল ও অধিকার-স্বত্বকে মুঘলরা মেনে নিয়েছিল। এই স্বত্বে হস্তক্ষেপ করার অধিকার জমিদার বা মদৎ-ই-মায়েশদের ছিল না। অপরপক্ষে, জমি ছেড়ে চলে যাবার অধিকার বা জমি হাতবদল করার অধিকার কৃষকদের বিশেষ ছিল না।

এছাড়া, কৃষিকর্ম বিস্তারের জন্যে যা যা দরকার—তার সমস্তই কৃষকরা পেত। রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যে মুঘলদের দুটি পথ ছিল; সমস্ত কর্ষণযোগ্য ভূমিতে ব্যাপকভাবে আবাদ করা এবং বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদন করা।[৫] এই কাজে কৃষককে সহায়তা করার জন্যে রাষ্ট্রযন্ত্র নানারকমের সুবিধা দিত। নতুন অনাবাদী জমিকে কৃষির আওতায় আনলে বা জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করলে ধার্য রাজস্বের হার কমানো হতো। আবার, বীজধান বা গোরু কেনার জন্যে রাষ্ট্রীয় কর্মচারিদের কাছ থেকে ধার পাওয়া কৃষকদের অন্যতম অধিকার ছিল। এছাড়া দুর্ভিক্ষের সময়ও কৃষকদের দেয় রাজস্ব থেকে ছাড় দেওয়া হতো।[৬]

কৃষকদের প্রধান কর্তব্য ছিল আপন আপন জমি চাষ করা।[৭] "কৃষকের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে চাষ করা।" দ্বিতীয়ত—সময়মতো ধার্য রাজস্ব দেওয়া তার অন্যতম কর্তব্য ছিল। "যখনই অপরিবর্তিত হারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির জন্যে রাজস্ব (খেরাজে মুয়াজ্জফ) নির্ধারিত হবে, কৃষককে জানিয়ে দাও যে, তাদের কাছ থেকে সেটা আদায় করতেই হবে। তারা জমি চাষ করুক বা না করুক, কিছু যায় আসে না।"[৮] (খেরাজে অনহ গেরেফথে খওয়াহদ শোদ জিরায়ৎ মিকুনান্দ ইয়ানে)।

আবার, কোনো অঞ্চলে চুরি ইত্যাদি ঘটলে এবং যথাসময়ে অপরাধী ধরা না পড়লে স্থানীয় কৃষকদের ওপর প্রায় ক্ষতিপূরণের দায় বর্তাত। কৃষকদের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই বলা দরকার যে, মুঘল আমলে জমির ওপর বিভিন্ন ধরনের অধিকার ছিল এবং কৃষকদেরও সেইদিক থেকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। মুঘল আমলের দলিলে আমরা রেইয়া, রাইয়ৎ ও মুজারিয়া ইত্যাদি নানা শব্দের উল্লেখ একই সঙ্গে দেখতে পাই।[৯] সাধারণত, রেইয়া শব্দটি সর্বশ্রেণীর কৃষকদের বোঝালেও প্রত্যেকটি শব্দই কতকগুলি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হতো। আগেই আইন-ই-আকবরীর কথা

উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমস্ত কর্ষিত জায়গায় সম্পত্তির মালিক অগণ্য। আইনের ধারণাটি মেইহা লিখিত পোর্তুগিজ দলিল বিশ্লেষণ করলে আরো স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। এক ধরনের জমিকে বংশানুক্রমিক ভাবে 'বতন' বলা যায়। এই জমির ভোক্তারা নির্দিষ্ট হারে খাজনা দেয় এবং যদি মোট রাজস্ব আদায়ে কিছু ঘাটতি দেখা দেয়, তাহলেও এরা আর কিছুর দায়িত্ব ভোগ করে না। আরেক ধরনের জমির উপভোক্তাদের 'কুলাচারিন' বলা হয়। এরা নির্দিষ্ট হারে গানকারদের খাজনা দেয়। কিন্তু যদি গ্রামের দেয় রাজস্বের পরিমাণে টান পড়ে, তবে এরাই রাজস্বের বাকি অংশ পূরণ করে দিতে বাধ্য থাকত। এছাড়া খাজনামুক্ত জমি ও নিলামদারদের মধ্যে বিলি করা জমির কথাও আছে। তাদের বিধি আবার স্বতন্ত্র।[১০]

তাই কৃষকদের স্তর-বিন্যাসের কথা ব্যাখ্যা করা একান্ত প্রয়োজন।[১১] কৃষকদের মধ্যে প্রথমে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'খুদ-কশথ' রাইয়ৎ। এদের বৈশিষ্ট্য প্রধানত তিনটি। এই নামটিই বলে দেয়, যে নিজে নিজের জমি চাষ করে তারই নাম 'খুদ-কশথ' কৃষক। খাজা ইয়াসিন লিখেছেন—"যদি মালিক-ই-জমিন নিজের জমি চাষ করে, তাহলেই তাকে 'খুদ-কশথ' বলা হয়।"[১২] এছাড়া গোরু, হাল ইত্যাদি উপকরণের মালিক হিসেবেও তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং নিজেদের গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করা 'খুদ-কশথ' রায়তদের অন্যতম বৈশিষ্ট লক্ষণ। দাক্ষিণাত্যে এদেরই মিরাসিদার বলা হতো। নিজের জমি বিক্রি ও হস্তান্তর করার অধিকার এদের ছিল, যদিও সে অধিকার প্রয়োগের নিদর্শন অপেক্ষাকৃত বিরল।

১৭৭২ সনে মহারাষ্ট্রে একজন খুদ-কশথ রায়তের এরকম জমি বিক্রির দলিল পাওয়া গেছে। মালাজি বলে এক খুদ-কশথ কৃষক (কুনবি মালাকার মিরাসদার) ঋণগ্রস্ত হয়ে ২৫০ টাকার বিনিময়ে নিজের ইচ্ছায় (আত্মসন্তোষে) ৭ বিঘা জমি দার্তে বলে অন্য এক গ্রামের বাসিন্দাকে বংশানুক্রমিক স্বত্বে বিক্রয় করে দেয়। ঐ বিক্রয় কবালার ভিত্তিতে নতুন ক্রেতা একই হারে রাষ্ট্রকে রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয়। এটা লক্ষ্যণীয় যে, কেনাবেচার আগে রাষ্ট্রের কোনো প্রাক্-সম্মতির প্রয়োজন ছিল না এবং গ্রামের প্যাটেল ও কুলকার্নী এই কেনা-বেচার সাক্ষী ছিল মাত্র। রাষ্ট্র নতুন ক্রেতার কাছ থেকে রাজস্ব পেয়েই সন্তুষ্ট থাকত, 'মিরাস' জমিতে তার কোনো স্বত্ব ছিল না।[১৩] ঠিকমতো রাজস্ব দিলে এদের অধিকারে কখনোই হস্তক্ষেপ করা হতো না। সাধারণত, এদেরকেই রাষ্ট্র নানা সুযোগ-সুবিধা দিত। এই সুযোগ-সুবিধার নিদর্শন মেইহা লিখিত প্রতিবেদনে পাওয়া যায়।

"প্রথানুযায়ী প্রত্যেক গ্রামের ধানি জমি নিলাম ডাকা হবে এবং যে সবচেয়ে চড়া হার দেবে তাকে দেওয়া হবে। যেসব জমিতে বংশানুক্রমিক স্বত্ব আছে, সেইসব জমির ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের

মধ্যেই নিলাম ডাকা হবে, যদি না বিশেষ রীতি থাকে এই মর্মে যে গ্রামের বাইরের বসবাসকারী লোকেরাও নিলামে অংশ নিতে পারে।"[১৪]

এই ক্ষেত্রে খুদ-কশথ রায়তদের নিজস্ব জমি নিলামে চড়ানো হবে না এবং তারাই শুধু নিলামের সুযোগ নিতে পারে। এরা নিজেদের জমিতে অন্য কৃষককে নিয়োগ করতে পারত কিনা, তা নিয়ে নানা বিরোধী প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজস্থানে খুদ-কশ্‌থ রায়তরা সম্ভবত এই অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

কিন্তু বাংলা দেশে দেখা যায় যে, খুদ-কশ্‌থ উৎপন্ন শস্যের সাত ভাগের ১ ভাগের পরিবর্তে অন্য লোক দিয়ে নিজের জমি চাষ করাত। ইংরেজ আমলারাও এই রীতির উল্লেখ করেছেন।[১৫] তবে, জমি ও কৃষকের আনুপাতিক হার ও অনাবাদী জমিকে ক্রমশ চাষের আওতায় আনার পরিপ্রেক্ষিতে খুদ-কশথের পক্ষে ভাগচাষী জোগাড় করা নিশ্চয়ই সহজ ছিল না। একথা খুব সহজেই অনুমেয় যে, খুদ-কশ্‌থ রায়তদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অন্যান্য শ্রেণীর কৃষকদের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। ব্রিটিশ আমলাদের ভাষায় "খুদ-কশ্‌থার অধিকার কেবল অর্থনৈতিক সুবিধা সূচিত করে না। এটা সামাজিক মর্যাদাও প্রদান করে।"[১৬] খুদ-কশ্‌থদের প্রধান দায়িত্ব ছিল দুটি। অন্যান্য কৃষকদের মতো খুদ-কশ্‌থদেরও যতদূর সম্ভব বেশি জমি চাষ করতে হতো। দ্বিতীয়ত—খুদ-কশ্‌থরা অনেক সময় সমষ্টিগতভাবে রাজস্ব পরিশোধের জন্যে দায়ী থাকত। একজনের রাজস্ব বাকি থাকলে অন্যেরা তা মিটিয়ে দিত।

এইসব খুদ-কশ্‌থদের সঙ্গে সমাজের উচ্চবর্ণের একটা সম্পর্ক থাকত। রাজস্থানে উচ্চবর্ণ জাত খুদ-কশ্‌থদের বলা হতো 'রিয়ায়তি'। এদের স্বত্বের নাম হলো—'গারুহালা'। এই স্বত্বের অধিকারীরা নিজস্ব লাঙ্গলের অধিকারী ছিল এবং পারিবারিক শ্রমের দ্বারা চাষ করত। এদের 'দস্তুর' বা রাজস্বের হারও অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় প্রায় শতকরা ১০ থেকে ১৭ ভাগ কম ছিল, এবং বহু সময় রাষ্ট্রীয় কর্মচারিকে অতিরিক্ত ধার্য দেবার থেকেও এরা রেহাই পেত। এরা নিজেদের জমি অন্য কৃষককে চাষ করবার জন্যে ভাড়া দিত। কিন্তু যে জমি পারিবারিক শ্রম দ্বারা কর্ষিত না হতো, সেটা কিন্তু 'গারুহালা' জোতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হতো না। ফলে, সেই জমির রাজস্বে কোনোরকম ছাড় ছিল না। সুতরাং পারিবারিক শ্রমের ওপর নির্ভরতা 'গারুহালা' জোতের প্রধান লক্ষণ। মজুর দিয়ে চাষ করালেই রাষ্ট্র সেইসব অংশে সাধারণ হারেই রাজস্ব নিত। গারুহালারা সব রায়তি জমি যাতে নিজেদের আওতায় আনতে না পারে, তার জন্যেও আইন ছিল।[১৭]

কৃষকদের মধ্যে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য স্তর হলো—'পাহি-কশ্‌থ'। এদের সঙ্গে খুদ-কশ্‌থ কৃষকদের প্রধান পার্থক্য হলো এই যে, এরা নিজেদের গ্রাম ছাড়াও অন্য জমিদারের আওতায় অন্য গ্রামে কৃষিকর্মের জন্যে নিয়োজিত হতো। খাজা

ইয়াসিনের ভাষায়—'পাহি' হচ্ছে একজন জমিদারের অধীনে একটি মৌজার রায়ৎ, কিন্তু সে অন্য জমিদারিতে চাষ করে।[১৮] অর্থাৎ যদি কেউ একই জমিদারের আওতায় একটি গ্রামে বাস করে ও অন্য গ্রামে চাষ করে, তাহলে তাকে সচরাচর 'পাহি' বলা হবে না। এই 'পাহি-কশ্ত'দের মধ্যে আবার দুটো ভাগ ছিল—একদলের উৎপাদনের কোনো উপকরণ ছিল না। খুদ-কশ্তরা তাদের উপকরণগুলো ধার দিত। এদের ওপর রাজস্ব ধার্য করা হতো 'বাটাই' হিসাবে, অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যের একাংশ নিয়ে নেওয়া হতো। অন্য 'পাহি-কশ্ত'রা উৎপাদনের উপকরণের অধিকারী ছিল। রাজস্থানের পরগনা মলারানায় ১৭২৩ সনে প্রাপ্ত ইয়াদ্ দাস্তি থেকে জানা যায় যে, ১৬৩ জন 'পাহি'র ১৮৫ খানা লাঙল ছিল। এইসব দলিল থেকে অনুমিত হয় যে, গ্রামে কৃষিকর্ম বিস্তারের জন্য পাটিল, মহাজন, জমিদার প্রভৃতিরা বিভিন্ন ধরনের সুবিধাজনক শর্তে পাট্টা প্রদান করে এদের নিজেদের গ্রামে বসতি স্থাপন করতে উৎসাহ দিত। দ্বিতীয়ত—খোজা ওয়াহারজির ক্ষেত্রে অন্তত জানা যায় যে, বহু 'পাহি' কৃষক ভূমিয়াদের অত্যাচারে অন্য পরগনা থেকে এসে আরেক পরগনায় চাষ করছে। অর্থাৎ 'পাহি'দের একটা মস্ত বড় অধিকার ছিল। সীমিতভাবে হলেও তারা এক গ্রাম থেকে অন্য জমিদারদের এলাকায় যেতে পারত এবং কৃষিকর্মে নিয়োজিত হতে পারত। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের শ্রমের জন্যে সুবিধাজনক শর্তে জমির ওপর একজাতীয় অধিকার পেত। যেমন অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রের উদ্যোগে কৃষিক্ষেত্র সম্প্রসারণের একটা চেষ্টা করা হয় এবং তখন 'উপরি'রা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা অনুসারে নতুন জমি চাষ করার সুযোগ পায়। এই কৃষকরা সম্পূর্ণভাবে জমির সঙ্গে বাঁধা ছিল না।

কিন্তু এদের এই অধিকার দুটি অর্থে সীমিত ছিল। প্রথমত—কৃষি থেকে বাণিজ্যে বা অন্যান্য বৃত্তিতে যাবার কোনো উদাহরণ আমরা পাই না। দ্বিতীয়ত—বিশেষভাবে নতুন নতুন জমিকে (অনাবাদী জমিকে) কৃষির আওতায় আনার জন্যেই 'পাহি'দের সাহায্য নেওয়া হতো এবং সেদিক দিয়ে মুঘল-নীতির সঙ্গে এই রীতির কোনো স্ববিরোধিতা ছিল না। 'আইনে' স্পষ্টই উল্লিখিত আছে—"যদি কোনো পতিত জমি না থাকে এবং যদি কোনো কৃষক অতিরিক্ত চাষ করতে সমর্থ হয়, তবে তাকে অন্য এলাকায় জমি দেওয়া উচিত।" অর্থাৎ এই বিশেষ ক্ষেত্রে একজন কৃষক একাধারে 'খুদ-কশ্ত' ও 'পাহি' দুটোই হতে পারত। পাহি-কশ্তদেরও পুরোপুরি দখলি-স্বত্ব স্বীকৃত হতো।

জাপানি পণ্ডিত ফুকোজাওয়ার গবেষণা প্রমাণ করে যে, মহারাষ্ট্রে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে 'উপরিরা' মিরাস জমিতে ভাগচাষী হিসেবে বাস করত এবং ভাগ-শস্যের অর্ধেক থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত জমির মালিক পেত ও বাকিটা

যে চাষ করছে সে পেত। কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ ও 'খুদ-কশ্‌থ' রায়তদের ক্ষমতার ওপর 'পাহি'দের অধিকার নির্ভরশীল ছিল এবং অঞ্চল অনুযায়ী এই অধিকারের রকমফেরও নিশ্চয় ছিল। প্রচুর জমি থাকলে পাহি-কশ্‌থ সহজেই নিজেদের 'খুদ-কশ্‌থ'-এ রূপান্তরিত করতে পারত। অন্যদিকে জমির উপর চাপ বাড়লে 'পাহি'দের সুবিধাজনক শর্তলাভ করাও নিশ্চয় সহজ ছিল না। পাহিদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অসুবিধে হলো এই যে, মুঘলযুগে বর্ণ বা উপজাতি ভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে তারা প্রায়ই অন্য বর্ণভুক্ত হতো, কারণ তারা অন্য গ্রামের অধিবাসী ছিল। ফলে, গ্রামীণ সমাজে তারা বহিরাগত ছিল এবং যৌথকর্মে তাদের ভূমিকা সীমিত ছিল। দ্বিতীয়ত—মুঘলযুগে 'পাহি' ও খুদ-কশ্‌থদের আনুপাতিক হার না জানা গেলেও একথা অনুমান করা যায় যে, পাহিদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল; কারণ সামগ্রিকভাবে জমির ওপর চাপ মোটেই বেশি ছিল না। শুধু আঞ্চলিক ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম হতে পারত। রাজস্থান থেকে প্রাপ্ত দলিল থেকে জানা যায় যে, পরগনা পিসাঙ্গানে মোট ৩৯৩ জন কৃষকের মধ্যে ৭৫ জন পাহি, অর্থাৎ মাত্র শতকরা ১৯ ভাগ মাত্র। পুনার পাটোদা তালুকে শতকরা ২৪ ভাগ মাত্র 'পাহি'। তবে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ সময়ে 'পাহি'দের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়া বিচিত্র নয়।[১৯]

রাজস্থানের কৃষি সমাজের ওপর সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে—পাহি, মুজারিয়ান ইত্যাদি ভাগ ছাড়াও 'গাভোতি' বা স্থায়ী কৃষকদের মধ্যে দুটো ভাগ ছিল। একদল ছিল রিয়ায়াত ও অপর দল রায়তি। রায়তিরা ছিল নিম্নবর্ণের কৃষক। তাদের পালটিও বলা হতো। এদের একাংশের জমির ওপর কোনো স্বত্ব থাকত না, 'গারুহালা'র কাছে 'সাজ' বা ভাগচাষে জমি নিত। তাদের উচ্ছেদ করাও সহজ ছিল। এরাই সবচেয়ে উচ্চহারে রাজস্ব দিয়ে চাষ করত। আবার, কিছু কিছু পালটির রায়তি-স্বত্ব ছিল এবং তারা জমি ইজারা নিতে পারত। কিন্তু এই সমস্ত চাষীদের ওপর রাজস্বের চাপ এতটা আসত যে এদের সঞ্চয় বলে কিছু থাকত না। এরা প্রয়োজনে রাজস্বের জন্যে ঋণ নেবার সময় বা কৃষির উপকরণ ধার করবার সময় রিয়ায়াত কৃষকের ওপর নির্ভর করত।[২০]

তৃতীয় ধরনের কৃষকদের আমরা 'মুজারিয়ান' বলে দলিলে চিহ্নিত দেখতে পাই। এরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে 'খুদ-কশ্‌থ' কৃষক বা জমিদারদের 'নানকার' জমি চাষ করার জন্যে নিজেদের দখলে আনত। এই ধরনের কৃষকরা জমিদার ইত্যাদি উচ্চতর শ্রেণীর কৃষকদের খাজনা দিত, কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট জমিতে রাজস্ব প্রদানের দায়িত্ব থাকত উচ্চতর শ্রেণীর কৃষকগোষ্ঠীর। এই কৃষকরা অনেকটা ভাড়াটের মতো ছিল। অনেক সময়ই এরা সাময়িকভাবে কয়েক বছরের জন্যে উচ্চতর কৃষকগোষ্ঠীর কাছ থেকে জমি পেত এবং জমির ওপর তাদের কোনো

রকম স্বত্ব জন্মাত না। কিন্তু কিছু কিছু বংশানুক্রমিক 'মুজারিয়ান'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের মুঘল দলিলপত্রে 'আসামিয়ান'দের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ঠিকমতো খাজনা দিলে জমিদাররা তাদের উচ্ছেদ করতে পারত না। শস্যের একটা নির্ধারিত অংশ উচ্চতর কৃষকশ্রেণী পেত। বিশেষত, 'মদৎ-ই-মায়েশ' জমিতে এদের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, কারণ অনেক সময় জমির উপভোক্তারা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন সব সময় উৎপাদনে নিজেরা অংশগ্রহণ করতে পারত না। 'মুজারিয়ান'দের এবং 'পাহি-কশথা'দের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য ছিল।

প্রথমত—'পাহি-কশথা' প্রায়ই নিজের গ্রামে 'খুদ-কশথা' ছিল এবং অন্য গ্রামেও 'খুদ-কশথা'য় রূপান্তরিত হতে পারত। 'মুজারিয়ান'দের সাধারণত এরকম অধিকার ছিল না। তাদের অধিকার পাট্টা অনুযায়ী বেঁধে দেওয়া হতো। দ্বিতীয়ত—'মুজারিয়ান' মাত্রই যে সে অন্য এলাকার বাসিন্দা হবে, তার কোনো মানে ছিল না। তৃতীয়ত—জমির উপর চাষের সময় পাহি-কশথাদের একক স্বত্ব ছিল। 'মুজারিয়ান'দের বংশানুক্রমিক দখলি-স্বত্বের সপক্ষে রাষ্ট্রের সকল নিয়ম থাকা সত্ত্বেও মুজারিয়নদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জমির উপর দ্বৈত স্বত্বের অস্তিত্ব ছিল। এক—উচ্চতর কৃষকশ্রেণীর, এবং দুই—মুজারিয়ান-দের বংশানুক্রমিক স্বত্ব। অর্থাৎ মুজারিয়ানরা ইচ্ছামতো নিজেদের কর্ষিত জমিতে অন্য কাউকে বসাতে পারত না, বা সেই জমির চাষের ভার অন্য কাউকে দিতে পারত না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'মুজারিয়ান'দের দিক থেকে কারোর জমি চাষ করতে অস্বীকার করলে পাট্টা বাতিলের নিদর্শন থাকলেও এই অধিকার কত ব্যাপক ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।[২১]

চতুর্থ শ্রেণীর কৃষক হচ্ছে ভূমিহীন চাষীরা। ব্রিটিশ আমলে এই জাতীয় কৃষকদের সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেলেও, মুঘল আমলের দলিলেও এদের উপস্থিতির নমুনা পাওয়া যায়। 'রিসালা-ই জিরায়তে' এই জাতীয় কৃষকদের বলা হয়েছে 'কলজানা'। অন্যান্য অঞ্চলে এদের বলা হতো 'তেখারি' বা বলাহার। এছাড়া বিভিন্ন গ্রামে ধানুকী চামার প্রভৃতি নিম্নতর শ্রেণীর বর্ণ বা বিভিন্ন ধরনের উপজাতিদের উপজীবিকা ছিল কৃষি ছাড়া আন্যান্য ধরনের তথাকথিত 'নিচু' কাজ করা। কিন্তু সারা বছরের খাদ্য এরা তার থেকে সংগ্রহ করতে পারত না, ফলে মরশুমের সময় প্রায়শই এরা প্রকৃত কৃষকদের কাজে সহায়তা করত এবং দৈনিক ভিত্তিতে কিছু পেত। এইসব বর্ণ বা উপজাতিদের সরাসরি কৃষিকর্ম থেকে সরিয়ে রেখে ভারতীয় বর্ণ-পদ্ধতিই গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন চাষীদের সৃষ্টি করেছিল।[২২] ভূমি দখলের সঙ্গে এইসব নিম্নবর্ণের সামাজিক অস্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ ছিল—এ বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেছে।[২৩] আজও নির্ধারিত উচ্চবর্ণ অধ্যুষিত গ্রামের চারপাশে কৃষি-শ্রমিকের সরবরাহের উৎসস্থল হলো নিম্নবর্ণ বা উপজাতিদের বিক্ষিপ্ত বসতি।[২৪] মুঘলযুগে এইসব ভূমিহীন কৃষকদের সঙ্গে আন্যান্য শ্রেণীর রায়তদের প্রধান তফাৎ ছিল দুটি। প্রথমত—

অন্যান্য শ্রেণীর কৃষকদের ভূমির ওপর কোনো-না কোনো স্বত্ব ছিল ; এদের তা ছিল না। দ্বিতীয়ত—যেখানে অন্যান্য শ্রেণীর কৃষকরা মূলত কৃষি থেকেই নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করত, সেখানে ভূমিহীন কৃষকরা অন্যান্য নানারকম কাজও করত।[২৫]

এই আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, মুঘলযুগের কৃষকদের অবস্থা ও অধিকার অনেক জটিল ছিল : সাধারণো প্রচলিত 'ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের' ধারণার সঙ্গে তার ফারাকও বিস্তর। প্রথমত—ভারতীয় গ্রামে শ্রেণীবিন্যাস বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের কৃষকদের যে বিভিন্ন ধরনের অধিকার ছিল এবং কার্যত তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল বিভিন্ন। কিন্তু সম্পন্ন কৃষক সীমিত অর্থে ইচ্ছা করলে নিজের মূলধন ও সামাজিক ক্ষমতার ভিত্তিতে উৎপাদনী শক্তিকে নতুনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত (সেচ ব্যবস্থার দ্বারা) করে অন্যান্যদের চেয়ে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত সম্পদ কৃষি থেকে আহরণ করতে পারত।

সমসাময়িক দলিল থেকে এর বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। আওরঙ্গজেবের আমলে পাঞ্জাবের একটি গ্রামে 'জিজিয়া কর' ধার্য সংক্রান্ত দলিল থেকে দেখা যায় যে, ২৮০ জনের মধ্যে ৭৩ জনকে নানারকম কারণের জন্যে 'জিজিয়া' থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। আরো ২২ জন একেবারে নিঃস্ব। বাকি ১৮৫ জনের মধ্যে ১৩৭ জনের সম্পদ ৫২ টাকার নিচে, ৩৫ জনের ৫২ টাকার কিছু বেশি, ১৩ জনের ২৫০০ টাকার মতো। রাজস্থানের পরগনা চাৎসূতে ৭৮টি মৌজার যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, বর্ণ অনুযায়ী অর্থনৈতিক অবস্থার প্রচুর তারতম্য ছিল। রাজপুতরা সমস্ত কৃষকের শতকরা ১ ভাগ হয়েও প্রত্যেকেই ৪টি বলদের মালিক ছিল। ২০০ জনের মধ্যে ২২ জন, অর্থাৎ শতকরা ১০ ভাগের ছিল মাথাপিছু ৪টি বলদ। বাকি ১৭৫ জন, অর্থাৎ শতকরা ৮৭ ভাগের ২টি বা তার চেয়েও কম বলদ ছিল।[২৬] গোরু ও লাঙলের তালিকা অনুযায়ী রাজস্থানের আরেকটি হিসাব দেওয়া যায়। এখানে মনে রাখা দরকার, যেসব চাষীদের লাঙল বা গোরু নেই, তাদের নাম এই তালিকায় থাকে না; কারণ ভূমিহীন চাষী ও কামিনরা সাধারণত গরিব চাষীদের সংখ্যা বা আনুপাতিক হারকে অনেক বাড়িয়ে দেয়। যাদের ১টি বলদ তাদের গরিব, যাদের ২টি থেকে ৪টি বলদ তাদের মধ্য এবং যারা ৪টির বেশি বলদের অধিকারী, সেইসব কৃষককে ধনী বলা হয়েছে। নিম্নলিখিত সারণি থেকে তথ্য অনুধাবন যোগ্য।

[১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দ]

পরগনা-	গরিব-	মাঝারি-	ধনী-	মোট-
চাৎসু (২৬টি গ্রাম)	২৪.৪ (৩৬৩)	৬৬.৬ (৯০৭)	৯ (১৩৩)	১০০ (১৪৮৩)
চালাকালান (৯৪টি)	১৮.৬ (৪৯২)	৮০.৯ (২১৩৯)	.৫ (১৪)	১০০ (২৬৪৫)
কোটলা	.৬ (৫)	৮০.২ (৭৪১)	৯.২ (৭৬)	১০০ (৮২২)

[*source* : Satishchandra, 'Capital Inputs for Expansion of Cultivation in Mediaeval India' ; IHR, vol. 3, no. 1]

অষ্টাদশ শতকে (১৭৯২-৯৪) কোটা অঞ্চলের পরগনা বারনের একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, ভূমিহীন কৃষক বাদে সমস্ত রায়তদের শতকরা ১০ ভাগ গ্রামের মোট ৪০ ভাগ জমি ভোগ করত ; মোট বলদের ৩৫ ভাগ তাদের মালিকানাধীন ছিল এবং হালি বা ভূমিহীন কৃষকদের শতকরা ৭০ ভাগ তাদের জমিতে চাষ করত। গ্রামের রায়তদের শতকরা ৭৫ ভাগই গরিব কৃষকের পর্যায়ভুক্ত ছিল। তাদের মালিকানায় মোট জমির শতকরা ২৬ ভাগ ছিল এবং তারা গ্রামের গবাদি পশুর মাত্র শতকরা ২৮ ভাগের মালিক ছিল। পূর্ব-রাজস্থানে পাওয়া সমসাময়িক দলিলে (১৭৯৬) দেখা যায় যে, ৩৬টি কৃষক পরিবারের মধ্যে ১৮টি কৃষক পরিবার বছরে একটি করে ফসল চাষ করে। তার মধ্যে পাঁচজন কৃষক বছরে এক মণেরও কম তিল উৎপন্ন করে এবং তাদের সাংবৎসরিক জীবন নির্বাহ নিশ্চয় নিজস্ব কৃষিকাজ থেকে হতো না। পক্ষান্তরে, দু'জন প্যাটেল সমেত ৯ জন কৃষক ছ'টা বা সাতটা শস্য এক বছরে চাষ করত। এক একজন প্যাটেলের আওতায় ১০ জন ক্ষুদে কৃষকের সমান জমি ছিল।[২৭]

এইসব তথ্য থেকে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীবিভাগের ব্যাপ্তি সহজেই অনুমেয়। দ্বিতীয়ত — বিভিন্নধরনের অধিকারের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থাকা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। যেমন পূর্ব-রাজস্থানে রাজপুতদের চাপে মীনারা রায়ৎ থেকে মুজারিয়া ও পরে ভূমিহীন কৃষকে রূপান্তরিত হয়। আবার, মথুরায় আহিরদের দমন করে জাঠদের উৎপত্তি, এই একই ধারাকে সূচিত করে। শান্ত নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তে আমরা একটি দ্বন্দ্ব-নিষ্পেষিত কৃষি সমাজের ছবি পাই।

খ. কৃষিক্ষেত্র ও মূলধন বিনিয়োগ ॥ জমির আধিক্য থাকলেও তাকে কৃষির আওতায় আনবার জন্যে মূলধন ও শ্রমের প্রয়োজন। অন্যদিকে দেখা যায় যে, এই সময়ে নগরের বিকাশ ও বহির্বাণিজ্যের বিস্তারের জন্যে মুঘল রাষ্ট্র ক্রমশ বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের দিকে জোর দিত। আর্থিক সামর্থ্যের দরুন কৃষকদের মধ্যে প্রধানত খুদ-কশথরা মূলধন ও অন্যান্য কৃষকগোষ্ঠীর সাহায্যে নিজেদের খাদ্যের জন্যে উৎপাদন করত। আবার, বাজারের জন্যে নানাবিধ শস্য উৎপাদন করাও তাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল না। মুঘলযুগে কৃষিতে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ কত ছিল, কোন কোন শ্রেণী এতে অংশ নিত, ইত্যাদি প্রশ্ন নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ। সব প্রশ্নের উত্তর এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি। যতটুকু জানা যায় তার থেকে একটা রূপরেখা মাত্র দেওয়া যেতে পারে।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে, কৃষিকর্মের উন্নতি প্রকল্পে মুঘল রাষ্ট্র উৎসাহী ছিল। 'নিগরনামা-ই-মুনসি'র মতো গ্রন্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রাজকর্মচারিদের ওপর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, তাদের দায়িত্ব হলো নিজের এলাকায় এক টুকরো জমিও যাতে অকর্ষিত না থাকে তা দেখা এবং কৃষকদের

ক্রমশ অপকৃষ্ট মানের শস্যের থেকে উৎকৃষ্ট মানের শস্য উৎপন্ন করতে উৎসাহ দেওয়া। রসিকদাস ক্রোরির প্রতি আওরঙ্গজেবের ফরমানেও এই জিনিস লক্ষ্য করা যায়। আমিলের প্রধান কাজই হচ্ছে, চাষের উপযুক্ত কোনো জমি যাতে অকর্ষিত না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা (জমিনে লায়েকে জেরায়েৎ ওফতাদে নে গোজরাদ) এবং নানা উপায়ে বন্ধ্যা জমিকে চাষের আওতায় আনা। (জমিনে বনজর বেদসথুরিগে মজরুয়ি।)[২৮] এর জন্যে ধার দেওয়া, খাজনা মকুব করা ইত্যাদি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা কৃষকদের দেওয়া হতো। গ্রামকে আবাদি করার জন্যে প্যাটেলকে লিখিত মুচলেকা দিতে হতো এবং সেই অনুযায়ী কাজ না করতে পারলে অন্য লোককে প্যাটেলের দায়িত্ব দেওয়া হতো।[২৯] পেশবা আমলেও আমরা দেখতে পাই, দ্বিতীয় বাজীরাও ও মাধব রাওয়ের সময়ে নতুন জমি, বাঁধ তৈরি করার জন্যে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে এবং রত্নগিরি এলাকায় পাথুরে জমিতে (দগড় সাটা) চাষযোগ্য করার জন্যে নানা সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।[৩০]

সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে সম্প্রসারণের জন্যে রাষ্ট্রের দিক দিয়ে কোনো বাধা ছিল না। এখন প্রশ্ন হলো, সাধারণত এই কাজ কারা করত। মুঘল সামন্তদের হাতে প্রচুর সম্পদ ছিল এবং তারাও এই কাজে সম্পদের কিয়দংশ কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ করত। এইসব টাকা প্রায়ই ফলের বাগানে নিয়োজিত হতো। সম্রাট থেকে মনসবদাররা সবাই নিত্য নতুন নানা ধরনের ফলের গাছ লাগাতেন এবং চারা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতেন। এই বাগানের ফল বাজারেও বিক্রি করা হতো। কিন্তু এই জাতীয় প্রচেষ্টা কখনোই কৃষি-অর্থনীতির ব্যাপক রূপান্তর ঘটায় নি। মুর্শিদাবাদের নিদর্শনই তার প্রমাণ। আমের বাগান এবং নানা ধরনের চারা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেখানে একটি উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। কিন্তু সেখানে প্রধান বাণিজ্যিক চাষ ছিল তুঁতগাছের চাষ। তুঁতের চাষ কৃষকদের একক প্রচেষ্টাতেই হতো এবং তাতে রাষ্ট্রীয় সামন্ত-শ্রেণীর যে খুব বড় রকমের ভূমিকা ছিল, এ আভাস পাওয়া যায় না।[৩১]

আবার, এক্ষেত্রে জমিদার শ্রেণীর কথা ভাবা যেতে পারে। এটা খুবই স্পষ্ট, প্রথমে যে বা যারা আবাদ করত, অনেক সময় জমিদারি অধিকার তাদেরই দেওয়া হতো। তাদের বলা হতো 'বনকাটি' জমিদার। বাংলা সাহিত্যে এরকম উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। সপ্তদশ শতকে রচিত 'সারদামঙ্গল' কাব্যে লেখা আছে—

> "যাহার রাজা নেই অরাজত্ব জমি।
> সেই গ্রাম আমারেই ইজারা দেহ তুমি ॥
> ... ...
> বেরুণ্যা (এড়ণ্ড) কাটেন বন বসাইল প্রজা।
> রাজ্যের পালন যেন করে রামরাজা ॥

তিন বৎসরের কৃষি নাহি রাজকর।
বনকাটা বেরুণ্যা যে বসাল্য নগর॥"

রাধাকৃষ্ণ দাস কর্তৃক ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে রচিত 'গোসানী মঙ্গল' কাব্যে জমিদার রঙ্গপুরে বন কেটে ধর্মপাল নামে বসতি স্থাপন করছে—এর উদাহরণ আছে।[৩২] 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী' অনুসারে নদীয়ার রাজবংশ এরকম কাজ অনেক করেছেন। রেউই গ্রামকে কৃষ্ণনগরে রূপান্তরিত করা একটি নিদর্শন। কৃষ্ণচন্দ্র নিজে গোপদের নিয়ে কৃষ্ণপুর গ্রাম স্থাপনা করেন। হরধাম ও আনন্দধাম নামেও গ্রামের পত্তন তিনি করেন।

বহুসময় জমিদার কৃষকদের অর্থ ধার দিতেন বা তাদের নিজেদের এলাকায় নানা 'আবওয়াব' মকুব করে তাদের বসবাস করতে উৎসাহ দিতেন। 'চণ্ডী-মঙ্গল' কাব্যে কালকেতুর গুজরাট পত্তনে লেখা হয়েছে—

"বীর কর অবধান প্রজাগণ দেহ পান
ভূমি বাড়ি করিয়া চিহ্নিত।
কিছু দিবে ধান্য কড়ি বলদ কিনিতে কড়ি
সাধন হইবে বিলম্বিত।
... ...
ধার লহ লক্ষ তঙ্কা কারে না কর শঙ্কা
দক্ষিণ আশায় কর বাস।"[৩৩]

কৃষিকর্মে উৎসাহিত করার নিদর্শন মহারাষ্ট্রেও দেখা যায়। এখানে জমিদার নিজে রায়তদের ঠিকমতো রাজস্ব দেবার জামিনদারও হতো এবং তার পরিবর্তে 'ইসতওয়া' হিসাবে এলাকা পেত। দাদাজী কোণ্ডদেব দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেদের সহায়তায় শিবাজীর বা শাহজীর এলাকাকে কৃষিকাজে সমৃদ্ধ করে তোলেন। মোরে বাখর অনুযায়ী চন্দ্ররাও মোরে জাওলির ব্যাঘ্র অধ্যুষিত অঞ্চলকে আবাদি করে তোলেন।[৩৪] এর ফলে দেশমুখ 'পাটিল-কি হক' বা 'ইজাফৎ গাওয়ার' মাধ্যমে তার নিজস্ব মূল এলাকার অতিরিক্ত এলাকা ইনাম পেত বা শুল্ক বা রাজস্বের একাংশ অতিরিক্ত পেত। ইন্দাপুরার ওয়াতনদারের নিজস্ব পরগনায় 'দেশমুখী হক' ছিল ৪,২৮২ টাকা; কিন্তু 'পাটিল-কি হক' ও 'ইজাফৎ গাওয়া' থেকে সে আরো ৩ হাজার টাকা আয় করত।[৩৫] সুতরাং এই অতিরিক্ত আয়ের মোহ অনেক জমিদারকেই কৃষির প্রসার ঘটাতে উৎসাহিত করেছিল, এটা স্বাভাবিক।

কিন্তু জমিদার ছাড়াও কৃষিজগতে একদল সম্পন্ন চাষীর অস্তিত্ব ছিল। কৃষি-ক্ষেত্রে শ্রেণী বিভাগের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই সম্পন্ন চাষীরা বাংলা সাহিত্যে বারবার মোড়লের ভূমিকায় চিত্রিত হয়েছে। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মা-পুরাণ' কাব্যে বলা হয়েছে—

"জগাই নামেতে মণ্ডল নগরেতে ঘর।
ধনের অন্ত নাহি রাজার সামাসর॥"[৩৬]

গ্রামের কৃষকদের একাংশই অপেক্ষাকৃত সম্পদশালী ছিল, তার আভাস ফারসি দলিল থেকেও সমর্থিত হয়। অষ্টাদশ শতকে বিদ্রোহী জমিদারদের লুঠের সম্পদের পরিমাণ এদিক থেকে ইঙ্গিতবহ। ১৭১৪ সনে সরকার মোরাদাবাদে জমিদার সদর সিং আনোলা পরগনার গ্রামগুলির লুঠের অংশ তাঁর আফগান সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন এবং তার পরিমাণ ছিল ৫২ হাজার টাকা। বিদ্রোহী জমিদার মোহন সিং বেরিলির ৮টি বা ২০টি গ্রাম থেকে প্রায় ৩ হাজার পশু লুঠ করেন।[৩৭]

এই মণ্ডলদের প্রতিপত্তি সম্পর্কে 'দিওয়ান পসন্দে' বলা হয়েছে—"এক একটি মৌজাতে এক বা ততোধিক মালিক বা মুকদ্দম নামে সম্পত্তির মালিক আছে। তাদের অধীনে ক্ষুদে চাষীদের কিষান বা আসামী বলা হয়।...এটা প্রায়শই দেখা যায় যে তাদের ভৃত্যদের সাহায্যে মুকদ্দম নিজেরাই নিজেদের জমি চাষ করে। তারা নিজেরাই একাধারে মুকদ্দম বা কিষান বলে অভিহিত হয় এবং তাদের পরিশ্রমের সব ফল নিজেরা ভোগ করে।[৩৮] গ্রামের মুকদ্দম বা সম্পন্ন কৃষকরা যে নানাভাবে শক্তি সঞ্চয় করত—তার আভাস পাওয়া যায়। ফারসি দলিলে 'কালান তারান' বা মুতাদোল্লিবানদের (বড় কৃষক) অত্যাচারের হাত থেকে রেজা রাইয়াদের (ক্ষুদে কৃষক) রক্ষা করার জন্যে সরকারি কর্মচারিদের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হতো।[৩৯] এই মুকদ্দমরাই প্রধানত ধনী কৃষক হতো। তারা রাজস্ব সংগ্রহের কারচুপিতে বা শান্তিশৃংখলা রক্ষার অজুহাতে তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করত।"

এরকম সম্পদশালী কৃষকরাই ছিল 'খুদ-কশ্‌থ'। এদের বলা হয়েছে 'হালে মির'—অর্থাৎ যার ৪টি বা ৫টি লাঙল আছে। এইসব 'হালে মির'দের অকর্ষিত জমি চাষ করতে উৎসাহ দেওয়া হতো। বহু সময় রাষ্ট্র এদের লাঙল ধার দিত। এছাড়া শাহজাহানের আমলে একটি নিয়মই ছিল, যেসব রায়ৎ বন কেটে জমি হাসিল করবে সেই জমি তার জমিদারি স্বত্বের আওতায় পড়বে।[৪০] খুব সম্ভব এরা মজুর বা কিষান লাগিয়ে চাষ করত। আগেই বলা হয়েছে, বাংলা দেশে অপরের জমিতে চাষ করে এমন কৃষকের কথা ফারসি দলিলেও পাওয়া যায়। অনেকে গ্রামের সম্পন্ন চাষীদের দ্বারা নিয়োজিত হতো। তার একটি প্রমাণ আছে পদ্মাপুরাণে। চাঁদ সদাগর মজুরের কাজ করেছিল এবং নিয়োগকর্তা মণ্ডল কিষান লাগিয়ে চাষ করাত।

> "এত শুনিয়া মণ্ডলিয়া কহে চান্দের কাছে।
> আগে কর্ম করিবার ভাত পাবে পাছে॥
> এতেক ভাবিয়া মণ্ডল মনে মনে পাছি।
> ধান্য নিড়াইতে চান্দের হাতে দিল কাঁচি॥

মার মার বলিয়া মণ্ডল করে হাহাকার।
এত শুনি আসিল তথায়ে কিষাণ তাহার ॥
সকলে আসিয়া তখন চান্দেরে ধরিল।"[৪১]

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে জয়নারায়ণ সেন রচিত 'হরিলীলা'য় আমরা দেখি যে, ব্রাহ্মণের জমিতে একজন জন-মজুর হাল করবার জন্যে নিয়োজিত হয়েছে।[৪২]

এইসব 'খুদ-কশ্‌ত' রায়তরা কৃষিকর্ম বিস্তারে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল এবং উৎপাদনকে নিজেরা মজুর ও লাঙ্গলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিল। 'মাসির-উল-উমারা'য় আছে, অষ্টাদশ শতকে মোকরাব খান নামে একজন গ্রামীণ সম্পদশালী ব্যক্তি মজুর দ্বারা নিজের জমি চাষ করাত এবং সে সেই অঞ্চলের দুধ ও বীজ ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করত। ফলে সে প্রচুর লাভ করেছিল।[৪৩] 'দিওয়ান-পসন্দে' বলা হয়েছে—

"খুদ-কশ্‌তরা মজুরকে তাদের ভৃত্য হিসেবে নিয়োজিত করে এবং চাষের কাজে লাগায়। কুয়ো থেকে জল তোলা, লাঙল চালানো, বীজ বপন করা ও চারা রোওয়াবার কাজের পরিবর্তে তারা তাদের টাকায় বা ধানে নির্দিষ্ট মজুরি দেয়—যেখানে নিজেরা মোট কৃষিজাত উৎপন্ন আত্মসাৎ করে।"[৪৪]

অষ্টাদশ শতকে পূর্ব-রাজস্থানে এইসব খুদ-কশ্‌ত রায়তরা যে অন্যান্য কৃষকদের জমি কিনেছিল এবং নিজেদের খাস চাষ, অর্থাৎ 'গারুহালায়' রূপান্তরিত করেছিল—তার প্রমাণ আছে। সেইসব জমির প্রাক্তন মালিকরা শস্যের একাংশ নিয়ে ভাগচাষীতে রূপান্তরিত হচ্ছিল। রাজস্থানের কসবা চাৎসুতে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ শতকে ৩৫০টি 'পালটি' জমির ১৭৫টি ক্ষেতের দখলি-স্বত্ব খুদ-কশ্‌তদের হাতে অভাবের তাড়নায় চলে গেছে এবং শতকরা ৫০ ভাগ 'পালটি' মালিকরা হয় ভাগচাষী, নয় মুজারিয়ানে রূপান্তরিত হয়েছে।[৪৫] মুঘল দলিলে বারবার 'রায়তি-কশ্‌ত' জমিকে 'খুদ-কশ্‌ত'-এ পরিবর্তিত করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি এই জাতীয় প্রক্রিয়ার বিকাশকেই সূচিত করে। মালাবারের (সরাসরি মুঘল শাসিত এলাকা নয়) কৃষিতেও ঐরকম পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতকে মালাবারে গোলমরিচ চাষ করত সাধারণত ছোট ক্ষেতের মালিক মাঝারি চাষীরা। ১৭৩৮ সনে ডাচ দলিলে গোলমরিচ সরবরাহকারীদের গরিব কৃষক বলা হয়েছে এবং তারা রাজনৈতিক গোলমালের সময় প্রায়ই পাহাড়ে পালিয়ে যেত। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষে বুকানন হ্যামিলটনের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই—অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বেশির ভাগ গোলমরিচের ক্ষেত তখন জোতের মতো চাষ হয়। নায়ার শ্রেণীভুক্ত কানুমকাররা মজুর দিয়ে সরাসরি তদারকিতে গোলমরিচ চাষ করাত। সময় সময় ছোট ছোট কৃষককে জমি ইজারা দিয়ে চাষ করানো হতো। সেখানে কৃষক মালিকের হয়ে চাষ করত এবং উৎপন্নের সামান্য অংশমাত্র নিজের থাকা-খাওয়ার জন্যে পেত। এই সমস্ত কানুমকাররা আবার মূলধনের জন্যে শহরের

ব্যবসায়ীদের দ্বারস্থ হতো।[৪৬] অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে বাণিজ্যিক পুঁজির কিছুটা অনুপ্রবেশ হয়েছিল। ফলে, জোত সৃষ্টি হলো ও মজুরের মাধ্যমে মালিকের সরাসরি তদারকিতে চাষ হতো। সপ্তদশ শতকে বায়ানার নীলচাষে আমরা দেখি যে, বণিকরা সরাসরি নিজেদের আওতায় ও তদবিরে নীলচাষ করবার উদ্যোগ নিয়েছে।[৪৭]

এখানে দুটো কথা মনে রাখা দরকার। কৃষিজাত সম্পদের ঠিক কতটা অংশ জমিতে পুনর্বিনিয়োগ হতো বা 'খুদ-কশ্‌থ' চাষ গোটা মুঘল কৃষিক্ষেত্রের কতটা অংশ অধিকার করেছিল এর কোনো সংখ্যাতথ্য এখনো আমাদের জানা নেই। দ্বিতীয়ত—রাষ্ট্র বা জমিদারদের ক্ষেত্রে মূল সাহায্য ছিল বীজ ধান দেওয়া ও কৃষককে প্রথমদিকে সুবিধাজনক হারে রাজস্ব দেবার সুবিধা করে দেওয়া। কৃষিক্ষেত্র সরাসরি প্রসারের ক্ষেত্রে এবং জঙ্গল হাসিল করার ক্ষেত্রে দায়িত্ব ছিল কৃষকের এবং এই কাজে সে সম্পূর্ণ তার নিজের গ্রামবাসীদের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল ছিল। একবার 'মিরাসি' বা ভোগদখলি-স্বত্ব পেয়ে গেলে তাকে নিয়মিত রাজস্ব যেনতেন প্রকারে দিতেই হতো।[৪৮] অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে রচিত 'শিবায়ন' কাব্যে চাষের কাজে নিয়োজিত চাষীর এইসব সমস্যা বিবৃত হয়েছে। চাষ করার জন্যে শিবরূপী চাষীকে নানাজনের দ্বারে যেতে হয়।

> "কাত্যায়নী কন কান্ত কিছু নাঞি কেন।
> কুবেরের বাটি বীজ বাড়ি কর‍্যা আন॥
> তুমি চাষ চষিলে কিসের অসদ্ভাব।
> শক্রের সাক্ষাৎ হলে সদ্য ভূমিলাভ॥
> ঘরে আছে বুড়া আড্যা ধরে মহাবল।
> যমের মহিষ আন বলারি লাঙ্গল॥"

ক্ষেতে জমি হাসিল করার জন্যে চাষীকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয় ও নানা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে চাষ করতে হয়। যেমন—

> "চৈত্র গেল চতুর্দশ চাষ হৈল পূর্ণ।
> মাঠো করা মই দিয়া মাটী কৈল চূর্ণ॥
> ... ...
> বৈশাখে বিছাতি কৈল বিলক্ষণ দিনে।
> সার বয়্যা সব ভূম ভোর রাতে বুনে॥
> ভূম বুনে ভূতনাথ ভাজা পোড়্যা ছাড়্যা।
> কলমীর শাক খাইয়া উজাড়িল গেড়্যা॥"

এহেন পরিশ্রমে চাষীর মনোভাবও সুন্দর ব্যক্ত হয়েছে। যেমন—

> "শুনিতে সুন্দর চাষ আয়াস বিস্তর।
> সকল সম্পূর্ণ যার তার নাহি ডর॥

চাষ বলে ওরে চাষী	আগে তোকে খাব।
মোরে খাবি পশ্চাতে	যগুপি ক্ষেতে হব ॥
অনেক আয়াসে চাষে	শস্ত উপস্থিত।
শুখা হাজ্যা পড়িলে	পশ্চাৎ বিপরীত ॥
গরীবের ভাগ্যে যদি	শস্ত হয় তাজা।
বার কর্য্যা সকল	বেচিয়া লয় রাজা ॥
ক্ষেত্যা দেখি খন্দ যদি	খাত্যে নাহি পায়।
কুত্যা কাত্যা কায়েৎ	কিফাতি (লাভ) করে তায় ॥
কাদাপানি খেয়ে খাট্যা	করে চাষী পনা।
নরোত্তম ছাড়্যা	নরাধম উপাসনা ॥"[৪৯]

গোটা মুঘল আমলে কৃষিকাজের প্রসার হয়েছিল এবং তা প্রধানত উপরে বর্ণিত চাষবাসের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছিল। এখানে ব্যাপকভাবে মূলধন বিনিয়োগের কথা আসে না, বরং চাষীর দৈহিক শ্রমই প্রধানতম উৎস ছিল। জমির উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে জমিদারদের ভূমিকা দারুণ বৈপ্লবিক ও প্রগতিশীল ছিল—এটা মনে করা কতদূর যুক্তিসংগত তা ভাববার বিষয়। যেসব অঞ্চলে আদৌ চাষ হতো না, সেসব জায়গায় জমিদাররা আয়ের আশায় নানা প্রাথমিক সুবিধা দিয়ে লোক পাঠাতেন। তাতে লোকসানের ঝুঁকি খুব বেশি ছিল না। এবং নির্দিষ্ট সময় পরে নতুন আবাদি জমিতে বসতি কৃষকদের একই হারে খাজনা ধার্য হতো।

পূর্বোল্লিখিত পোর্তুগিজ প্রতিবেদনে এই প্রক্রিয়ার কথা স্পষ্টই বলা হয়েছে। "শাক-সবজি, বাগান বা অন্য কিছু লাভজনক চাষ করতে উৎসাহী গাঁওকার তাঁর গ্রামের সীমানায় পতিত ও কর্ষিত জমি দিয়েই দিতে পারে। ২৫ বছর পর্যন্ত এই দান সুবিধাজনক হারে দেয় খাজনার শর্তাধীন থাকবে, তারপরে কিন্তু প্রথামতো হারে খাজনা দিতে হবে।"[৫০]

এই ধারা ব্রিটিশ যুগেও চলেছে এবং সেইসব দিক থেকে যদি ব্রিটিশ যুগের জমিদারদের কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে বিশাল ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা ওঠে—তা মেনে নেওয়া একটু শক্ত।

কিন্তু 'খুদ-কশথ' চাষ ভবিষ্যতের দিক দিয়ে নিশ্চয় নতুন দিকবাহী ছিল। মালাবারের ক্ষেত্রে বণিকদের গোলমরিচ চাষে হস্তক্ষেপ অষ্টাদশ শতকের ঘটনা। আগ্রায় নীলচাষে বণিকদের ভূমিকা একটি ব্যতিক্রম বলে মনে করা যেতে পারে। তবে, গ্রামাঞ্চলের সম্পন্ন চাষীদের জোতের মাধ্যমে চাষ করার উদ্যোগ ততটা বিরল ঘটনা বোধহয় ছিল না এবং একমাত্র সেক্ষেত্রেই মূলধনের প্রকৃত বিনিয়োগ কিছুটা হচ্ছিল—একথা বোধহয় বলা যায়। রাষ্ট্র এই ধরনের চাষ খুব পছন্দ করত না। কারণ 'খুদ-কশ্‌থ' রায়তরা কম হারে রাজস্ব দিত এবং তাদের তত্ত্বাবধানে জোতের বৃদ্ধি পাওয়া মানে রাষ্ট্রের ভাগ্যে রাজস্ব কম পড়া।

সবসময়ই 'খুদ-কশ্‌ত'দের পরিবারের লোকজন দিয়ে চাষ করাতে উৎসাহ দেওয়া হতো বা জমি অন্যকে ইজারা দিয়ে দিতে বলা হতো। সরাসরি ক্ষেতমজুর নিয়োগ করার প্রথা ব্যাপক প্রচলিত থাকার কথা নয়, কারণ জমি ও কৃষকের আনুপাতিক হার কৃষকের অনুকূলে ছিল এবং কৃষক না পালিয়ে প্যাটেলের সহায়তায় পার্শ্ববর্তী এলাকায় 'পাহি-কশ্‌ত' হতে পারত। মজুরের সংখ্যা পাওয়া না-পাওয়ার সঙ্গে 'খুদ-কশ্‌ত' চাষের বিস্তৃতির একটি সম্পর্ক আছে এবং সেদিক থেকে মুঘলযুগে ঐরকম চাষের ব্যাপক বিস্তৃতি হবার কথা নয়। দ্বিতীয়ত—রাষ্ট্রের প্রচণ্ড চাপ বহুসময় গ্রামের সঞ্চিত মূলধনকে রাজস্ব হিসেবে আদায় করত।

সুতরাং গ্রামে মূলধন অনেক লোকের হাতে থাকত না, এবং তারও কিছুটা অংশ মহাজনী কারবারে বা ইজারা নেবার সময় ব্যয়িত হতো। অর্থাৎ 'খুদ-কশ্‌ত' চাষের বিস্তৃতির পেছনে যেরকম মূলধনের পরিমাণ থাকার দরকার তাও মুঘল গ্রামীণ সমাজে অপেক্ষাকৃত কম ছিল বলে মনে হয়। অবশ্য মুঘল আমলের দলিলগুলো পড়েই এরকম একটা ধারণা আমার হয়েছে। 'খুদ-কশ্‌ত' রায়তির ঐতিহাসিক সম্ভাবনা নিয়ে নির্দিষ্ট আলোচনা করার জন্যে আরো তথ্য ও গভীর গবেষণার দরকার, এটুকুই বলা যেতে পারে।

৬

মুঘল কৃষিব্যবস্থা

দ্বন্দ্ব ও সংকট ॥ কৃষকদের শ্রমই ছিল মুঘলযুগের শোষকশ্রেণীর বিপুল ঐশ্বর্যের উৎস। এই শ্রমজাত উদ্বৃত্ত শুধুমাত্র নির্দিষ্ট আইনানুগ রাজস্বের মাধ্যমেই সংগৃহীত হতো না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নানা ধরনের 'আবওয়াব' বা বেআইনি কর। কৃষক তার সংবৎসরের শস্যের একটি বিরাট অংশ 'আবওয়াব' মেটাবার জন্যে দিয়ে দিত। মুঘল সম্রাটরা এই আবওয়াব সংগ্রহ বারবার নিষিদ্ধ করলেও কার্যত এগুলো কোনো সময় বাতিল হয়নি। প্রত্যেক মুঘল সম্রাটই রাজ্যারোহণের সময় একটা করে ফরমান জারি করে এগুলো বাতিল করতেন। কিন্তু জাহাঙ্গির থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত সকলেরই এই একই ধরনের ফরমান জারি করা এইসব আবওয়াবের উপস্থিতির কথাই প্রমাণ করে।[১] মুকুন্দরামের রচনাতেও এইসব আবওয়াবের একটি ফিরিস্তি আছে। এইরকম কিছু আবওয়াব বাতিল করে কালকেতু কৃষকদের বিশেষ ভাবে গুজরাট নগরে বসবাস করতে আকৃষ্ট করছে। ঘটনাটি এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

"শুন ভাই বুলান মণ্ডল।

... ...

আমার নগরে বৈস জত ভূমি চাষ চষ

সাত সন বই দিয় কর।
সেলামী বাঁস গাড়ী নানা বারে জত কড়ি
নাহি দিহ গুজুরাট দেশে।
পার্বণি পঞ্চক-জাত গুড়া লোন সানা ভাত
ধান কাটি কলম কসুরে।
জত বেচ চালু ধান তার নাহি দিব দান
অঙ্ক নাহী বাড়াইব পুরে।"[২]

এইসব 'আবওয়াব' কৃষকদের কাছে রাজস্বের বোঝাকে অসহ্য করে তুলেছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একথা বলা হয় যে, মুঘলযুগের শেষে কৃষকদের ওপর রাষ্ট্রের দাবিও বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৩] 'জাবত' বন্দোবস্তে আকবরের সময় রাজস্বের পরিমাণ ছিল উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ। আওরঙ্গজেবের সময় তা বেড়ে গিয়ে পরিমাণ দাঁড়ায় দুই-তৃতীয়াংশে। অবশ্য আধুনিক ইতিহাসবিদদের মতে এই ধারণা সঠিক নয়।[৪] নানা কারণে আকবরের সময় খাতা-কলমে এক-তৃতীয়াংশ রাজস্বের দাবি থাকলেও আসলে প্রকৃত রাজস্বের পরিমাণ দুই-তৃতীয়াংশই হতো। কারণ 'জাবত' ব্যবস্থায় সাধারণত রাজস্ব দিতে হতো রাষ্ট্র-নির্ধারিত নির্দিষ্ট টাকার হারে ; যদিও রাজস্ব ধার্য হতো শস্যের পরিমাণে। ফলে শস্য তোলার মরশুমে কৃষকদের সাধারণত ধান বিক্রি করে রাজস্ব দিতে হতো। যেহেতু সে সময় বাজারে রাষ্ট্র-নির্ধারিত নির্দিষ্ট হারের চেয়ে শস্যের দাম কম থাকত, সেহেতু কৃষকদের উৎপন্ন শস্যের বৃহদংশই নির্দিষ্ট দেয় অর্থ সংগ্রহের জন্যে বিক্রি করতে হতো। ফলে রাজস্বের দাবি বাড়ানো বহু জায়গায় রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আওরঙ্গজেব প্রকৃত সত্যকে আইনের মর্যাদা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত— আওরঙ্গজেবের সময় বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে 'মুদ্রাস্ফীতি' দেখা যায় এবং শস্যের দাম বেশ বেড়ে যায়। কিন্তু 'জাবত' বন্দোবস্তে নির্ধারিত নির্দিষ্ট টাকার হার সেই সময় একই থাকে। ফলে রাজস্বের অতিরিক্ত হার (উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের নিরিখে) শস্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষকদের অবস্থা উত্তরোত্তর শোচনীয় হতে থাকে। মধ্য যুগে প্রচলিত ইসলামিক অর্থনীতিতে মূল বক্তব্যই ছিল—কৃষকের ওপর শোষণের মাত্রা তার ন্যূনতম জীবনযাত্রা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা অবশ্যই সীমিত থাকবে।[৫] রাষ্ট্র এমন কিছু দাবি করবে না যাতে করে কৃষকের ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান বিপর্যস্ত হয়। কারণ এর ফলে কৃষকদের উৎপাদিকা ক্ষমতা কমে গিয়ে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং কৃষক-বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা যায়। আওরঙ্গজেবের এই নীতির নিদর্শন নানা নির্দেশনামায় ছড়িয়ে আছে।

জাহাঙ্গিরের আমলে একজন সুবেদারের নিয়োগপত্রের বয়ান বিচার করা যাক। একটি জায়গায় বলা হয়েছে যে, কৃষকদের সঙ্গে এমনভাবে বন্দোবস্ত

করবে যে তারা নিশ্চিন্ত মনে ও নিরাপদ অবস্থায় বাড়িঘর ও বসবাসের উন্নতি করবে, খুশি থাকবে এবং বাণিজ্যিক পণ্য চাষ করতে উৎসাহী হবে। ফলে, বছরের পর বছর পরগনার রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। (দর জিরায়তে ওয়া ইমারত খুব মশগুল ওয়া খুশওয়াকথ বাশান্দ ওয়া রেয়া ইয়রা দর কশথনে জিনসে কামাল রাগবৎ দেহাদ কে জমায়ে পরগনাৎ সাল বেসাল আফজুদান শওয়াদ)। আবার ঠিক তার পরেই বলা হয়েছে, রাজস্ব প্রদানে অনিচ্ছুক কৃষকদের এমনভাবে শায়েস্তা করা উচিত যে, অন্য লোকেরা যেন আগে থেকেই সাবধান হতে পারে।[৬]

শায়েস্তা করার নিদর্শন আমরা প্রচুর পাবো। কিন্তু অত্যাচারের নির্দিষ্ট সীমা ছাড়ালেই মুঘল সম্রাটরা সাধ্যমতো ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। উড়িষ্যার সুবেদার হাসিম খানকে অত্যাচারের অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়। জনগণের অভিযোগের ভিত্তিতে থানেশ্বরের অত্যাচারী ক্রোরিকে আকবর ফাঁসি দেন। গুজরাটের জায়গিরদারদের বেশি হারে রাজস্ব ধার্য করাকে আওরঙ্গজেব অত্যাচার বলে ঘোষণা করেন। কৃষকরা পালালেই সম্রাট, কানুনগো ও চৌধুরিকে কড়কে দিতেন যাতে করে তারা বেশি বাড়াবাড়ি না করতে পারে। গৌরীপুরের কানুনগোর প্রতি এক ফরমানে আওরঙ্গজেব রাজস্ব হ্রাস করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন। প্রজাদের অভিযোগের ভিত্তিতে জমা ১৬২ টাকা থেকে কমিয়ে ৪০ টাকায় ধার্য করা হয়। কৃষকদের অসংখ্য আবেদনপত্র ও সংবাদ প্রেরকদের (খুফিয়া-নবিশের) চিঠি এবং তার উপরে সম্রাটের নির্দেশের নিদর্শন আওরঙ্গজেবের আমলে আখবরাতে ছড়িয়ে আছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলেই দোষী কর্মচারিকে হয় বদলি নয় বরখাস্ত করা হতো। সুতরাং ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা ছিল কেন্দ্রীয় শক্তির উদ্দেশ্য। কিন্তু মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থায় নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যে এই ভারসাম্য ক্রমশ নষ্ট হয়েছিল এবং কৃষকের অবস্থা ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

সুজন রায় প্রণীত খুলাসাৎ-উৎ-তওয়ারিখে একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনার কথা আছে। গুরু অর্জুন আকবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আবেদন করেছিলেন যে, "পাঞ্জাবে মুঘলসৈন্য আসবার সঙ্গে সঙ্গে শস্যের দামও বেড়ে গেল এবং পরগনাতে রাজস্বের হারও বেড়ে গেল। সৈন্যবাহিনী চলে যাওয়ার পর শস্যের দাম কমে গেল, কিন্তু রাজস্বের হার অক্ষুণ্ণ থাকাতে রায়তরা কর দিতে অপারগ হলো।" আকবর অর্জুনের আবেদন শুনে শতকরা ১০ থেকে ১২ ভাগ কর কমিয়ে দিয়েছিলেন।[৭] এই ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত—গুরু অর্জুন রায়তদের অভাব নিয়ে সম্রাটের কাছে দরবার করেছেন। এর দ্বারা পাঞ্জাবের কৃষিসমাজে তাঁর প্রতিপত্তির আভাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত—অভাব অভিযোগ নিয়ে সম্রাটের কাছে আর্জি করা এবং সেই আর্জি মঞ্জুর করার মধ্য দিয়ে মুঘল শাসনের সঙ্গে কৃষকের যোগাযোগ ও নির্ভরতার ভাব সূচিত হয়। আকবর এই দাবিটাও

মেনে নিতে পারলেন, কারণ তখন মুঘল রাজস্ব-ব্যবস্থার ভারসাম্য নষ্ট হয়নি।

জাহাঙ্গিরের রাজত্বে শরন থেকে প্রাপ্ত একটি ফর্মানে বলা হয়েছে যে, নারায়ণ ও ভাওয়াল নামে দু'জন জেলে পুকুর থেকে মাছ ধরত এবং সেই অধিকার তাদের বংশানুক্রমিক ছিল। কিন্তু জায়গিরদারের আমলারা তাদের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করেছে। জাহাঙ্গির এইরকম আচরণের বিরুদ্ধে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং ঐ দু'জন জেলের আবেদন মঞ্জুর করে তাদের বংশানুক্রমিক অধিকারকে স্বীকার করেন। আওরঙ্গজেবের আমলে জয়পুর আখবারাতে অজস্র দৃষ্টান্ত আছে যে, আমলা ও জমিদারদের আবওয়াব গ্রহণ ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সাধারণ প্রজারা সরাসরি অভিযোগ করছে এবং সম্রাট তৎক্ষণাৎ তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছেন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। তাঁর রাজত্ব-কালে দ্বাদশবর্ষে জারি করা একটি ফর্মানে আগ্রার সরকার কনৌজের খালিসার দেওয়ানকে জমিদার, আমিল, ক্রোরি, ফোতাদার প্রভৃতি কর্মচারিদের ওপর ব্যাপক খবরদারি করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, এইসব অধস্তন কর্মচারিরা যাতে জোরজুলুম করে কৃষকের কাছ থেকে নায্য রাজস্বের অতিরিক্ত আদায় না করে।[৮]

মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণু দিনগুলিতেও এই জাতীয় যোগাযোগের কিছু প্রমাণ হাজির করা যেতে পারে।[৯] বিহারের সাসারাম এলাকায় প্রাপ্ত কিছু আবেদনপত্রের ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে যে, ফাররুখসিয়ারের আমলে বংশানু-ক্রমিক কানুনগো শোভাচাঁদের সঙ্গে তাঁর রায়ৎ তিন তাঁতি—মুসা, শেরো ও জহুরির রাজস্ব নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। ফলে, এরা নিজেদের এলাকার অভিজাত বলে জাহির করে এবং সৈয়দদের সঙ্গে যোগাযোগ করে শোভাচাঁদের বিরুদ্ধে দরবারে ধর্মীয় বিদ্বেষের অভিযোগ আনে। শেষ পর্যন্ত দরবারের মাধ্যমে পুরনো কানুনগোর জায়গায় মহম্মদ নাজির বলে আরেকজন কানুনগোকে বহাল করতে সমর্থ হয়। কিন্তু এই নতুন কানুনগো অপরিচিত ও বাইরের লোক। ফলে ঐ পরগনার ৪০ জন মাতব্বর ও সাধারণ রায়ত মিলে মহম্মদ শাহের কাছে ১৭২২ সনে পুরনো কানুনগোকে তার পদে পুনর্বহাল করার জন্যে দরখাস্ত করে এবং আবেদন মঞ্জুর হয়। এই আবেদনপত্রগুলি একদিকে মুঘল গ্রামের দ্বন্দ্বের দুর্লভ ছবি উপহার দেয়। যথা, পুরনো স্থানীয় কানুনগো ও আশরাফদের সঙ্গে গ্রামের তাঁতি ও বাইরের সৈয়দ ও কানুনগোর বিরোধ। কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, উভয় পক্ষই দরবারে যোগাযোগ ও আবেদনের মাধ্যমেই তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করেছে এবং দরবার ও গ্রামের জনগণের মতকে কোনো-না কোনো ভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। যদি মুঘলশাসন থেকে গ্রামের লোকেরা একেবারেই বিচ্যুত হতো, তবে এ ধরনের আবেদনের ভূমিকা গ্রামের রাজনীতিতে থাকত না। তাই মুঘল আমলে কৃষক-প্রতিরোধ আন্দোলনের পাশাপাশি গ্রামীণ জীবনে কোনো-না কোনো

স্তরে মুঘল শাসনের গ্রাহ্যতার কথাও মনে রাখতে হবে।

আঞ্চলিকভাবে এই রাজস্ব আদায়ের চাপ বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পেয়েছিল। আঞ্চলিক বিভিন্নতার একটি সম্ভাব্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। রাজস্থানে ব্যাপকহারে 'আবওয়াব' বৃদ্ধিকে একটা লক্ষণ ধরলে দেখা যায়, ১৭৪০ সনের আগে পর্যন্ত রাজস্থানে উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল, রবি-শস্যের চাষ হচ্ছিল, দাম বাড়ছিল এবং টাকায় রাজস্ব দেওয়া হচ্ছিল। ১৭৪০ সনের পর থেকেই এই সমস্ত ধারার বিপরীতমুখী পরিবর্তন এলো। গ্রামীণ শিল্পীরা, যারা আগে অনেক সময়েই 'আবওয়াব' দেবার হাত থেকে রেহাই পেত, তাদের ওপরে চাপ বাড়ল। ১৭০০ থেকে ১৭৪০ সন পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাসঙ্গিক অভিযোগের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৯টি। ১৭৪০ থেকে ১৭৭০-এ এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ৯০টি। নিঃসন্দেহে এই সময় কৃষি-অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যবস্থায় সংকট দেখা দেয় এবং সেজন্যে রাজস্বের লোকসান পুরণের জন্যে অতিরিক্ত ধার্য আদায়ের চাপ অনেক বৃদ্ধি পায়।[১০]

বাংলা দেশে এই প্রক্রিয়া আবার একটু আলাদা। প্রথম পর্যায়ে বাংলা দেশের জমিদারদের জমি জরিপ ও শস্যের ওপর কর আদায়ের চেয়ে লাঙল পিছু কর সংগ্রহের দিকেই ঝোঁক ছিল। মুকুন্দরামের কাব্যে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। কিন্তু মুঘল রাজত্বে 'ঘরের আমলি' বা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী জমিদারদের ধীরে ধীরে আমলি-জমিদার বা মধ্যবর্তী জমিদারে রূপান্তরিত করা হচ্ছিল। ফলে, মুঘল শাসনব্যবস্থার প্রভাবে উৎপন্ন শস্যের ভিত্তিতে, মাপজোখ ও জরিপের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা এবং এজন্যে কর্মচারি নিয়োগ করার প্রথা চালু হয়ে গিয়েছিল। এই রূপান্তরের ফলে প্রজার ওপর ক্রমবর্ধমান চাপকে মুকুন্দরাম প্রমুখ কৃষি-সমাজের প্রতিভূ কবিরা মোটেই সুনজরে দেখেন নি। এই লাঙল-ভিত্তিক রাজস্বব্যবস্থা থেকে জমির জরিপ ও উৎপন্ন শস্যভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থায় উত্তরণজনিত চাপের বর্ণনা মুকুন্দরামের রচনায় বিশদভাবে বলা আছে। প্রথমে আত্মজীবনীতে "প্রজার পাপের ফলে ডিহিদার মামুদ শরীপের" কাজ হচ্ছে দুটো। "মাপে কোণে দিয়া দড়া। পনের কাঠায় কুড়া। নাহি মানে প্রজার গোহারি।" দ্বিতীয়ত—"খিল ভূমি লেখে লাল।" কালকেতু প্রজাদের আশ্বস্ত করছে এই বলে যে, সে ডিহিদার নিয়োজিত করবে না। অত্যাচারী ভাঁড়ু দত্ত লাঙলপিছু খাজনা নেবার পরিবর্তে প্রজাকে ভূমি অনুযায়ী (বসবাস করিয়ে) নির্ধারিত পরিমাণ ধানে শস্য নিতে বলছে—

"ভাড়বালা দিবে মান দিবে হে বলদ ধান
উচিত কহিতে কিবা ভয়।
জিনিতে প্রজার মায়া পত্র নিবে এক ছিয়া
বন্দে বন্দে যেন প্রজা রয়॥

যখন পাকিবে খন্দ পাতিবে বিষম ফন্দ
দারিদ্র্যের ধানে নিবে নাগা।
খাইয়া তোমার ধন না পালায় কোন জন
অবশেষে নাহি পাও দাগা॥"[১১]

মুরাকাৎ-ই-হাসানে জানানো হয়েছে যে, পূর্বে বাংলাদেশে জমিদারদের রাজস্ব সংগ্রহে ও প্রেরণে গাফিলতি দেখা যেত। মুঘল ফৌজদারদের দুর্বলতাই এর কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। আলমগিরের রাজত্বের শুরু থেকেই ফৌজদার-দের মাধ্যমে জমিদারদের কর্তব্যে অবহেলা না করার জন্যে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং পুণ্যাহের সময় সবাইকে হাজিরা ও বকেয়া মিটিয়ে দেবার জন্যে বলা হয়েছে। মুঘল শাসনব্যবস্থার এ ধরনের চাপ হয়তো জমিদারদের নিজেদের রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থার কাঠামোকে পরিবর্তনের পথে নিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে মুর্শিদকুলি খান ব্যাপকহারে জমির জরিপ ও রাজস্ব প্রেরণ ও সংগ্রহে নিয়ন্ত্রণ আনার জন্যে খ্যাতিলাভ করেছেন। এ ধরনের রাজস্ব ব্যবস্থা শাসনব্যবস্থার কাঠামোকে সুদৃঢ় করে এবং অন্যদিক থেকে কৃষিসমাজে চাপ বাড়ায় ও কৃষকের উদ্বৃত্তকে আরো নিপুণভাবে আত্মসাৎ করে। তাই ডিহিদার নিয়োগ, জমির জরিপ ও লাঙলপিছু করের পরিবর্তে উৎপন্ন শস্যের ওপরে কর কৃষিসমাজের প্রতিভূ কবিদের কাছে সুদিনের বার্তাবহ বলে মনে হয়নি।[১২]

তাই রাজস্থানের সংকট হয়তো উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত এবং সেজন্যে চাপ বাড়ছিল। বাংলাদেশে হয়তো রাজস্ব ব্যবস্থার কাঠামোয় পরিবর্তন ও নতুন ধরনের নিয়ন্ত্রণ ওই ধরনের চাপ বাড়াচ্ছিল। ফল খানিকটা এক হলেও প্রক্রিয়া আলাদা। যেমন, মহারাষ্ট্রে বা রাজস্থানে বেগারের জন্যে বেশি চাপ দিত রাষ্ট্র —যেখানে বাংলাতে জমিদারদের চাপই তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল।

খ॥ এই ক্রমবর্ধমান চাপের সৃষ্টি হওয়া এবং ভারসাম্য বজায় না থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে, মুঘল কৃষি-অর্থনীতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যেসব দ্বন্দ্ব ছিল, তা ক্রমশ বৈরিতামূলক দ্বন্দ্বের রূপ নিল। এই সময়কে তাই বলা হয় মুঘল রাষ্ট্র-ব্যবস্থার 'সংকট'। এই সংকটের ছবি দুইভাবে দেখা হয়েছে। এই সংকটের চিত্রায়ণ করা হয়েছে রাজনৈতিকভাবে[১৩] এবং সাধারণত ৩টি ভাগ দেখানো হয়েছে: ক. মুঘলযুগের শেষ 'মহান' সম্রাটের অনুদার ধর্মনীতি হিন্দু-বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করল; খ. এই আগুন নেভাবার জন্যে ক্রমাগত যুদ্ধ হলো এবং তার ফলে অর্থনৈতিক সমস্যারও সৃষ্টি হলো; গ. কিন্তু এই অর্থনৈতিক সমস্যা ও রাজনৈতিক সমস্যার কোনো সমাধান হলো না, কারণ উচ্চপদস্থ মুঘল মনসবদারদের চারিত্রিক অবনতি দেখা যায়; তারা ক্রমশ স্বার্থপর ও ক্ষমতালিপ্সু হয়েছিল এবং তাদের কর্মদক্ষতা হ্রাস পেয়েছিল। এই তত্ত্বে আলোচিত রাজনৈতিক উপাদানগুলোর গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও

বলা যায় যে, ঐতিহাসিক প্রশ্নের জিজ্ঞাসা এই ব্যাখ্যায় তৃপ্ত হয় না, কিংবা বহু ঐতিহাসিক তথ্য এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যায়।[১৪]

এই জন্যে মুঘলযুগের 'সংকটের' ব্যাখ্যা আজকাল সামাজিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়।[১৫] এই বিশ্লেষণ মূলত কৃষি-অর্থনীতিতে সামাজিক শ্রেণী-সংঘাতের কাহিনী। এখানে আমরা 'সংকট' অর্থে মোটামুটি-ভাবে লেনিন-নির্দিষ্ট লক্ষণগুলির কথা চিন্তা করতে পারি।[১৬] যেমন; ক. শোষকশ্রেণী নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্লিষ্ট হবে এবং পুরনো কায়দায় শাসন করতে পারবে না; খ. শোষিতশ্রেণী আরো শোষিত হবে এবং শোষণ সম্পর্কে সচেতন হবে; গ. একটি সংগঠন বা নেতৃত্ব থাকবে শোষিতশ্রেণীর পুঞ্জীভূত ক্রোধকে বাস্তবায়িত করার জন্যে। এই তিনটি লক্ষণের কথা মনে রেখে আমরা মুঘলযুগের কৃষি-অর্থনীতিতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা বিশ্লেষণ করব।

আগেই বলা হয়েছে যে, কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত সামাজিক সম্পদই শোষকশ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত ছিল এবং সেখানে সম্পদের সিংহভাগ শোষকশ্রেণীর অতি নগণ্য অংশেরই আয়ত্তে ছিল। ফলে, শোষকশ্রেণীর মধ্যে সৌভাগ্যবান কয়েক-জনের বিরুদ্ধে তুলনামূলকভাবে বঞ্চিতদের ক্ষোভের অবকাশ ছিল। কিন্তু দিনে দিনে শোষকশ্রেণীর মধ্যে বাদ-বিসংবাদ কতকগুলি কারণে চরম অবস্থায় পৌছল। সমকালীন ভাষায় তার প্রথম ও প্রধান কারণ হচ্ছে জায়গিরের অভাব। মনসব অনুযায়ী প্রাপ্ত জায়গিরের মাধ্যমে মুঘল শাসকশ্রেণীর সদস্যরা উদ্বৃত্ত সম্পদের অংশ পেত। কিন্তু প্রায়ই দেখা যেত যে, নির্দিষ্ট জায়গির থেকে নির্ধারিত রাজস্ব (জমা) আদায় (হাসিল) হচ্ছে না। এই সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হলো মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে। স্থানীয় বহু শক্তিকে শোষকশ্রেণীর মধ্যে আনতে হলো। কারণ, সাম্রাজ্য বিস্তারের অর্থ সেখানে শোষণের কাঠামোকে বজায় রাখা এবং সেটা করার পদ্ধতি হলো স্থানীয় শক্তি-গুলির একাংশকে মনসবের মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সমঝোতায় আনা। দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তিকে দমনের জন্যে আওরঙ্গজেব ব্যাপক হারে দাক্ষিণাত্যের মারাঠা সর্দারদের 'মনসব' ঘুষ দিয়ে নিজের পক্ষে আনার চেষ্টা করেন। ফলে, তাঁর রাজত্বের শেষদিকে মুঘল মনসবদারদের সংখ্যা প্রচণ্ড বৃদ্ধি পায়। আকবরের সময় একহাজারি ও তার উপরের মনসবদারদের সংখ্যা ছিল মোট ১৩৩। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ ২৯ বছরে নানা কারণে এই সংখ্যা বেড়ে যায় ৫৭৬-এ। কিন্তু এই মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি। অনবরত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে দাক্ষিণাত্যে উৎপাদন বরং হ্রাস পেয়েছে। এর জন্যে শাসনব্যবস্থা এক অসহনীয় অবস্থায় সম্মুখীন হয়। মনসবদারদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জায়গিরের জন্যে দাবিদারের সংখ্যাও বেড়ে যায়। ফলে, খাতাকলমে বহু জায়গিরের আয় বাড়িয়ে এই

দাবি মেটাতে হতো। আগে যে জায়গির একজন মনসবদারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, তা এখন একাধিক মনসবদারকে দেওয়া হতে লাগল। কিন্তু এর ফলে জমা ও হাসিলের পার্থক্য বেড়ে যেতে লাগল। অনেক সময় বহু মনসবদার খাতাকলমে 'মনসব' পেলেও আসলে কোনো পরিবর্ত জায়গির পেত না। আওরঙ্গজেবের কাছে লেখা একটি চিঠিতে জানা যায় যে, ১৫ মাস বাদেও জলন্ধরের ফৌজদার হামিদউদ্দিন খান তাঁর মনসব অনুযায়ী জায়গির পাননি। প্রদত্ত জায়গিরে নিম্নতম কর্মচারিদের অসততা ও অদক্ষতা এবং ইজারাদারদের সঙ্গে তাদের বোঝাপড়ার ফলে জায়গির থেকে কোনো আয় হয়নি।[১৭] খাফি খান লিখেছিলেন, খাতাকলমে পাওয়া মনসবের উপযুক্ত জায়গির পেতে পেতে একজন বাচ্চা বুড়ো হয়ে যায়।

কৃষিভিত্তিক উৎপাদনের স্থিতাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শাসকগোষ্ঠীর এই বিশাল সম্প্রসারণ, উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষকদের ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করল এবং শান্ত ও সমৃদ্ধ অঞ্চলে জায়গির পাবার চেষ্টায় মুঘল আমিররা বারবার নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে থাকেন।[১৮] এই সংকটের পুনঃপুনঃ উল্লেখ পাওয়া যায় সমসাময়িক দলিলে। মামুরির ভাষায় "পৃথিবী জায়গির শূন্য এবং কোনো 'পায়বাকি' অবশিষ্ট নেই।" আওরঙ্গজেব নিজে খেদোক্তি করেন —"ইয়েক আনার সদ বিমার" (একটি বেদানা ও একশত অসুস্থ লোক)।[১৯] ইনায়েৎউল্লা লেখেন—"সম্রাটের সম্মুখে পদস্থ লোকেদের দলের প্রাত্যহিক মিছিল (মিস্‌ল) অফুরন্ত, কিন্তু জায়গিরের জন্যে নির্দিষ্ট ভূমি সীমিত। কিন্তু কি করে এই অফুরন্ত দাবিকে সীমিত সংখ্যার সঙ্গে মেলানো যায়?[২০] বে-জায়গিরির জন্যে দাক্ষিণাত্যে মনসবদারদের শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করেছেন ভীমসেন: "বেশিরভাগ প্রধান ওমরাহ তাদের মাইনের পরিবর্তে দাক্ষিণাত্যে জায়গির পেত। জায়গিরে গোলমালের জন্যে তাদের কর্মচারিরা, যারা চরম দরিদ্র ছিল, তারা ঘুষ নিতে আরম্ভ করল।"[২১]

"রায়তরা চাষবাষ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। জায়গিরদাররা এক কানাকড়িও পায় না। অনেক মনসবদার দারিদ্র্য ও শক্তিহীনতার জন্যে মারাঠাদের দলে যোগ দিয়েছে।···মনসবদাররা চরম দুঃস্থ অবস্থায় পড়েছে। কি করে তারা ফৌজ রাখবে?[২২] দিনের পর দিন এই সংকট বাড়তে থাকে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগে পাঁচ হাজার ও তদূর্ধ্ব মনসবদারের সংখ্যা ছিল ৭৯ জন। মহম্মদ শাহের রাজত্বের সময় ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৫ জনে। জায়গির দেবার জায়গা সমান অনুপাতে কমতে থাকে। গুজরাট ও মালবের বিশাল অংশ মারাঠাদের কুক্ষিগত হয়। আগ্রা ও বুন্দেলখণ্ডেও অনেক জায়গা হাতছাড়া হয়ে যায়। মিরাৎ-উল-হকাইক্‌কে বলা হয়েছে—"মনসব, খিলাৎ··দৌলা, জঙ্গ, বাহাদুর, মালিক ইত্যাদি উপাধি তাদের তাৎপর্য ও মূল্য ফাররুখসিয়ার ও

মহম্মদ শাহের রাজত্বে হারিয়েছে…বখশীর কার্যালয় একজন মুৎসুদ্দি ১০০ জাঠের মনসবের জন্যে ১০০ টাকা নেয় ও বিশ/ত্রিশ টাকাতেই একটি উপাধি দিয়ে দেয়।"[২৩]

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সৌদা উর্দু ব্যঙ্গ-কবিতায় এই অভিজাত শ্রেণীর দুরবস্থার কথা লিখেছেন। তাঁর ভাষায়—

"রাজকোষ শূন্য। খালিসা থেকে এক পয়সাও আয় হয় না। দিওয়ান-ই-তনের অবস্থা অবর্ণনীয়। জায়গির দেবার সনদগুলো পুরনো ছেঁড়া কাগজ ছাড়া আর কিছু নয়। ওষুধের দোকানদার সেগুলো ছিঁড়ে ওষুধের মোড়ক তৈরি করে। পূর্বেকার জায়গিরদার ও কর্মচারিরা গ্রামের পাহারাদারের কাজ অন্বেষণ করছে। তারা তাদের তরবারি ও ঢাল বন্ধকি দোকানে জমা দিয়েছে। এরপরে ভিখারির লাঠি ও পাত্র নিয়ে তারা বেরোবে। এক কালের অভিজাতদের বর্তমান অবস্থা অবর্ণনীয়। তাদের পোশাকের আলমারি ছেঁড়া কাঁথায় ভর্তি। তাদের উনুনে পোড়া গোরুর জিভগুলো কথা বলতে পারলে এই কথাই বলত "তিনবেলা অভুক্ত থেকে এবং তার পোশাক নামমাত্র দামে বিক্রি করে আমার প্রভু আমাকে কিনেছে।"

সমসাময়িক কবি মীর বর্ণনা করেছেন যে, আজম খানের পরিবার অন্যের বদান্যতার ওপর নির্ভর করত এবং প্রায়ই অনাহারে দিন অতিবাহিত করত। কোলাপুরের রাজা শম্ভাজি জানাচ্ছেন যে, হায়দ্রাবাদের বংশানুক্রমিক কানুনগো পরিবারের আয় ছিল বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা। তারা অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দেউলিয়া হয়ে যায় এবং মহাজনদের অভিযোগক্রমে তাদের বন্দী করা হয়েছে।[২৪]

তবে এই দুঃস্থ অবস্থার মর্মন্তুদ বর্ণনা আমরা খাফি খানের রচনায় পাই। খানে জাদ বা পুরনো অভিজাতদের প্রতি সওয়াল করতে গিয়ে তিনি মনসবদারদের দুর্গতি মর্মান্তিকভাবে লিখেছেন। তাঁর ভাষায়—

"অসহায় (বেচারা) জায়গিরদার ও মনসবদারদের নাম আছে কিন্তু সম্মান নেই। একশ জনের মধ্যে দুয়েক জন (আজ সদ নফর ইয়েক দু সাহেব) ভাগ্যক্রমে তাদের মনসব ও জায়গির থেকে এক টুকরো রুটি (পরচিয়ে নান) পায়। বাকিরা দারিদ্র্য, অনাহার, ভিক্ষা ও অপমানের (বফুকরে ওয়া ফকে ওয়া গেদাদি ওয়া খফত) মধ্যে দিন যাপন করে। এক দু-বছরের জন্যে মনসবদারদের বেতন বাকি পড়ে থাকে। যদি ধরাও যায়, তাদের অনাহার ও দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জীবনের প্রকৃত অবস্থা জেনে কোনো রাজা তাদের দুই-তিন মাসের মাইনে দিতে চান বা কোনো ন্যায়পরায়ণ বা ঈশ্বরভীরু (খোদাতরস ওয়া হকপরস্ত) উজির নিজেকে সেই কাজে নিযুক্ত করেন তথাপি সঞ্চিত অর্থের অভাবে, রাজস্ব না পাবার জন্যে (সরনজামে ন ইয়াফতনে) এবং মনসবদারদের অত্যধিক

সংখ্যাহেতু একথা মনে করা বাতুলতা মাত্র যে, মনসবদার উপাধি ভূষিত ভগ্নহৃদয় পেশাদার ভিখারিদের বহু বৎসর লালিত স্বপ্ন চরিতার্থ হবে।"[২৫]

শাসকশ্রেণীর এই সংকটকালীন অবস্থায় তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ইরানি, তুরানি ও হিন্দুস্থানিদের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। যাঁদের মনোনীত সম্রাট দিল্লির মসনদে বসতেন, তাঁদের সমর্থকরাই ভালো ভালো অঞ্চলে জায়গির পেতেন। খাফি খান লিখছেন: "এই সময় পায়বাকির অভাবহেতু এবং অগণ্য দক্ষিণী ও মারাঠাদের উচ্চ মনসব পাবার জন্যে 'খানে জাদান' (অভিজাত মনসবদাররা) আখছার চার ও পাঁচ বছর কোনো জায়গির পেত না।"[২৬]

শাকির খান লিখেছেন—"প্রধান আমিররা তাদের মনসবের জাঠ ও সওয়ার অনুযায়ী ১২ মাসের জায়গিরই পেতেন, যেখানে অন্যরা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের জায়গির পেত।" ইবাদৎ খান জুলফিকার খান সম্পর্কে লিখেছেন—"তিনি নিজের জন্যে প্রচুর অর্থ ও রাজস্ব রাখতেন, কিন্তু অন্যদের মধ্যে অর্থ এত কম বণ্টন করতেন যে, তাঁর নিজের অনুচররাই অত্যন্ত গরিব ছিল এবং শূন্যগর্ভ উপাধি পেত, কারণ তিনি কাউকে জায়গির দিতেন না।" নিজাম-উল-মুল্কের ১৭১৫-১৮ সনে বাৰ্ষিক মোট আয় ছিল ৩ কোটি টাকা। তাঁর জায়গির আগ্রা ও দিল্লি অঞ্চলেই ছিল। সেখান থেকে নিয়মিত অর্থ হাসিল হতো এবং প্রধান আমিরদের জায়গির ঐ সময় বদলি করা হতো না। অন্যদিকে গুলাম হোসেন খানের মতো জৌনপুরের নগণ্য জায়গিরদার আবার চরম দারিদ্র্যে পতিত হন, কেননা তাঁকে কেউ রাজস্ব দেয় না। অযোধ্যার সুবাদার সাদৎ খান সুযোগ পেলেই ছোট ছোট জায়গিরদারদের জায়গির নিজে দখল করতেন।[২৭] আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে অন্তহীন লড়াই উদ্বৃত্ত সম্পদের জন্যে শাসকশ্রেণীর নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিফলন মাত্র। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটি বিষ-চক্রের রূপ নিয়েছিল। কারণ, অবিরত যুদ্ধ মানেই উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়া। যুদ্ধের ব্যাপকতা প্রসঙ্গে ভীমসেন বলেছেন—"তাঁবুতে নতুন বংশধরদের জন্ম হলো···যৌবন থেকে তারা বার্ধক্যে উপনীত হলো, তবুও কেউ এ জীবনে তাঁবুর ছায়া ছাড়া অন্য কোথাও বসবাস করেনি।"[২৮] আবার উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়া মানে জায়গিরের সংকট ঘনীভূত হওয়া এবং জায়গিরের সংকট ঘনীভূত হওয়া মানে মনসবদারদের মধ্যে আবার দ্বন্দ্ব শুরু হওয়া, এবং এই দ্বন্দ্বে নিজেদের দল ভারি করার জন্যে অনেক বেশি করে স্থানীয় শক্তিগুলোকে 'মনসবের' প্রতিশ্রুতি দিয়ে বে-জায়গিরের সংখ্যা বাড়ানো।[২৯]

এই বিষচক্র থেকে বেরোবার একমাত্র উপায় ছিল উৎপাদিকা শক্তিগুলিতে বিশেষ পরিবর্তন এনে কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত সম্পদের পরিমাণ বাড়ানো। সেরকম সমাধান মুঘল সামন্ত সমাজের আওতার বাইরে ছিল। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ইনায়েৎ উল্লা বে-জায়গিরির প্রশ্ন তুললে আওরঙজেব

গোটা সমস্যার সমাধান ঈশ্বরের দয়ার ওপরে ছেড়ে দেন। তাঁকে সাতারা দুর্গজয়ের পর আর্শাদ খানের আর্জি অনুযায়ী তখনি পাঁচ বা সাত হাজার জায়গিরের জন্যে বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল।[৩০]

গ ॥ মুঘল শাসকশ্রেণীর এই সংকট শোষিত শ্রেণীকে আঘাত করবেই। কারণ, উদ্বৃত্ত সম্পদের সিংহভাগ পাবার জন্যে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৃষকদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং এই চাপের ফলে কৃষকরা তাদের ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ছিল। এর রূপ হলো প্রধানত দুটি। প্রথমত— জায়গিরদারি ব্যবস্থার একটি মূল লক্ষণ ছিল জায়গির স্থানান্তর করা। আগেই বলা হয়েছে যে, জমা ও হাসিলের প্রভেদ কমাবার উদ্দেশ্যে চালু করা 'মাহওয়ারা' পদ্ধতির জন্যে শাহজাহানের আমল থেকেই বদলির হার বাড়তে লাগল। ফলে, কোনো জায়গিরদারই নিজের অঞ্চলের কৃষিকাজ সম্পর্কে খুব আগ্রহী ছিল না। কোনো রকমে 'জমা'র সঙ্গে তাল রেখে 'হাসিল' জোগাড় করলেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো। কৃষকদের ওপর চাপ সৃষ্টি হলে তার কোনো কিছু এসে যেত না, বরং তার ধাক্কা সামলাতে হতো পরবর্তী জায়গিরদারদের। মনসবদারি ব্যবস্থায় সংকটের সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেদের জায়গিরে স্বভাবতই নানা চাপ সৃষ্টি করে রাজস্ব আদায় শুরু করেছিল। বার্নিয়ের এই মনোভাব বর্ণনা করেছেন এই বলে যে "তারা মনে করত আবাদের অবহেলিত অবস্থা আমাদের মনে কেন অস্বস্তি আনবে? কেন আমরা এই জমিকে ফলপ্রসূ করার জন্যে অর্থ ও সময় ব্যয় করব? জমি থেকে যত খুশি অর্থ আহরণ করা যাক— তাতে কৃষক অনশনে মরুক বা পালিয়ে যাক। এই জায়গা ত্যাগ করার আদেশের সময় আমরা একটা জঙ্গল ছেড়ে যাবো।"[৩১] ফরাসি পর্যটকের কথার সমর্থন পাওয়া যায় স্বদেশী ইতিহাসবিদের রচনায়। "জায়গিরদারের অনুচরেরা কৃষকদের রক্ষা করার ধারণা পরিত্যাগ করেছে। কারণ পরের বছর যে জায়গিরদারের কাছে জায়গির থাকবে তার কোনো আশা নেই। যখন জায়গিরদার কোনো আমিনকে পাঠায়, সে প্রথমেই ঋণস্বরূপ কিছু আগাম নিয়ে নেয়। পাছে আর কোনো আমিন ইতিমধ্যে জায়গিরদারকে আরো বেশি ঋণ দিয়ে হাজির হয়, এই ভয়ে (প্রথম) আমিন অত্যাচারের সঙ্গে রাজস্ব সংগ্রহ করতে পরাঙ্মুখ হয় না।"[৩২]

১৬৩৪ সনে রচিত ইউসুফ মিরাক মজহর-ই-শাহজাহানিতে সিন্ধু প্রদেশের অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায়— "শেওয়ানের নিপীড়িতরা একই অবস্থায় আছে। (জায়গিরদার) আহমেদ বেগ খান এবং তাঁর স্বৈরাচারী ভাই যেখানে সম্পদ ও বিলাসের মধ্যে ডুবে আছে।...যদি জায়গিরদার অন্যায়ভাবে ১০০ লোককে হত্যা বা লুণ্ঠন করে, তবে তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। যদি কোনো গরিব লোক অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করে সুদূর রাজদরবারে যায় ও

একটা ফরমান আনে, সেই নির্দেশ এখানে শোনাও হয় না, মানাও হয় না। পক্ষান্তরে, সে জায়গিরদারের সংবাদদাতাদের কাছে শত্রু বলে পরিগণিত হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই জায়গিরদারের হাতে তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। ··· এবং রক্ষা-কর রক্ষা-কর, এই আর্তনাদের মধ্যে আসন্ন সর্বাত্মক ধ্বংসের রোল শোনা যায়।"[৩৩]

মুরাকাৎ-ই-হাসানে উড়িষ্যার দেওয়ান হাসিমের অত্যাচারের বর্ণনা আছে। তার বিবরণ অনেকটা এইরকম :

"খালিসার মহালগুলি ধ্বংস হয়েছে এবং কঠোর জমাবন্দী, রাজস্বের অত্যধিক হার ও অমনোযোগিতার জন্যে শাসনব্যবস্থা বিশৃংখল হয়ে পড়েছে। ··· তার কঠোর আদায়ে গ্রামগুলো ধ্বংস হয়েছে। সে এইভাবে তার কাজ করে। যখন ক্রোরির জন্যে কোনো প্রার্থী আসত, হাসিম কাগজে-কলমে পরগনার নির্ধারিত জমা তাকে দাখিল করতে বলত। ··· কিছুদিন বাদে আরেকজন লোক ক্রোরির জন্যে আবেদনপ্রার্থী হলেই হাসিম তার কাছ থেকে উৎকোচ নিত, পুরনো ক্রোরিকে বরখাস্ত করত, দ্বিতীয় লোককে প্রথম ক্রোরির ধার্য জমার চেয়ে বেশি রাজস্ব আদায়ের প্রতিশ্রুতিতে নিযুক্ত করত। কিন্তু পরে তৃতীয় একজন লোক বেশি রাজস্ব আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিলে উৎকোচের বিনিময়ে ও আরো বেশি কর আদায়ের মুচলেকা নিয়ে তাকে পরগনায় ক্রোরি করে পাঠানো হতো। নিরূপিত রাজস্ব (জমা) সম্পর্কে খান কখনোই জমিদার মুকদ্দম বা রায়তদের জানাতেন না। এইভাবে কোথাও রাজস্ব দ্বিগুণ বা কোথাও তিনগুণ বাড়িয়ে দিলেন। রাজস্ব দিতে অপারগ রায়ত পালিয়ে গেল। গ্রামগুলি হয়ে গেল জঙ্গল। ··· যখন মহম্মদ হাসিম সশরীরে বন্দোবস্ত করতে এলেন, তার অত্যাচারে ও কঠোর আদায়ে মৃতপ্রায় রায়তরা খবর শুনেই পালিয়ে গেল। চাহিদা মেটাতে না পেরে তাদের মধ্যে কেউ কেউ মার খেয়েই পঞ্চত্ব লাভ করল। অন্যেরা কারাগারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। আমার পক্ষে রায়তদের অভিযোগ বলা অসম্ভব। স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় করে তারা কোনোক্রমে দেহধারণ করে আছে।"[৩৪]

শস্যের দামের হেরফেরের সুযোগ নিয়েও জায়গিরদার অত্যধিক মুনাফা লাভ করত। আওরঙ্গজেবের আমলে গুজরাটের একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে : "শস্যের দাম চার বা পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেলে জমা প্রত্যেক জায়গায় উচ্চতম হারে ধার্য করা হলো। (সে ওয়া চহরম সবাবে গেরানি গল্লে জমা হর জা বে কামাল রসিদ।) তারপরে শস্যের দাম শস্তা হয়ে গেলে জায়গিরদাররা ও কর্মচারিরা ঐ আগের জমার পরিপ্রেক্ষিতেই জোর করে জমাবন্দী ধার্য করল। (বর নজরে হমান জমা দাশথে জমাবন্দী জবরান মিকুনান্দ) উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ রাজস্ব হিসেবে নেবার জন্যে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ধার্য করা হলো ২৫০ মণ। প্রকৃত উৎপন্ন

শস্যের পরিমাণ ১০০ মণ। এক বছরে তারা কৃষকের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। তার সব সম্পদ আত্মসাৎ করা হলো এবং মারের ভয়ে সে চাষ করতে বাধ্য হলো।"৩৫

এর সঙ্গে তুলনীয় মানুচ্চির বর্ণনা। "আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে রাজকর্মচারিরা আরো খারাপ হলো। ধনী হবার আশায় তারা লুঠ করতে ও অত্যাচার করতে শুরু করল। খুফিয়ানবিশ ও ওয়াকিয়ানবিশদের (গুপ্তসংবাদ সংগ্রাহক) তারা ঘুষ দিতে শুরু করল যাতে করে রাজার কানে সংবাদ না পৌছায়। এইভাবে লোকেরা কষ্ট পেতে লাগল এবং দরবারের কাছ থেকে যারা যতদূরে থাকত, তারা তত কষ্ট পেল। ... (ক্রমাগত যুদ্ধের চাপে) সৈন্যরা যখন যেত তখন তারা গোরু, খাবার, খড় ইত্যাদি যা হাতের কাছে পেত তাই লুঠ করত। জ্বালানি কাঠ পাবার জন্যে তারা বাড়িগুলো ভাঙতো। গ্রামের লোকদের মাথায় তারা মালের বোঝা চাপাত ও আঘাত দিয়ে তাদের বইতে বাধ্য করত।"৩৬

দাক্ষিণাত্যে মুঘল সৈন্যের সামরিক অভিযানের চরিত্র খাফি খান এইভাবে বর্ণনা করেছেন : "আবাদি জমি ও শস্যময় ক্ষেত্রকে তারা চোখের নিমেষে ধ্বংস করেছে এবং ঘোড়ার খুরে জমি সমান করে দিয়েছে। বাড়ি, শহর ও জমজমাট বাজার এমনভাবে ধ্বংস করা হয়েছে যে সেখানে শস্য রোওয়া যায়। স্ত্রী-পুরুষ যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কৃষকদের বন্দী করা হয়েছে ও হত্যা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বিজাপুরে সমৃদ্ধ মহালগুলির চেহারা (মহালে আবাদ তালুকে বিজাপুর রা বেসুরৎ) এতদূর বদলে গেছে যে, তাদের আর কোনো নাম নেই। ··· এই অঞ্চলে কৃষির অবশিষ্ট মাত্র নেই এবং বাদশার শাসিত অঞ্চলে গোরু বা তার খাদ্যকণার সন্ধানমাত্র পাওয়া যায় না।"

আরেক জায়গায় খাফি খান অভিযোগ করেছেন যে, সাধারণ লোকের গোপনাঙ্গের আবরণটুকুও সৈন্যরা হরণ করে। তাঁর উপমায় দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ মুঘল রাজকর্মচারিদের কাছে লুঠের ভোজসভা মাত্র। সুতরাং জায়গির বদল করার সঙ্গে সঙ্গে মনসবদারি ব্যবস্থায় সংকট বৃদ্ধি পেল। ফলে জায়গিরদাররা নিজেরাই কৃষকের কাছ থেকে অত্যধিক হারে রাজস্ব আদায় করতে শুরু করলো এবং কৃষকদের ওপর চাপ দিনের পর দিন নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পেল।

শাহজাহানের সময় থেকেই সংকট তীব্রতর হচ্ছিল। 'মাহওয়াত্তির সংকট সমাধানের চেষ্টা মাত্র।' গেজিনসেন গুজরাট প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"আগে রাজস্ব কিছু বেশি ছিল। কিন্তু যাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় হতো সেসব কৃষকরা পূর্বাপেক্ষা বেশি নির্যাতিত হয়। তারা প্রায়ই পালিয়ে যায় এবং আগের মতো কর দেয় না। ফলে বহু জমি অকর্ষিত পড়ে আছে, রাজস্ব আদায়ও কমে গেছে ও আগের মতো জমিগুলো ফলপ্রসূ নয়।" শাহজাহানের

সমসাময়িক ঐতিহাসিক সাদিক খান লিখেছেন যে, মুঘল আমলের আওতায় আসার আগে দৌলতাবাদের সন্নিকটস্থ বাসলানায় অন্যান্য আয় বাদেই রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল বাৎসরিক ৫০ লাখ টাকা। কিন্তু আমলাদের অত্যাচারে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শাহজাহানের রাজত্বে সব ধরনের আবওয়াব সমেত রাজস্বের পরিমাণ হলো ১০ লক্ষ টাকা। ৩২টি পরগনার মধ্যে ২৯টি পরগনাতেই কৃষির অবনতি ঘটে।"[৩৭]

মনসবদারি ব্যবস্থায় সংকটের অন্য রূপ হলো ইজারাদারি ব্যবস্থার প্রচলন।[৩৮] যেহেতু জায়গিরদারদের পক্ষে জায়গির থেকে অর্থ আদায় করা প্রতিদিনই কষ্টকর হয়ে উঠেছিল, তাই তারা বার্ষিক একটি নির্দিষ্ট আয়ের পরিবর্তে জমি থেকে রাজস্ব আদায়ের ভার আরেক দলের হাতে ছেড়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছিল। এই ইজারাদারেরা ছিল নানা ধরনের লোক। শহরের ব্যবসায়ী, মহাজন, শক্তিশালী জমিদার থেকে একটি গ্রামের অধিবাসীরা সামগ্রিকভাবে অন্য গ্রামের ইজারাদার হতো। ইজারাদারি বন্দোবস্তের নানা রকমফের ছিল। প্রধানত তাকেই ইজারা দেওয়া হতো যে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিতে পারত এবং জায়গিরদারকে প্রথমে এককালীন 'থোক' নগদ টাকা দিতে পারত। এই কৃত্রিম প্রতিযোগিতার ফলে 'জমা'র প্রকৃত হার অনেক বেড়ে গেল এবং ইজারাদারেরা তাদের আসল ফিরে পাওয়া ও লাভ করার জন্যে কৃষকদের কাছ থেকে যথেচ্ছ হারে রাজস্ব দাবি করতে লাগল। ফলে, এদিক থেকেও কৃষকদের রাজস্ব দেবার ক্ষমতা এবং ইজারাদারদের দাবি, এই দুটোর মধ্যে কোনো সমতা থাকল না। ফাররুখসিয়ারের রাজত্বকালে যখন 'খালিসা' ভূমিও ইজারাদারদের হাতে সমর্পণ করা হলো তখনি বোঝা গেল যে, এতদিনের মুঘল ব্যবস্থায় প্রচলিত শোষণযন্ত্রের ভারসাম্য চিরতরে বিনষ্ট হয়েছে। খাফি খাঁর বিখ্যাত উক্তির মধ্যে এই ইজারাদারি ব্যবস্থার কুফল ও কৃষকদের ওপর ক্রমবর্ধমান শোষণের কথা বলা হয়েছে। —

"এখন কৃষকদের রক্ষণাবেক্ষণ, রাজ্যকে বসতিপূর্ণ ও রাজস্ববৃদ্ধি করার চিন্তা এদের মধ্য থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে এবং ইজারাদারের লোকেরা দরবারে প্রচুর টাকা দিয়ে মহালে যায় এবং মালগুজারি রায়তদের কাছে··· চাবুক হিসেবে রূপান্তরিত হয়।··· যেহেতু তারা সুনিশ্চিত নয় যে পরের বছরে, এমনকি এই বছরের পুরোটাই (সালে দিগরবল্‌কে তামাম সাল) তারা ইজারা পাবে, তাই তারা রাজস্বের দুটো অংশই নিয়ে বিক্রি করে দিত·· প্রত্যহ কৃষকরা রাজস্ব আদায়কারীদের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার জন্যে নির্যাতিত হচ্ছে।··· এটা তাদের ঈশ্বরভক্তি বলতে হবে যদি তারা এই অত্যাচারেই ক্ষান্ত থাকে এবং কৃষির মূল উপাদান গোরু ও গাড়ি বিক্রি করা থেকে বিরত থাকে। অথবা দরবারে খরচার ক্ষতিপূরণের জন্যে, সে বন্দী পাইকদের মাইনে দেবার জন্যে বা

তাদের চুক্তিকে উশুল করার জন্যে তারা কৃষকের ফলন্ত বৃক্ষ এবং ভোগদখলি মৌরুসি স্বত্বযুক্ত ব্যক্তিগত জমি বিক্রয় করতে অনিচ্ছুক হয়। রাজস্বের ক্ষতিকারকদের লুঠ ও বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপের ফলে দেশ ধ্বংস হয় ও কৃষকদের দুর্দশা বৃদ্ধি পায় (ওয়ারানি মুলক ওয়া খারাবি হালে রেইয়া)। এর জন্যে দশ বা বিশ ক্রোশ জুড়ে কৃষিযোগ্য ভূমি অনাবাদি পড়ে থাকে। কাঁটাগাছ পথিকের অঞ্চলপ্রান্ত (দামনগিরে মুসাফিরান) ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে এবং বেচারা জায়গিরদারদের হৃদয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে। অসংখ্য সমৃদ্ধ রাজস্ব প্রদানকারী (সিরে হাসিল) শহর ও পরগনা দুষ্ট আমলাদের অত্যাচারে (আজ তয়াদি হুককাম) ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সেখানে বাঘ ও অন্যান্য হিংস্র পশুরা বাস করে। এত অসংখ্য গ্রাম জনশূন্য ও আলোকশূন্য (বি চেরাগি) যে পথের দুই প্রান্তকে আর বসতিপূর্ণ বলা যায় না। ··· দিনের পর দিন (রুজ বে রুজ) মুলুক উচ্ছন্নে যাচ্ছে, দুষ্ট আমিলের হাতে কৃষকরা নিষ্পেষিত হচ্ছে, তাদের দীর্ঘশ্বাসে জায়গিরদাররা অভিশপ্ত হচ্ছে, তবুও আমলাদের অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা ও অবিচার এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে এর শতাংশের একাংশও বর্ণনার অতীত।"[৩৯]

কিছুকাল পরে 'রিসালা-ই-জিরায়তে' বাংলা দেশে মুসতাজিরদের (ইজারাদারদের) কার্যকলাপ বিশদভাবে বর্ণনা করার পরে স্পষ্ট বলা হয়েছে : "রাজস্ব সংগ্রহের কঠোরতার জন্যে রায়তরা পালাল, পরগনা জনশূন্য হলো এবং জমিদার ধ্বংস হলো।"[৪০]

একটি গ্রামে ইজারাদারের অত্যাচারের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি 'হসবুল হুক্কাম' অনুযায়ী জানা যায় যে, পালওয়াল পরগনার হাসানপুর গ্রামে আঞ্চলিক চৌধুরি মহাজের রাজস্ব সংগ্রহকারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে গ্রাম ইজারা নিয়েছে। সে খরিফ শস্যের সময় ৮০০ টাকা জোর করে আদায় করেছে এবং রবিশস্য বিক্রি করতে দিচ্ছে না। নির্দিষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও সে কৃষকদের কাছ থেকে পাঁচ বছরে ১৩ শত টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছে। এবং যাতে করে তার অত্যাচার ধরা না পড়ে সেজন্যে সে গ্রামের তহশিলের সব কাগজপত্রও বাজেয়াপ্ত করেছে।[৪১]

কৃষকদের ওপর রাজস্ব আদায়ের জন্যে সাধারণ অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন পর্যটক মানুচ্চি। তিনি লিখেছেন—"তাদের গাছের সঙ্গে বাঁধা হতো এবং তাদের ঘুঁষি ও কোড়া মারা হতো। এক ইঞ্চি গভীর ও এক ফ্যাদম লম্বা ষাঁড়ের ল্যাজের মতো পাকানো দড়ির নাম 'কোড়া'। এর সাহায্যে তারা পাঁজরা ও হাতের বিভিন্ন অংশে ও পরে সারা শরীরে সর্বশক্তি দিয়ে মারত। বিভিন্ন জায়গায় প্রায় এক ইঞ্চি গভীর দাগ বসে যেত ও চামড়া ফেটে যেত।"[৪২]

জায়গির বদল ও ইজারাদারি ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে কৃষকদের ওপর অর্থনৈতিক চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের কাছে বাঁচবার পথ ছিল দুটো।

সাধারণত কৃষক-চেতনায়, ব্যাপক অত্যাচার না হলে, প্রতিরোধের ধারণা অস্পষ্টই ছিল। মুকুন্দরামের কাছে "প্রজার পাপের ফলেই" ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচার হয়। ওলন্দাজ কোম্পানির প্রতিনিধির কাছে ভারতীয় কৃষকের সহিষ্ণুতা বিস্ময়কর মনে হয়েছিল।[৪৩] কিন্তু অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করলে নিজেদের বাঁচার তাগিদেই কৃষকদের প্রতিরোধ করতে হতো। প্রতিরোধের প্রথম অবস্থা ছিল চাষবাস ত্যাগ করে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া। এইরকম ব্যাপকভাবে স্থানান্তরে যাওয়া ভারতীয় কৃষকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার প্রাথমিক অস্ত্র। বার্নিয়ের-এর ভাষায় : "এই স্বৈরাচার যা এক কথায় কৃষককে তার ভিটেমাটি ছেড়ে ভালো ব্যবহার পাবার আশায় কোনো সন্নিহিত রাজ্যে পাঠাত।"[৪৪] ষোড়শ শতকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের আত্মজীবনী এর সুন্দর নিদর্শন।

মুকুন্দরাম নিজে সম্পন্ন চাষী ছিলেন ও বংশানুক্রমিক ভোগদখলি স্বত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ভাষায়—

"সহর সেলিমা বাজ তাহাতে সজ্জন রাজ
নিবাস নেউগি গোপীনাথ।
তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি
মিরাস* পুরুষ ছয় সাত॥"

[* বংশানুক্রমিক স্বত্ব]

যখন মামুদ শরীপের অত্যাচার চরমে, তখন প্রজারা পালাবার পথ অনুসন্ধান করল এবং তাতে বাধা দেবার জন্যে পাহারা বসালো। অন্যের সহায়তায় মুকুন্দরাম শেষ পর্যন্ত পালালেন। যেমন—

"জানদার সভার আছে প্রজাগণ পলায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দিল থানা *
... ...
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডিবাটি যার গাঁ
যুক্তি কইল গম্ভির খাঁঞের সনে।
দামিন্যা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রমানাথ ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে॥"[৪৫]

[* পাহারা]

আবার, প্রজারা যখন কালকেতুর কাছে ভাঁড়ুদত্তের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করে, তখনো পালিয়ে যাবার ভয় দেখায়। যেমন—

"মহাবীর রাজ্য কর ভাঁড়ুদত্ত লইয়া
সবে যাইব বিদায় হইয়া।

... ...

ভাড়ু যত পীড়া করে কে তাহা সহিতে পারে,
না জানি পালাইয়া জাব কথি।"[৪৬]

অষ্টাদশ শতকের প্রথমে রচিত ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও মুকুন্দরামের বর্ণনায় সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন—

"অবিচারে ভাঙ্গে রাজ্যে গৌড়ের ভুবন।
পীড়া পেয়ে পাত্রের পলায় প্রজাগণ॥
রাজকর লোকের তেমনি নিল বাড়া।
অতএব সকল প্রজা হল দেশছাড়া॥
সেনের আসান কত আসিছে ময়না।
নীলাচল উৎকল আশ্রয়ে কতজনা॥"[৪৭]

তারিখ-ই-ফিরিস্তাতে ভারতীয় কৃষকদের ব্যাপকভাবে অঞ্চল ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। "ধারণাতীত ভাবেই একটি অঞ্চল হঠাৎ জনশূন্য হয়ে যায়। এর কারণ এখানকার অধিবাসীরা খড়ের ঘর তৈরি করে এবং তাদের গৃহস্থালীর বাসন মাটির, এবং দুটোই তারা বিনা কষ্টে পরিত্যাগ করতে পারে। ফলে, তারা গবাদি পশুসমেত অন্য জায়গায় গিয়ে পূর্ব পরিত্যক্ত গৃহের মতো বাসস্থান করে নেয় এবং মাটির পাত্র সংগ্রহ করে কৃষিকাজে মন দেয়।"

ভারতীয় কৃষকের দ্রুত স্থানত্যাগে বাবরও বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন,—"হিন্দুস্থানে বসতি, শহর ও গ্রাম এক মুহূর্তেই গড়ে ওঠে ও জনশূন্য হয়ে যায়। বহুদিন ধরে বসবাস করা সত্ত্বেও কোনো শহর থেকে লোকে যদি পালায়, তারা এমনভাবে চলে যায় যে একদিন বা দেড় দিনের মধ্যে তার চিহ্নই থাকে না।"[৪৮]

অত্যাচারের মুখে এরকম স্থানত্যাগের অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। উড়িষ্যার দেওয়ান হাসিমের অত্যাচারে কৃষকদের পালাবার নিদর্শন আমরা আগেই দেখেছি।[৪৯] আবার অষ্টাদশ শতকে মহম্মদ শাহের রাজত্বে বিহার থেকে পাওয়া অসংখ্য পরওয়ানায় দেখা যায় যে, অত্যধিক জমার চাপে কৃষকরা গ্রামকে-গ্রাম উজাড় করে অন্যত্র পালিয়ে যাচ্ছে।[৫০]

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অত্যাচারের প্রতিরোধ সম্পর্কে গ্রামবাসীদের যৌথ প্রচেষ্টার আভাস পাওয়া যায়। সাহিত্য থেকেই প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দেওয়া যাক। কলিঙ্গ থেকে গুজরাটে গ্রামবাসীরা গ্রামপ্রধানের নেতৃত্বে যৌথভাবে স্থানান্তরে গমন করেছিল। যেমন—

"সব প্রজাগণ মিলি করয়ে বিচার।
কলিঙ্গ রাজার ঠাঞি না পাব নিস্তার॥

বুলান মণ্ডল সনে জত প্রজাগণ।
বিরলে বসিয়া সভে করে নিবেদন॥
এদেশে শত নাঞি চাস নদীকূলে।
হাজির সকল শস্য বরিবার কালে॥
মসাত * করিল রাজা দিয়া খড় দড়ি।
প্রথম আঘনে চাহি তিন তেহাই কড়ি॥
তেশনি+ ইনাম× ঘর গুজরাটপুর।
তোমার সকল প্রজা তুমি যে ঠাকুর॥
কলিঙ্গ তেজিয়া সভে করিলা প্রয়াণ।
বুলান মণ্ডল চলে হইয়া প্রধান॥"[৫১]

[* পরিমাপ, + তিন, × পুরস্কার]

সশস্ত্র বিদ্রোহ কৃষকের দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ের অস্ত্র ছিল। "রাইয়তি সরকশ্‌থে"র কথা মুঘল দলিলে বারবার বলা হয়েছে। গুজরাটে মুঘল গ্রামকে দু-ভাগে ভাগ করা হতো—ক. 'রাসতি' বা শান্ত, এবং খ. 'মেওয়াসি' বা বিদ্রোহী। আইন-ই-আকবরীতে বিভিন্ন জায়গার কৃষকের প্রতিবাদী মনোভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৫২] সুতরাং খাজনা না দেওয়া এবং রাজস্ব সংগ্রহকারীদের মেরে তাড়ানো মুঘল ইতিহাসে কিছু নতুন নয়।

মানুচ্চির মতে, রাজস্ব না দেওয়া ভারতীয় কৃষকের একটি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং রাজস্ব না দিয়ে অত্যাচার সহ্য করা তার পক্ষে অনেক কাম্য ছিল। তিনি লিখছেন—"তাড়াতাড়ি রাজস্ব না দেওয়ার অভ্যাস কৃষকদের মধ্যে বিশেষ প্রশংসিত হয়। যে সবচেয়ে বেশি মার খায় ও সহ্য করে তাকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করা হয়। এই জাতীয় ব্যবহার ও অপমান সহ্য করা তাদের মধ্যে সম্মান বিশেষ।" একজন পোর্তুগিজ পর্যটকও বাংলাদেশ প্রসঙ্গে অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়েছেন। "এত অত্যাচার সত্ত্বেও বাংলার জনগণ অর্থ দিতে এতটা অনিচ্ছুক যে সমাজের কিছু লোক মনে করে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তীব্রভাবে প্রহৃত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত রাজস্ব দেওয়া একটা মস্ত অপমান।"[৫৩]

খান-ই-জাহানের জায়গিরের কৃষকরা বিনা প্রতিরোধে এক কপর্দকও রাজস্ব দিত না এবং এজন্যে তাঁর দেওয়ান গদারামকে এলাহাবাদ অঞ্চলে এক বিপুল সৈন্যবাহিনীকে মাইনে দিয়ে পুষতে হতো।[৫৪] বিপুল সৈন্য পোষার বর্ণনাও মানুচ্চি দিয়ে গেছেন। তাঁর ভাষায়—"সাম্রাজ্যের সর্বত্র রাজাকে ফৌজদার বা সৈন্যবাহিনীর অধিকর্তাকে নিয়োগ করতে হতো। কারণ যদি তিনি সেরকম রাজকর্মচারি না রাখেন তবে কেউ তাঁকে নজর বা কর দেবে না... গা-জোয়ারি ছাড়া ভারতীয় জনগণ টাকা দেয় না। টাকা নেই, এই অজুহাতে

ভারতীয় কৃষকরা কর দিতে অস্বীকার করে।"[৫৫]

ফৌজদারের এই ভূমিকার কথা ফারসি চিঠিতে সমর্থিত হয়। একটি আর্জিতে ফৌজদার তার বেতন বৃদ্ধির যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে যে কারণগুলো বাদশাহের কাছে দাখিল করেছিল তার মধ্যে মুখ্যত এই যুক্তি কাজ করেছিল যে, ঐসব পরগনাতে বেশিরভাগ গ্রামই (আকসার দে) বিদ্রোহী ও খাজনা প্রদানে অনিচ্ছুক (মেওয়াস ও জোরতলব) এবং গ্রামগুলিতে কেল্লা আছে। ফলে, রাজস্ব আদায় ও বিদ্রোহী কৃষকদের শায়েস্তার জন্যে ফৌজদারের অনেক বেশি সওয়ার চাই।[৫৬]

আসলে রাজস্বের হার এত উঁচুতে বাঁধা ছিল যে, কৃষকের প্রায় সমস্তই নিয়ে নেওয়া হতো। সেইজন্যে স্বভাবতই রাজস্ব দিতে কৃষকের অনীহা থাকত। চিরকাল মুখ বুঁজে মার খাওয়াও সম্ভব নয়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল থেকে অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল এবং অষ্টাদশ শতকে শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি শাহ ওয়ালিউল্লা লিখলেন—"কৃষক, বণিক ও কারিগরদের ওপর প্রচণ্ড কর চাপানো হচ্ছে এবং অত্যাচার করা হচ্ছে। ফলে যারা ভীরু তারা পালাচ্ছে, আর যারা ক্ষমতাশালী তারা বিদ্রোহ করছে। একমাত্র করভার কমালেই দেশে শান্তি ফিরে পাওয়া যাবে।"[৫৭]

জাঠ, কোলি, মারাঠা ও শিখ বিদ্রোহের প্রধান শক্তি ছিল অত্যাচারিত কৃষক সম্প্রদায়।

৬॥ কিন্তু যে কোনো খণ্ডিত এবং ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ কৃষি-অর্থনীতির মূল সমস্যা হচ্ছে সংগঠিত হওয়া। উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্রগত বিচ্ছিন্নতা কৃষকদের একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে রূপান্তরিত করে না, এবং তার ফলে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্রোহ করে সংগঠিত কেন্দ্রীয় শক্তিকে প্রতিহত করার মতো সংগঠন কৃষকদের পক্ষে গড়ে তোলা শক্ত। মুঘলযুগে অনেক ক্ষেত্রে এই জাতীয় নেতৃত্ব এসেছিল জমিদারদের, বিশেষত প্রাথমিক স্তরের বা মালগুজারি জমিদারদের কাছ থেকে। আমরা দেখেছি, উদ্বৃত্ত সম্পদের ভাগীদার প্রধানত দু'জন—জমিদার ও জায়গিরদার। সম্পদের সিংহভাগ জায়গিরদারের করায়ত্ত হবার ফলে জমিদারের সঙ্গে জায়গিরদারদের শত্রুতামূলক দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকতই। মুঘল দলিলে 'জমিনদারান জোরতলব'-এর প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। জমিদারদের সঙ্গে জায়গিরদারদের সংঘর্ষ মুঘল ইতিহাসে এক নিত্যকার ঘটনা। পর্যটক মানুচ্চির ভাষায়—"সাধারণত মুঘল প্রতিনিধিরা হিন্দুরাজা এবং জমিদারের নিত্য সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত, এবং (তার) কারণ ছিল রাজ্য দখল করা এবং সাধারণত দেয় রাজস্বের চেয়েও অধিক সংগ্রহ করা।" আবার, সাধারণত মুঘল রাজ্যে হিন্দুরাজা এবং জমিদারের বিদ্রোহ অনুক্ষণ চলতেই থাকত।[৫৮] ফারসি উপকরণ থেকে জমিদারদের অবিরত বিদ্রোহের কতকগুলো বিক্ষিপ্ত অথচ নির্দিষ্ট উদাহরণ

দেওয়া যেতে পারে। বায়েসওয়ারার ফৌজদারের চিঠিপত্র এর এক প্রমাণ। দিল্লির অত নিকটবর্তী এলাকাতেও তিনি বারবার "জমিনদারানে জোরতলব কৌমে বায়েস"—অর্থাৎ বায়েস কৌমের বিদ্রোহী জমিদারদের কথা বলেছেন। সাল্দিলা, বিজাপুর মুজাফফরগড় ইত্যাদি অঞ্চলের জমিদারেরা মুঘল সেনা-বাহিনী না পাঠালে বড় একটা রাজস্ব দিত না, বরং অন্য জমিদারদের প্রাধান্যে রাজস্ব লুঠ করত।[৫৯] আমরা যদি মুরাক্কাৎ-ই-হাসান পড়ি তবে দেখব যে, হরিহরপুরের কৃষ্ণভঞ্জ ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুর থেকে ভদ্রক ১০০ মাইল লুণ্ঠন করছেন। খুর্দার রাজা খণ্ডায়েৎ পাইক ও উপজাতিদের জমায়েৎ করে এবং কিছু জমিদারদের সঙ্গে একত্র হয়ে বিদ্রোহ করেছিলেন। হিজলি জমিদাররাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।[৬০] এইসময় জায়গিরদার ও জমিদারদের সঙ্গে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ব্যাপকতা ও গভীরতা প্রচণ্ড বৃদ্ধি পায়। প্রথমত—জায়গিরদাররা এ সময় নিজেদের স্বার্থের জন্যে কঠোরভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করতে থাকেন। এর ফলে জমিদারদের মালিকানার নির্দিষ্ট অংশ কমে যেতে থাকে। দ্বিতীয়ত—ইজারাদারি ব্যবস্থা জমিদারদের প্রচণ্ড আঘাত হানে। কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় জমিদাররা নিজেরা প্রচণ্ড ক্ষতগ্রস্ত হয় এবং তাদের বিভিন্ন অধিকার ও দায়িত্ব ইজারাদাররা আত্মসাৎ করে। দস্তুর-উল-আমল-ই বেকসে জাজনগরে শোভা সিংহের আবেদনে ইজারাদারদের বিরুদ্ধে জমিদারদের ক্ষোভের সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়।[৬১] বহু ইজারাদার জমার কারচুপিতে প্রায়শই সময়মতো রাজস্ব না দেবার অজুহাতে জমিদারদের জমিদারি বাজেয়াপ্ত করে নেয় এবং অযোধ্যায় বহু তালুকদারের উৎপত্তির পেছনে ইজারাদারদের কারচুপি ছিল। ফলে জমিদাররাও সশস্ত্র প্রতিরোধকে একমাত্র উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। বহু দেশি ও বিদেশি সাক্ষ্য জমিদার ও জায়গিরদারদের দ্বন্দ্বকে প্রমাণিত করে। ভীমসেন বুরহানপুরী লিখেছেন—জমিদারেরাও শক্তি সংগ্রহ করে মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দিল এবং অত্যাচারে ঘর মুলুককে ছারখার করল। যখন প্রত্যেক জায়গায় জমিদারদের অবস্থা এরকম তখন জায়গিরদারের কাছে এক কানাকড়ি পৌঁছানো কঠিন হলো"।[৬২] পোর্তুগিজ দলিলেও এই দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সুরাটে অবস্থিত পোর্তুগিজদের দালাল রুস্তমজী ম্যানাকজীকে গোয়া থেকে লেখা একটি চিঠিতে দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান ও পান্দার জায়গিরদার মহম্মদ দিরাজ খানের সঙ্গে স্থানীয় জমিদারদের বিরোধের কথা জানানো হয়। "এইসব দেশাইরা কতকগুলো গ্রামের প্রধান। যদিও তারা সৈন্য রাখত, তবুও তারা কোনোদিন মুঘল রাজার বশ্যতা অস্বীকার করেনি। তারা গ্রামের জরিপ অনুযায়ী দেয় রাজস্ব দিয়ে দিত। এমন হলো যে, দেওয়ান মুঘল সম্রাটের সনদে নির্ধারিত ধার্যের চেয়ে অতিরিক্ত তাদের কাছে দাবি করল, এবং তারা যথার্থভাবেই তার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করল। দেওয়ান

সেই অজুহাতে তাদের জমি বাজেয়াপ্ত করল এবং তাদের কারাগারে বন্দী করল।"[৬৩]

এইসব সাধারণ মন্তব্যগুলি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত দিয়ে সমর্থন করা যায়। তিলপথের মালগুজারি জমিদার গোকুল ও সানসনি ও সন্দরের মালগুজারি জমিদার রাজারাম ও রামচেরা প্রথম পর্যায়ের জাঠ বিদ্রোহের নেতা ছিল। বুন্দেলখণ্ডে গাউরদের বিদ্রোহের পেছনে প্রধান কারণ ছিল—জায়গিরদার অনিরুদ্ধ সিং হাদার অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে ইন্দ্ররাখির মালগুজারি জমিদার পাহাড় সিং গাউরের ক্ষোভ।[৬৪] এর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য জাতে ওঠার মানসিকতাও জড়িত ছিল। গাউরদের চামার বলে তুচ্ছ করা হতো। ছোটখাট রাজপুত জমিদারদের জায়গিরদারের হাত থেকে রক্ষা করার বিনিময়ে পাহাড় সিং রাজপুত পরিবারের জামাই হতে চেয়েছিলেন। ফলে সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে চরিতার্থ হয়েছিল।

আওরঙ্গজেবের সময় জমিদারি বিদ্রোহের ব্যাপকতা বেড়েছিল। দিল্লির সন্নিকটে উর্বর দোয়াব অঞ্চলে বা সুবা এলাহাবাদের দৃষ্টান্ত দিয়েই একথা প্রমাণ করা যায়। ১৬৮৪-১৭০৩ সনের মধ্যে নয়টি এলাকার জমিদাররা অবিরত বিদ্রোহ করে। ফলে, সময়মতো রাজস্ব আদায় হয় না। মাইনে না পাবার দরুন রাজকীয় সৈন্যরাও বিদ্রোহ করে। ঘন ঘন সুবাদার বদল, ফৌজদারদের প্রতি কঠোর নির্দেশ এবং বিদ্রোহীদের এলাকায় অভিযানের জন্যে নকশা আঁকা সত্ত্বেও মুঘল সৈন্য খুব সুবিধা করতে পারেনি।[৬৫]

কৃষক-বিদ্রোহে প্রাথমিক জমিদারদের নেতৃত্ব দেবার কতকগুলো সুবিধা ছিল। প্রথমত—তারা কৃষকদের সঙ্গে সমগোষ্ঠীভুক্ত ছিল। গ্রামগুলো যেহেতু 'জাতি' অনুযায়ী স্থাপিত হয়, কৃষক ও জমিদারের মধ্যে তাই একটা সামাজিক সম্পর্ক ছিল। দ্বিতীয়ত—বহু সময়েই জমিদাররা গ্রামীণ সমাজের সদস্য, যেখানে জায়গিরদারেরা বাইরের লোক। কৃষিকাজে নানারকম সাহায্য করে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে গ্রামের জমিদাররা সহজেই কৃষকদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করত। তৃতীয়ত—প্রত্যেক জমিদারই কিছু-না কিছু সৈন্যের ও মাটির কেল্লার অধিকারী ছিল। অর্থাৎ, মুঘল-শক্তিকে প্রতিরোধ করার প্রাথমিক শক্তি জমিদারদের ছিল। কৃষক ও জমিদারদের মাঝে এ ধরনের বোঝাপড়ার কথা ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন আওরঙ্গজেবের আমলের এক সরকারি ইতিহাসবিদ লিখেছেন—"কৃষকদের মন জয় করবার জন্যে এবং তাদের তুষ্ট করার জন্যে যাতে তারা সময়মতো রাজস্ব দেয় ও কথা শোনে, হিন্দুস্তানের জমিদাররা তাদের জমিদারির মহালের রাজস্ব ধীরে-সুস্থে আদায় করে এবং সাম্রাজ্যের দস্তুর ও কানুন নিজেদের শাসনে প্রয়োগ করে না।"[৬৬]

১৭১৪ সনে লিখিত একটি দস্তুর-ই-আমলে এই অবস্থা আরো সুন্দরভাবে বলা

হয়েছে। "মনসবদাররা কৃষকদের ওপর চাপ দেয় ও কৃষকরা অসহায়।...তখন তারা রায়তি অঞ্চল ছেড়ে পালায় এবং বিদ্রোহী জমিদারদের এলাকা এভাবে জনসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং বিদ্রোহীদের ক্ষমতা প্রত্যেক দিন বাড়ে।"[৬৭]

চ ॥ মুঘলযুগে কৃষিবিদ্রোহ, প্রাথমিক জমিদারদের বিদ্রোহ, জায়গিরদারদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ সাম্রাজ্যের অন্তিম দশার কারণ। কিন্তু এই অন্তিমদশা নতুন কোনো সাম্রাজ্যের সূচনা করেনি। বিত্তহীন কৃষকরা কোথাও তাদের নিজেদের ক্ষমতা দীর্ঘদিন ধরে কায়েম করতে পারেনি। তখন উৎপাদিকা শক্তিগুলিতেও পরিবর্তনের সূচনা হয়নি—যা নতুন সমাজব্যবস্থার জন্ম দিতে পারে। প্রত্যেক জায়গাতেই প্রাথমিক জমিদাররা শক্তি সঞ্চয় করে নিজেদের স্বাধীন করেছে এবং কৃষকদের সমর্থনও পেয়েছে। কিন্তু তারাও মুঘল শাসন-ব্যবস্থার অনুকরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য গঠন করেছে--যেখানে কৃষকের ওপর শোষণের রূপ অবিকৃত ও অব্যাহত ছিল। জাঠদের রাজ্যে, শিবাজীর মারাঠা রাষ্ট্রে বা শিখদের 'মিসলে' একই সামন্ততান্ত্রিক শোষণপদ্ধতি চালু ছিল। চীনদেশের কৃষক-বিদ্রোহের মতো ভারতীয় কৃষক-বিদ্রোহও একই ভাগ্যের শিকার হয়েছিল। সংকট এসেছে, সংকটের প্রতিরোধও করা হয়েছে, কিন্তু নতুন সমাজে উত্তরণ ঐতিহাসিক কারণেই সম্ভব হয়নি। কৃষক-বিদ্রোহের ফলে অধিক সুবিধাভোগী দলকে সরিয়ে আরেকটি সুবিধালোভী গোষ্ঠী বিদ্রোহের নেতৃত্বের সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থকে কায়েম করেছে।

তবে একটা কথা বোধহয় বলা যায়। নিতান্ত সাময়িকভাবে হলেও এই নতুন নতুন সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যে কৃষকদের ওপরে অত্যধিক রাজস্বের চাপটা প্রথম সামন্ত নায়করা সামান্য কিছু হ্রাস করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু এইসব রাজ্যগুলোও শেষ পর্যন্ত পুরনো মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক নিয়মের নিগড়ে বাঁধা ছিল, এখানেও ঠিক একই ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব কৃষকদের অবস্থাকে অল্প কিছুকাল পরেই দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত করে ফেলেছিল। কিন্তু ততদিনে ভারতের ইতিহাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দৃপ্ত পদসঞ্চার শুরু হয়েছে, এবং গোটা ইতিহাসের গতিই আরেক দিকে মোড় নিয়েছে।

৭

মুঘল অর্থনীতির নানাদিক

১. বণিক ॥ কৃষি-অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত। ফলে, কৃষি-অর্থনীতির সমস্যা বোঝার জন্যে অর্থনীতির অন্যান্য কিছু দিক আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এই অধ্যায়ের আলোচনা প্রাসঙ্গিক হলেও সংক্ষিপ্ত। কৃষি-অর্থনীতিকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার উদ্দেশে অন্যকিছু প্রসঙ্গের অবতারণা করা হচ্ছে মাত্র।

মুঘলযুগে ভারতীয় বণিক সম্পর্কে লিখতে গেলেই কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণার সম্মুখীন হতে হয়। জগৎশেঠের কাহিনী ও ইংরেজ কোম্পানির দৌরাত্ম্যে ভারতীয় বণিকদের অবক্ষয় স্কুলপাঠ্য বইয়ে চিরস্থায়ী স্থান লাভ করেছে। সপ্তসাগরের ডিঙা চালিয়ে আমাদের সাহিত্যে ভারতীয় সদাগর দেশ-বিদেশের রত্ন কুড়িয়ে আনত। এই আবহমান ছবির প্রতিরূপ চাঁদ সদাগর ও ধনপতি সদাগর। মঙ্গলকাব্যের আখ্যান পড়ার পর অবশ্য এ প্রশ্ন থেকেই যায় যে, এই সব কাব্যে বাংলা পণ্য সম্ভারের যে তালিকা আমরা পাই, তার সঙ্গে বাংলায় উৎপাদিত দ্রব্যের কোনো সম্পর্কই নেই। আবার ভারতীয় বণিকদের ধর্ম-পরায়ণতা, সঞ্চয়ে নিস্পৃহতা তথা মূলধন ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিদেশিদের কাছে পরাজয় স্বীকার করা নিয়েও কম সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হয়নি। ভারতীয় বণিকদের হিন্দুধর্ম সঞ্জাত মূল্যবোধই তার অনগ্রসরতার কারণ, একথা কেউ

কেউ বলেছেন। সবচেয়ে বড়কথা হলো এই যে, প্রাক-ব্রিটিশ পর্বের অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ভারতীয় বণিকদের স্থান গোটা সমাজ ব্যবস্থায় কোথায় – তা জানা যায় না। ভারতীয় ইতিহাস নিরালম্ব পরিবর্তনহীন অস্তিত্ব নিয়েই ভারতীয় বণিক বিরাজ করছে। পরে ব্রিটিশদের হাতে তার পরাজয় ও বিলুপ্তি ঘটেছে, একথাই আমরা সাধারণভাবে জানি।

গত দুই দশক ধরে বণিকগোষ্ঠী মুঘলযুগের ইতিহাসজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু ইতিহাসবিদরা বণিকদের আবিষ্কার করতে গিয়ে এক ধরনের সন্দেহ সব সময় অনুভব করেছেন। ফারসি দলিলে বণিকদের কথা তুলনামূলক ভাবে কমই আছে, কারণ মুঘলরাষ্ট্র কৃষিব্যবস্থা নিয়েই অনেক বেশি ব্যস্ত ছিল। ফলে ইতিহাসবিদরা পোর্তুগিজ এবং ফরাসি, ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানিগুলির সরকারি কাগজপত্র ও তাদের কুঠিয়ালদের ব্যক্তিগত ব্যবসার নথিকে উপকরণ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। প্রচুর তথ্য ও পরিসংখ্যান গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই জাতীয় উৎস ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথমত, এইসব নথিপত্রে শুধুমাত্র বিদেশিদের বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বণিকদের কার্যকলাপ জানা যায়। তার বাইরের বিশাল বাণিজ্যের জগৎ তথা উৎপাদন-ব্যবস্থার ছবি এই দলিলগুলিতে পাওয়া যায় না। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া বিদেশি বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্করহিত স্বাধীন বণিকদের সম্পর্কে এই সাক্ষ্যগুলি নীরব। দ্বিতীয়ত – নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লাভের জন্যে কুঠিয়ালরা প্রতিবেদনে প্রায়ই মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করত। ভারতীয় বণিকদের চরিত্র ও ব্যবহার সম্পর্কেও এইসব কুঠিয়ালদের পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা ছিল। এদের রচনায় পৌনঃপুনিকভাবে তার আবৃত্তি চলত মাত্র। অনেকেরই নিছক ব্যবসায়লাভ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে ঔৎসুক্য ছিল না। জাতিবিদ্বেষ অনেকেরই রক্তমজ্জায় মিশে ছিল। ফলে এদের কাছে ভারতীয় বণিক নানা পণ্যের মতোই লাভ-লোকসানের খতিয়ানের অংশমাত্র, মনুষ্যপদবাচ্য নয়। দশম-ত্রয়োদশ শতকে কায়রোর সন্নিহিত সমাধিতে রক্ষিত (জেনিজা) দলিলগুলির ভিত্তিতে এশিয়ার ইহুদি বণিক-সমাজের বিশদ ও অন্তরঙ্গ চিত্র গয়তিয়েন (Goitien) সমসাময়িক বণিকদের নিজেদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই তৈরি করেছেন। সেরকম উপাদান আমাদের আওতার মধ্যে নেই। দুপ্লের 'দুবাস', আনন্দরঙ্গম পিল্লাই-এর আত্মজীবনী বা জাহাঙ্গিরের আমলে রচিত এক বণিকের কাব্য 'অর্ধকথনক' ব্যতিক্রম মাত্র। আর্মেনিয়ান বণিকদের কাগজপত্র অবশ্য আজও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় নি। ফলে, ভারতীয় বণিকরা ইয়োরোপীয় বণিকদের কাগজপত্রের মাধ্যমেই আমাদের চোখে ধরা পড়েছে, তাদের নিজেদের কথা তারা নিজেরা এখনো সেভাবে বলতে শুরু করেনি। কোনোদিন করবে কিনা জানি না।

এই সীমার মধ্যেই কিন্তু আমাদের জানা ভারতীয় বণিক বইয়ে-পড়া পুরনো

ধারণা অনেকটা বদলে দিয়েছে। অনেক ধরনের বণিকদের হদিশ পাওয়া গেছে। তাদের প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের। এদের উত্থান বা অবক্ষয় একভাবে হয়নি, বিদেশি বণিকদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ও অবস্থাও, স্থান ও কাল অনুযায়ী বদলেছে। এদের সংগঠন এবং কার্যাবলি সম্পর্কেও আমরা নিশ্চয় কিছুটা জানি। অনেক ক্ষেত্রেই সংশয়ের অবকাশ রয়েছে, কিন্তু পূর্বনির্দিষ্ট ধারণাকে পরিত্যাগ করে নতুন প্রশ্ন করার মতো তথ্য জোগাড় হয়েছে প্রচুর।

মুঘলযুগের বণিকদের উৎপাদন-ব্যবস্থায় সামগ্রিকভাবে কী ভূমিকা ছিল, সেই প্রশ্ন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্যিক মূলধনের বিপুল পরিমাণ মুঘল-অর্থনীতির রূপান্তর ঘটাতে পারত কিনা, এ প্রসঙ্গে জবাব আবশ্যক। আবার, 'মুঘল-ই-আজম' তথা অষ্টাদশ শতকে গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক ক্ষমতার সঙ্গে বণিকদের কী সম্পর্ক ছিল, তার বিবরণ জানা দরকার। কারণ, অষ্টাদশ শতকের 'সংকটে' বণিকরা কী ভূমিকা নিয়েছে তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ইয়োরোপীয় সামন্ততন্ত্রের ইতিহাসের এক পর্যায়ে নগরের অধিকার রক্ষার সপক্ষে বণিকদের সশস্ত্র প্রতিরোধের কথা আমাদের জানা আছে। আবার, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্রের ভিত্তি ছিল এই প্রতিষ্ঠা-কামী বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে অভিজাতশ্রেণীর সমঝোতা। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় বণিকদের স্থান কোথায় —ভারতীয় ইতিহাসের বিবর্তনের ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্ন-গুলির পরিপ্রেক্ষিতেই বণিক বা বাণিজ্য-জগতের ইতিহাস রচনা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে।

বর্তমান অংশ মুঘলযুগের সামগ্রিক অর্থনীতির আলোচনার অঙ্গমাত্র। এই অংশের দুটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠককে আগে থেকেই সচেতন করা প্রয়োজন। প্রথমত—ইয়োরোপীয় কোম্পানি ও বণিকদের সম্পর্কে আলোচনা এখানে ইচ্ছা করেই করা হয়নি। ভারতীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এরা আমাদের আলোচিত সময়ে বাইরের শক্তি। নিছক ভারতীয় বণিককেই এখানে আলো-চনার কেন্দ্রে রাখা হয়েছে—যাতে তার ভূমিকা ভালো করে বোঝা যায় এবং সেই প্রেক্ষাপটে আমরা ইংরেজ-শাসিত ভারতীয় বণিকের চরিত্র বুঝতে পারি। এদিক থেকে বর্তমান লেখকের বক্তব্য হয়তো অতিমাত্রায় স্বদেশী, কিন্তু তা আলোচনার সুবিধার জন্যেই করা হয়েছে। এই আলোচনায় বিভিন্ন ধরনের 'বণিকরা' বিভিন্ন স্তরে 'টাইপ' বা বিশিষ্ট প্রকারের অন্তর্গত হয়ে আলোচিত হয়েছে। ইতিহাসের কতকগুলো সাধারণ প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে সাধারণভাবে একটা ছবি দেবারও প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে, এই 'টাইপ'গুলো সমসাময়িক কালের তথ্য দ্বারা সমর্থিত, কিন্তু আদৌ অনৈতিহাসিক নয়, পাঠকদের এই আশ্বাস দিতে পারি।

বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনার মুখবন্ধে বলতে হয়—এশিয়াতে বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল মোটামুটি চারটি। ক. পারস্য উপসাগর ও লোহিতসাগর, খ. ভারত, গ. ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ, এবং ঘ. চীন ও জাপানের সন্নিহিত এলাকা। এর মধ্যে ভারতের অবস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল দুটি কারণে। প্রথমত—এশিয়ার, সামুদ্রিক বাণিজ্য মূলত নির্ভর করত মৌসুমি বায়ুর গতি-প্রকৃতির ওপর, এবং পূর্ব-এশিয়া থেকে সরাসরি পশ্চিম-এশিয়ায় এক বছরের মধ্যে বাণিজ্য করে কোনো জাহাজের প্রত্যাবর্তন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। ফলে, ব্যবসা-বাণিজ্য ধাপে ধাপে হতো। চীন থেকে জিনিস ইন্দোনেশিয়ার মালাক্কায় আসত। নিয়ন্ত্রণ করত মূলত চীনা বণিকরা, তা আবার ঘুরে পৌঁছাত ভারতের উপকূলে প্রথমে বন্দর ক্যাম্বেতে ও পরে সুরাটে। নিয়ন্ত্রণ করতে গুজরাটি মুসলিম বণিকরা। সেই পণ্য আবার যেত পশ্চিম-এশিয়ায়। কিন্তু কোনো ভারতীয় জাহাজকে সুয়েজ পর্যন্ত যেতে দেওয়া হতো না। আরব বণিকরা সেই অঞ্চলের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। তাই ভারতের উপকূলভাগের সামুদ্রিক বন্দরগুলো এশিয়ার বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমিতে থাকত এবং এক অঞ্চলের মাল অন্য অঞ্চলে পৌঁছাত এই বন্দরগুলোকে ছুঁয়ে।

আবার, ভারতে তৈরি বস্ত্রের মহিমা ছিল অপরিসীম। নানা ধরনের, নানা দামের কাপড় তৈরি হতো এবং তার পরিমাণও ছিল প্রচুর। ফলে, সব দেশের সব রকমের বাজারে ছিল তার চাহিদা। এর জন্যে ঐ কাপড় এশিয়ার বাজারে জিনিসপত্র কেনার অন্যতম মাধ্যম হয়েছিল। ইয়োরোপীয় কোম্পানিরা সোনা দিয়ে ভারতীয় কাপড় কিনত এবং সেই কাপড় বেচেই কিনত ইন্দোনেশিয়ার মশলা। এছাড়া ছিল খাদ্যশস্য শুধুমাত্র ভারতের করমণ্ডল উপকূলভাগের বন্দরগুলোই নয়, মালাক্কা বা লোহিত সাগরের মোখাকেও চাল সরবরাহ করত উড়িষ্যা ও বাংলাদেশ। তাই, দুই ধরনের জিনিসই কেনাবেচা হতো। উঁচুদাম, কিন্তু হালকা পণ্য থাকত—হীরে, জহরৎ বা 'জিন্‌স-ই-কামিলে'র মধ্যে আমেদাবাদ বা বায়ানার নীল বা মালবের আফিম। আবার, কমদামি কিন্তু পরিমাণে প্রচুর পণ্যও রফতানি হতো—কাপড় ও খাদ্যশস্য। এই দুই ধরনের পণ্যের লাভ-লোকসানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই ভারতীয় বণিকরা বাণিজ্য চালাতেন।

এই বাণিজ্যের ধারার মধ্যে দিক-পরিবর্তন হতো বইকি। বন্দরের ভাগ্যের ওঠানামা হতো। চতুর্দশ শতকে মালাবারে কালিকটের বাজার উঠেছিল জমে এবং কুইলোন হারিয়ে ফেলে তার প্রতিপত্তি। সতেরো শতকে কালিকট অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে এবং গোটা পশ্চিম উপকূলভাগ জুড়ে দাপটে রাজত্ব করে গুজরাটের বন্দর সুরাট। এর পেছনে নানা কারণ কাজ করত—রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক নানা বাজারের চাহিদার টানা-পোড়েন। পঞ্চদশ

শতকে ভারতীয় উপকূলভাগের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ ছিল জোরদার। কিন্তু মালাক্কায় পোর্তুগিজরা ঘাঁটি গেড়ে বসায় এবং পশ্চিমে সাফাবি রাজবংশের উদ্ভব হওয়ায়, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সরাসরি বাণিজ্য জোরদার হচ্ছিল।

এই বাণিজ্যের জায়গা ছিল ইয়েমেনে অবস্থিত—লোহিত সাগরের কূলে মোখা ও জেদ্দা। জেদ্দাতে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মুসলিম তীর্থযাত্রীরা 'হজ'-এর জন্যে সমবেত হতেন। এই সময়েই তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে জমজমাট বাজারে অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে আসা ব্যবসায়ীরা গুজরাটি বণিকদের আনা ভারতীয় কাপড় কিনতেন। এইসব অঞ্চলে তাই গুজরাটি বানিয়াদের বেশ বসতি ছিল। আবার, প্রতিবছর ভারত থেকে বার্ষিক তীর্থযাত্রার সঙ্গে সংগতি রেখে মাল ও লোকভর্তি জাহাজ আসত। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি এই যোগাযোগে ভাঁটা পড়ে, জোরদার হয়ে ওঠে পূর্ব-এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য। তার কারণ, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও তার অর্থগৃধ্নু কর্মচারিদের চীনে আফিম রফতানি।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এইরকম পরিবর্তন দেখা যায়। বাংলার বাণিজ্যবন্দর ছিল হুগলি ও বালেশ্বর। আরাকান ও পেগু, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা ও মালয় এবং শ্যামের সঙ্গে বাংলার পূর্বমুখীন বাণিজ্য সপ্তদশ শতকের গোড়ায় বেশ জোরদার ছিল। বিশেষত শেষোক্ত দুটি এলাকায় বেশ তেজি ব্যবসা হতো। কিন্তু শতকের শেষদিকে হুগলি থেকে এইসব অঞ্চলে একটা থেকে তিনটের বেশি জাহাজ যেত না এবং কোনো কোনো বছর একেবারেই যেত না। এই সময়ে আরব সাগর ও সুরাটে বাজার তেজি ছিল। ১৭৩৪ সনের হুগলিতে আসা ভারতীয় লোকের মালিকানাধীন ১১টি জাহাজের ৫টি আসছে সুরাট থেকে, ৫টি আসছে মাদ্রাজ ও মালাবার থেকে এবং আরেকটি জাহাজ এসেছিল মসুলিপত্তম থেকে। এইসব জাহাজে আমদানি হচ্ছে—আরক, গোলমরিচ, কাঁচা তুলো ও নানা বিলাসদ্রব্য। আর, রফতানির মধ্যে সিংহভাগই জুড়ে থাকত বাংলার তুলোর কাপড়। চাল, তামাক ও গন্ধকও রফতানি হতো। তাই, ভারতীয় সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি পটে লেখা স্থিরচিত্র নয়।

ভারতবর্ষের সমুদ্র-বণিকরা কয়েকটি বিশেষ এলাকায় বাস করতেন। গুজরাটের সুরাট বন্দর, কেরল উপকূলে কালিকট, করমণ্ডলে মসুলিপত্তম এবং নিম্ন-গঙ্গায় হুগলি—এগুলোই ছিল তাদের আস্তানা। তাদের ঐশ্বর্যের বোলবোলাও ছিল। ওলন্দাজ কাগজপত্রের ভিত্তিতে জানা যায় যে, বাজার মন্দা না থাকলে আঠারো শতকের প্রথম দশকে সুরাটের গুজরাটি বণিকদের মালিকানায় অন্তত ৬০টি জাহাজ প্রত্যেক বছর বাণিজ্য-সফরে সমুদ্রযাত্রা করত। সুরাটে ভারতীয় বাণিজ্য বহরের মোট মাল বইবার ক্ষমতা ছিল ১৮ হাজার টন। যতদূর জানা

যায়, তেজি বছরে সুরাটে বার্ষিক বাণিজ্যে প্রায় ১৬ কোটি টাকা খাটত। তার মধ্যে এক কোটি টাকার মতো অর্থের নিয়ন্ত্রণ ছিল ইয়োরোপীয় বণিকদের হাতে। বাকি সব টাকাই গুজরাটি বণিকদের নিজস্ব কেনাবেচায় নিয়োজিত হতো।[১]

কিন্তু এই বন্দরগুলোর সঙ্গে সংলগ্ন অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল। মাল আসত উপকূলভাগের শহর ও গ্রাম থেকে। মাঝে থাকত রং-বেরঙের মধ্য-ব্যবসায়ীরা। নানা ধরনের তাদের কাজ। কেউ বা দালাল, কেউবা পাইকার। কিছু মাল দূর থেকেও আসত। ১৬৬১ সনের একটা হিসাব অনুযায়ী, সুরাট থেকে পারস্য উপসাগরে পাঠানো কাপড় এসেছিল বেনারস ও পাটনা থেকে। ১ লক্ষ টাকা মূল্যের এই জিনিস পাঠায় আর্মেনিয়ান ইত্যাদি নানা ধরনের বণিকরা।[২] তাই হাট, গঞ্জ, কসবা—নানা স্তরের ও নানা ধরনের বাজার ছিল ভারতে। 'দাদন' ও সরাসরি নগদ টাকার মাধ্যমে—দুইভাবেই মাল কেনা হতো।

সার্থবাহদের সম্পর্কে সবচেয়ে কম জানা যায়। ভারতের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার স্থলপথে একটা যোগাযোগ ছিল। লাহোর, কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট—এইসব বাণিজ্যপথের কেন্দ্র ছিল। তিব্বতের সঙ্গেও ভারতের স্থলপথে যোগ ছিল।

নানা ধরনের কিউরিও বা শৌখিন বিলাসদ্রব্য, ইত্যাদি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে এসব অঞ্চলে যেত। জিনিসের বৈচিত্র্য ও দামের পার্থক্য ছিল লক্ষ্যণীয়; যদিও একজন বণিক হয়তো খুব বেশি পরিমাণ জিনিস একনাগাড়ে অনেকদূর নিয়ে যেতে পারতেন না, পথেই তাঁকে মাল খালাস করতে ও আবার মাল কিনতে হতো। পারিবারিক ও সম্প্রদায়গত যোগ অনেক বেশি কাজ করত এইসব মাল কেনাবেচার ক্ষেত্রে বা বাজারে ধার পাবার সময়। বাণিজ্যের এই মূল কাঠামোর কথা মনে রেখে আমরা এবার আমাদের বিশদ আলোচনা শুরু করতে পারি।

'বণিক' বলতে আমরা প্রধানত ৪টি ভাগ করতে পারি। ক. ইয়োরোপীয় কোম্পানি ও তার কর্মচারিদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য এবং সেসব ক্রিয়াকলাপে জড়িত এদেশীয় বণিক, খ. ইয়োরোপীয় বণিক ও তৎসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিক, গ. স্থলপথে আন্তর্মহাদেশীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিক এবং, ঘ. স্থানীয় বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিক।

ক. আমরা প্রথমোক্তদের নিয়ে আলোচনা করব না। তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ। কিন্তু কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে তারা এখনো বাইরের শক্তি। আমাদের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শেষ স্তরের বণিক। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয়

স্তরের বণিকদের প্রতিও আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হবে, কারণ তাদের সঙ্গে শেষ স্তরের বণিকদের যোগাযোগ ছিল।

খ ॥ পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে পোর্তুগিজ টোম পাইরেস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সুমা ওরিয়েন্টাল'-এ ভারত মহাসাগরে সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিবরণ দিয়েছেন। সেই কাঠামো মূলত মুঘলযুগে অক্ষুন্ন ছিল। তাঁর ভাষায়: ক্যাম্বের হাত দু'ধারে প্রসারিত। সে দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এডেনের দিকে। অন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মালাক্কার দিকে। এই দুটোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা– যেখানে জাহাজ পাড়ি দেয়। অন্য জায়গাগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ।[৩]

তাই, ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যধারা পশ্চিমে লোহিতসাগর, পূর্বে সুন্দ্রা উপসাগরে বিস্তৃত ছিল। এই বাণিজ্যধারায় ভারতের বিভিন্ন বন্দর অংশ নিত– মালাবারের কালিকট, করমণ্ডলের মসুলিপত্তম, গুজরাটের সুরাট, বাংলায় হুগলি ও উড়িষ্যার বালেশ্বর। এইসব বন্দরগুলির ভাগ্যে অনেক ওঠানামা হয়েছিল, বণিকশ্রেণীও উঠেছে ও পড়েছে। কিন্তু সামুদ্রিক বাণিজ্যের ধারা অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত একইভাবে প্রবাহিত হয়েছে।

এইসব বাণিজ্য চালাত যারা, তাদের একটি গোষ্ঠী সম্পর্কে টোম পাইরেস বলেছেন: তারা (গুজরাটিরা) বাণিজ্যের সিংহভাগের কারবারী। সর্ব অঞ্চলে তাদের প্রতিনিধি রাখে ও ব্যবসা করে। আমাদের অঞ্চলের জেনোয়াবাসীদের সঙ্গে তারা তুলনীয়। তারা সর্বত্র জাহাজ পাঠায়। এডেন, হরমুজ, দাক্ষিণাত্য, গোয়া, ভাটকল, মালাবারের সবত্র, বাংলা, পেগু, শ্যাম, পেদির পাশে এবং মালাক্কা···এমন কোনো ব্যবসার জায়গা নেই যেখানে গুজরাটিদের দেখা যায় না। এইসব রাজ্যগুলোতে প্রতি বছর অন্তত একটা করে গুজরাটি জাহাজ আসে। এরা অনেক বড় জাহাজের মালিক এবং সেই জাহাজ চালাবার জন্যে বহু নাবিক তাদের আছে।[৪]

এখন এই সমস্ত সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিকদের কারো কারো অর্থ-প্রাচুর্য সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। সুরাটের বৃজি বোহরা ৮০ লক্ষ টাকার মালিক ছিলেন এবং মালাবারের রাহাবি পরিবার এক কথায় ৯০ হাজার টাকা বের করে দিতে পারতেন। ১৭০১ সনে ১১২টি জাহাজের মধ্যে সুরাটের আবদুল গফুর এককভাবে ১৭টি জাহাজের মালিক ছিলেন এবং তাঁর নিকটতম প্রতি-দ্বন্দ্বীর জাহাজ ছিল ৫টি। মৃত্যুর সময় তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। এঁরা নিজেদের লাভের ব্যাপারে কোনো বাধাই মানতেন না– না ধর্ম, না বর্ণ। টোম পাইরেস স্পষ্ট কথায় বলেছেন: 'ব্যবসার খাতিরে কোনো কাজকেই এরা ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে করে না।'

ব্যবসা সাধারণত ব্যক্তিগত উদ্যোগেই হতো। লাভই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। চেলাবিদের সঙ্গে মুল্লা পরিবারের এবং পাবকদের সঙ্গে কস্তমজীদের লাভের

সিংহভাগ নিয়ে প্রতিযোগিতা ও সরাসরি এইসব বণিকদের লাভের স্পৃহাও ব্যক্তিগত উদ্যমই প্রমাণ করে। ব্রাহ্মণ প্রভুদের চোখে মালাবারের বণিক সম্রাট ইকজেল রাহাবি এক সম্পদলোভী পুরুষ ছিলেন। তিনি টাকা উপায়ের কোনো পথকেই অপাঙ্‌ক্তেয় বলে মনে করতেন না, এবং ব্যবসায়ে সামান্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করতে পারতেন না। তাই বণিকদের পারস্পরিক সহযোগিতার পথেও বর্ণভেদ কোনো বাধা হয়নি। মালাবারের বাণিজ্যে বণিক সম্প্রদায় প্রভুদের সঙ্গে ইহুদি রাহাবিদের যৌথ উদ্যোগ দেখা যায়। দশম-একাদশ শতকেই সিরিয়ার ইহুদি বণিকরা ভারতীয় হিন্দু ও মুসলিম বণিকদের 'ভাই' বলত। বহু বাণিজ্য-জাহাজের নামও ছিল হিন্দু ও মুসলিম নাম মিলিয়ে – যেমন, লক্ষ্মীনামা। সাম্প্রতিক এক গবেষণা দেখিয়েছে যে, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যিক সংগঠনে বর্ণ সম্পর্কে সব সময় গোঁড়া ছিলেন না। অষ্টাদশ শতকের বহু গুজরাটি ব্যবসায়ী সংগঠনে ব্রাহ্মণেরা গোমস্তা হিসাবে কাজ করেছেন। সুরাটের অর্জুনজী নাথজীর মূলচাঁদ দুবে নামে এক ব্রাহ্মণকে ১৭৮০ সনে কলকাতার গোমস্তা হিসাবে নিয়োগ করেন। আজমগড়ের অগ্রওয়াল ব্যবসায়ীরা বংশানুক্রমিক-ভাবে গুজরাটি বণিক নিয়োগ করেছে। কাজ উদ্ধার করা ও লাভ করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম, বর্ণ বা গোত্র তাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে কখনোই মূল বিচার্য বিষয় ছিল না।[৫]

এইসব বণিকরা যে শুধুমাত্র দামী অথচ অল্প পরিমাণ জিনিসের কারবার করত তা নয়। বিপুল পরিমাণ ধান ও মোটা কাপড় পশ্চিমে এডেন ও হরমুজ এবং পূর্বে মালাক্কায় নিয়মিত যেত।[৬] করমণ্ডলের পোর্টো-নোভো বন্দরে ১৬৮১ সনে ২৮টি জাহাজ ১২ হাজার গাঁটরি কাপড় নিয়ে যায়। ১৬৮০ সনে পুলিকটের বাজারে ডাচদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারতীয় বণিকরা মোটা কাপড় কিনত এবং পোর্টো-নোভোয় ২৩টি জাহাজের মধ্যে ১৬টিই ভারতীয় বণিকদের হাতে ছিল।[৭]

এখন এই বিপুল সম্পদ, এই লাভের জন্যে উদগ্র আগ্রহ কতটুকু সামুদ্রিক বাণিজ্যের মহারথীদের কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত করেছিল? এ বিষয়ে তথ্য সামান্যই এবং আঞ্চলিক ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা থেকে যাবেই। তবে সুরাটের ক্ষেত্রে বলা যায় – বরোদা, ব্রোচ, আমেদাবাদ এবং ক্যাম্বের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষাকারী রাস্তার ২০ মাইলের মধ্যেকার অঞ্চল থেকেই রফতানি মাল সরবরাহ হতো। আঙ্কলেশ্বর, পিটলাদ, ধোলকা ইত্যাদি গ্রামগুলো যেখান থেকে বণিকরা জিনিস নিতেন, সেগুলো এই সীমার মধ্যেই ছিল। অনুরূপভাবে পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বণিক কৃষ্ণকান্ত নন্দীর (ইনি অবশ্য বানিয়া ছিলেন) ১৭৭৩-৭৪ সনের হিসাবের খাতা অনুসারে দেখা যাবে যে, তাঁর সঙ্গে সরাসরি ব্যবসায়ে জড়িত বনদ্রাহগর নামে প্রত্যেকটি তাঁতি ও দর্জি কাশিমবাজারের ৩ মাইলের মধ্যেই বাস করতেন।[৮]

গুজরাটের বণিক সম্রাটদের সুরাটের বাইরে বড় একটা জমিজমা ছিল না। তাদের সঙ্গে সরাসরি উৎপাদনেরও কোনো যোগাযোগ ছিল না। এক বিপুল সংখ্যক ও বিভিন্ন ধরনের মধ্যবর্তীরা তাদের আদেশানুযায়ী জিনিস সরবরাহ করত। সাধারণভাবে প্রত্যেকটি পরিবারের একজন সাধারণ দালাল ছিল। সে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে মাল সরবরাহের জন্যে যোগাযোগ করত। এবং তার যোগাযোগের মাধ্যমে অন্য ধরনের দালালরা মাল সরবরাহ করত। তারও তলায় থাকত পাইকাররা। এরা উৎপন্ন দ্রব্যের জন্যে খুচরো কাঁচামাল সংগ্রহ করত বা প্রাথমিক উৎপাদকদের মোড়ল হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল সরবরাহের চুক্তি করত। বছরে বছরে দাদনের বিনিময়ে উৎপাদকের সঙ্গে নতুন চুক্তি করা হতো, চাহিদা অনুসারে দাদন ও মাল সরবরাহ কখনো বাড়ানো বা কমানো হতো। কিন্তু সরাসরি কোনো উৎপাদককে নিয়োজিত করা হতো না, বা উৎপাদন-ব্যবস্থাতেও হস্তক্ষেপ করা হতো না।

১৬৬৭ সনে একজন ঢাকার বণিকও কোম্পানির কাপড় ব্যবসা সম্পর্কে লিখছেন : দালাল টাকা নিয়ে দেয় পাইকারকে। পাইকার সেটা শহরে শহরে নিয়ে যায় এবং তাঁতিদের দেয়। তাই, পাইকারের টাকার জামিনদার তাঁতি, দালালের টাকার জামিনদার পাইকার, এবং কোম্পানির টাকার জামিনদার দালাল।[৯]

সপ্তদশ শতকে ফরাসি কুঠিয়াল রোক পশ্চিম-ভারতে ব্যবসায় জগতে দালাল ও বানিয়াদের ভূমিকা প্রসঙ্গে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন : তোমার কেনাবেচায় দালাল লাগবেই। এই দেশে এটাই প্রচলিত প্রথা, দালাল ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না।

বর্ধিষ্ণু মুসলিম বণিকদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য : তারা সুতী কাপড়, বস্ত্র উৎপাদনে একেবারেই আগ্রহী নয়—যদিও বেশির ভাগ তাঁতিরা মুসলিম। তারা উৎপাদনে অংশ নেওয়াকে সামাজিকভাবে অমর্যাদাসূচক বলে মনে করে এবং যদি তাদের জাহাজে মাল পাঠাবার জন্যে তুলোর বস্ত্র দরকার হয়, তবে তারা বানিয়াকে ডেকে পাঠায়। —এই বানিয়াদের পরাশ্রয়ী চরিত্র খুব সুন্দরভাবে রোক বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : মনে রেখো ও নিশ্চিতভাবে জেনো, হাতে হাতে বিক্রি না করতে পারলে বানিয়ারা কিছু কেনে না। তারা তাদের নিজের থলে থেকে পুঁজি বার করে না। নিজেরা লাভ রেখে মাল বিক্রি করার পর বিক্রির টাকা থেকে তোমাকে মিটিয়ে দেয়।[১০]

বণিকরা নানা জিনিসের ব্যবসা করতেন। যেখানেই লাভ সেখানেই তাঁরা যেতেন। কিন্তু কোনো বিশেষ দ্রব্যে বিশেষভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে তার উন্নতি করানো, বা তাতে বিশেষীকরণ করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। ব্যবসায় জগৎ থেকে উৎপাদনের জগতে এইসব বণিকদের উত্তরণ হয়নি।[১১]

গ ॥ এখন আসা যাক স্থলপথে আন্তর্মহাদেশীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিকদের কথায়। দেখা যায় যে, কয়েকটি জায়গা বিশেষভাবে অন্য জায়গায় উৎপাদিত কয়েকটি জিনিসের ওপর নির্ভরশীল ছিল। টোম পাইরেস জানিয়েছেন: সমগ্র প্রদেশটাতেই (করমণ্ডলে) ধান পাওয়া যায় না, কারণ তা এখানে উৎপন্ন হয় না।[১২] ফলে বাংলা, উড়িষ্যা ও কানাড়া থেকে ধান আমদানি হতো এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ধানের বিশেষ বিশেষ এলাকায় চাহিদা ছিল। উৎকৃষ্ট নীল আগ্রার কাছে ও গুজরাটের একটি অংশেই তৈরি হতো এবং বাংলাদেশ ভারতের বহু অঞ্চলকে চিনি রফতানি করত।[১৩] এছাড়া, মুঘল আমলে বিশাল শহরগুলোর নানা ধরনের চাহিদা মেটাতে হতো গ্রামকে। রাজধানী আগ্রাতে প্রায় ৫ লক্ষ থেকে ৬ লক্ষ লোক থাকত। পাটনায় ও মসুলিপত্তমে থাকত ২ লক্ষ লোক।[১৪] বিদেশিদের ব্যবসার কেন্দ্রও পুরোপুরি দূরপাল্লার বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। পণ্ডিচেরির সাংবৎসরিক খাদ্য আসত বাংলাদেশ থেকে।[১৫] আবার, স্থলপথেও মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব-এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বেশ বজায় ছিল। এসব চাহিদা মেটাত কতকগুলো সুস্পষ্ট গোষ্ঠী এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে একেকটি গোষ্ঠীই বাণিজ্যে নেতৃত্ব দিত। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে মূলত শিখ ধর্মাবলম্বী লোহানা ও ক্ষত্রিরা, অন্ধ্রে কোমতি, তামিলনাড়ুতে চেট্টিয়ার, গুজরাটে খোজা, মেমন ও বোহরারা, পূর্ব-ভারতে আর্মেনিয়ান ও রাজস্থানী বানিয়া, পশ্চিম-ভারতে পারসিরা আঞ্চলিক স্থলবাণিজ্যে মুখ্য ভূমিকা নিত। এছাড়া, বানজারা বলে এক বিশেষ গোষ্ঠী ও শৈব দশনামী গোঁসাইরাও আন্তর্মহাদেশীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্যের বিশেষ অঞ্চলে ও ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ছিল।[১৬]

বানজারাদের অবস্থা কিরকম ছিল? কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গেই বা এদের সম্পর্ক কি? খুব সাধারণভাবে কয়েকটি কথা এখানে বলা যেতে পারে। স্থলপথে বৃহৎ পরিমাণে জিনিসের ব্যবসা বানজারাই করত। তারা নিজেরা ছিল যাযাবর গোষ্ঠী, যাত্রাপথেই তাদের জীবন-বিবাহ-মৃত্যু ও বাণিজ্য জড়িয়ে ছিল। একটি গোষ্ঠীতে প্রায় ৬-৭ শত লোকের জমায়েত হতো এবং প্রায় ২০ হাজার বলদ থাকত। এরা প্রচুর পরিমাণে কৃষিজ দ্রব্যের বেচাকেনা করত।[১৭] এই যূথবদ্ধ গোষ্ঠীর পাশেই ছিল অন্য বণিকরা। তারা এককভাবেই বাণিজ্য করত। তারা ফেরিওয়ালার মতো ঘুরে একেক জায়গায় জিনিস বেচাকেনা করত। তাদের প্রত্যেক জায়গায় 'দেশওয়ালি' ভাইদের একটি স্থায়ী গোষ্ঠী ছিল। সেই অঞ্চলে মাল কেনাবেচার সুবিধা করে দেওয়া বা বাজারের খবর এনে দেওয়ার দায়িত্ব সেই দেশওয়ালি ভাইদের। এইভাবে এরা বিশেষ বিশেষ ঋতুতে নিজেদের জাতভাই ও গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রাথমিক উৎপাদকের কাছে জিনিস কিনে অন্য জায়গায় অনুরূপভাবে বেচত। আবার, অনেক সময় একটি গোষ্ঠীর বণিক অন্য একটি অঞ্চলের সমগোত্রীয় বা অন্য কোনো গোষ্ঠীর মাধ্যমে জিনিস 'রলে

বোহ্রে'র মতো এক জায়গা থেকে কিনে অন্য জায়গায় বেচত।

অন্ধ্রের 'কোমতি'রা ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করত। সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে গোলকুণ্ডার ওপরে মেথওয়াল্ডের বিবরণ থেকে জানা যায়: এই কোমতিরা সাধারণত এই অঞ্চলের বণিক। তারা নিজেরা বা তাদের চাকররা গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। তাঁতিদের কাছ থেকে কাপড় ও অন্যান্য জিনিস জোগাড় করে এবং বেশি পরিমাণে সেটা আবার বিদেশি বণিকদের কাছে বিক্রি করে।[১৮]

অষ্টাদশ শতকে মহীপতি 'ভক্তবিজয়' ও 'ভক্তিলীলামৃত' নামে মহারাষ্ট্রের ১৪-১৫ শতকের সন্তদের জীবনী লেখেন। সন্তদের জীবনী হিসেবে এদের মূল্য যাই হোক-না কেন, ১৭-১৮ শতকের সামাজিক ইতিহাসের জন্যে আমরা এই আকরগ্রন্থ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারি। এই কাহিনীতে সন্ত ভানুদাসকে ফেরিওয়ালা ব্যবসায়ী হিসেবে লেখক বর্ণনা করেছেন, এবং অন্যান্য ফেরিওয়ালারা তাঁকে মূলধন দেয় এবং ব্যবসার গোপন কায়দা শেখায়। তাদের সঙ্গেই ভানুদাস বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়ান এবং ব্যবসার নিয়মনীতি ঠিকমতো না মানার জন্যে তিনি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অপ্রিয় হয়ে পড়েন। এখানে গোষ্ঠীগত-ভাবে ব্যবসায়ের কথা বলা হয়েছে, যদিও লাভ বা ক্ষতি একক ব্যবসায়ীরই হতো। তুকারামের জীবনীও অনেকটা এইরকম। তুকারামও নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করতেন এবং যে কোনো জিনিসই তিনি কেনাবেচা করতেন। তুকারাম প্রথমে ধানের ব্যবসা করলেন। পরে তিনি গোরুর গাড়ি করে কোঙ্কনে লঙ্কা বিক্রির কাজে নিয়োজিত হলেন। সেখান থেকে নুন কিনে তিনি অন্যান্য সার্থবাহদের সঙ্গে বালাঘাট গেলেন এবং পরে তিনি চুনের পরিবর্তে গুড় জোগাড় করে পুনায় তা বিক্রি করে টাকা জোগাড় করলেন।[১৯]

আকবর ও জাহাঙ্গিরের সময় এক ক্ষুদে ব্যবসায়ীর হিন্দিতে লেখা আত্মজীবনী হল 'অর্ধকথনক'। লেখক বানারসীদাস ঘুরে-ঘুরেই ব্যবসা করত। আগ্রা, খয়রাবাদ, বেনারস, পাটনা, জৌনপুর ইত্যাদি শহরে ব্যবসার খাতিরে সে বাস করত। তার মূলধনের উৎস ছিল তিন ধরনের—ক. উত্তরাধিকার থেকে পাওয়া টাকা, খ. ধার করা টাকা, গ ব্যবসা থেকে অর্জিত লাভ। ব্যবসা করার মূল পদ্ধতি ছিল বাড়ি-বাড়ি ঘুরে মাল বিক্রি করা। ব্যবসার জিনিসও ছিল রকমারি—জহরত ও মণিমুক্তা, ঘি, তেল ও কাপড় ইত্যাদি। ঐসব ব্যবসায়ে খুব বড় রকমের মূলধনের প্রয়োজন হতো না। দুশো থেকে পাঁচশো টাকা হলেই কাজ চলে যেত। এদের দ্রুত লাভের দিকেই ঝোঁক ছিল। ৪০ টাকার জহরত ৭০ টাকায় বিক্রি করে ৩০ টাকা লাভ করায় বানারসীদাস নিজেকে ভাগ্যবানই ভেবেছিলেন। যৌথ ব্যবসাগুলো অল্পদিনই টিঁকত। একটি শহরে থাকবার সময় সমগোত্রীয় লোকের সঙ্গে চুক্তি হতো, আবার শহর ছেড়ে চলে গেলেই ঐ চুক্তি ভেঙে যেত।[২০]

উত্তর-ভারতে শিখদের 'গুরুদ্বার' বা গোঁসাইদের মঠ এরকম সংযোগস্থল ছিল। প্রতি বছর বাংলাদেশের রেশম ও রেশমজাত বস্ত্র মির্জাপুর থেকে আগত সন্ন্যাসীরা মঠস্থিত গুরুভাইদের সহযোগিতায় পাইকারদের মাধ্যমে খুচরো কিনে এককাট্টা করে সারা পশ্চিম ও উত্তর-ভারতে একই উপায়ে ছড়িয়ে দিত। বোগলের সাক্ষ্য অনুযায়ী, তিব্বতের লাসায় কাশ্মীরের বণিক ও শৈব সন্ন্যাসীদের ক্ষুদ্র স্থায়ী গোষ্ঠী ছিল। তারা ভ্রাম্যমাণ জাতভাই বণিকদের সঙ্গে প্রাথমিক উৎপাদক ও ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করত। হাওড়ার ঘুসুটিতে পুরণগিরি গোঁসাইয়ের মঠ তিব্বতের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান যোগসূত্র ছিল, এবং তার পেছনে মদত দিত হরেক রকম লোক। বেনিয়ান দেওয়ান মহারাজ নবকৃষ্ণ, আন্দুল রাজপরিবার থেকে হেষ্টিংস, ব্যবসার খাতিরে এই মঠকে সাহায্য করতে কিছু কম কসুর করেন নি। আবার স্যামুয়েল টার্নারের সাক্ষ্য অনুযায়ী, আমাদের ছোটবেলায় ছবির বইতে দেখা ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসী পূরণপুরী সারা 'এশিয়াটিক' রাশিয়া, চীন ও তিব্বত বাণিজ্যের খাতিরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। গুরু তেগবাহাদুর পাটনার গুরুদ্বারের মাধ্যমে কাপড় কেনা-বেচায় বেশ দু-পয়সা আয় করেছিলেন। সপ্তদশ শতকে আর্মেনিয়ান বণিক হোভানেসের ব্যবসার খাতা এইসব বণিকদের কাজের সুন্দর আভাস দেয়। খোজা জ্যাকারিয়ার সন্তান গুয়েরাকের হয়ে পুরোহিত সন্তান হোভানেস ভারতে ব্যবসা করতে আসেন। তাঁর পুঁজি ছিল ২৫০ তুমান ও ১৮টি কাপড়ের টুকরো। এই পুঁজির ওপরে নির্ভরশীল ব্যবসার লাভের মাত্র এক-চতুর্থাংশ হোভানেসের প্রাপ্য ছিল। তিনি প্রায় ১১ বছর ধরে ইস্পাহান থেকে লাসায় ঘুরেছেন এবং এক শহরের জিনিস আরেক জায়গায় বিক্রি করেছেন। আবার সেই বিক্রির টাকা দিয়ে তিনি আরো জিনিস কিনেছেন। সুরাট, আগ্রা, পাটনা, লাসা—যেখানেই তিনি গেছেন, সেখানেই আর্মেনিয়ান বন্ধু পেয়েছেন। তাদের সমাজেই তিনি আতিথেয়তা নিয়েছেন এবং তাদের মাধ্যমেই জিনিস কেনাবেচা করেছেন। এই কেনাবেচা সবই খুচরো।[২১] লাসায় তিনি কিছুই জানতেন না। 'আমি যখন প্রথম লাসায় যাই, তখন না বুঝতাম তাদের ভাষা, না জানতাম তাদের ওজন এবং আচার-ব্যবহার।' তাতে ৫ বছর ধরে ঐ অঞ্চলে চুটিয়ে ব্যবসা করতে হোভানেসের কোনো অসুবিধে হয়নি, কারণ ঐখানে আর্মেনিয়ান বণিকদের একটি স্থায়ী বসতি ছিল এবং তারাও দুর্গম পথ ঘুরে প্রায় ১৭০০ কিলোমিটার দূরে সিংকিয়াঙে ব্যবসা করতে যেত। তাই, স্থলপথে বাণিজ্যে দুটি গোষ্ঠী পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল ছিল। ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীরা এবং একটি অঞ্চলে গোষ্ঠীগতভাবে স্থায়ী ব্যবসায়ীরা পরস্পরের সাহায্যে ব্যবসা চালাত। হোভানেসের কেনাবেচার তালিকায় ১৭৪ ধরনের জিনিস থাকত। তার মধ্যে কোনো বাদবিচার থাকত না। তুলো, নীল, বাহারি কাপড় থেকে মৃগনাভি,

গহনা, ঘোড়ার রেকাব ও মাছ ধরার জালও ছিল।[২২]

অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদে অবস্থিত আরাতুন জোহানেসের মাল শেরপুর থেকে সংগৃহীত হয়ে নানা হাত ঘুরে অবশেষে বসোরার ইশিয়ার কাছে পৌছায়। বুকানন হ্যামিল্টন পাটনায় আরতিয়া বলে একদল ব্যবসায়ীর কথা বলেছেন। তাদের কাজই ছিল এই 'রিলে ট্রেড' চালানো। এখন এই ধরনের তথ্য থেকে আবার কয়েকটি জিনিস পরিষ্কার। কৃষিজ ও অন্যান্য হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা থাকলেও এসব বণিকরা নানা ধরনের জিনিস সংগ্রহেই আগ্রহী। এরা খুব ব্যাপক হারে একবারে মূলধন বিনিয়োগ করত না, বা উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রকৃতি নিয়েও মাথা ঘামাত না। এইসব বণিকরা ভ্রাম্যমাণ। বাজারের সঙ্গে বা উৎপাদকের সঙ্গে এদের সংযোগ রক্ষাকারীরা অন্য লোক। মঠ বা গুরুদ্বারের ক্ষেত্রে ব্যবসাজাত লাভ বহু সময় জমি কিনতে বা মহাজনী ব্যবসায়ে নিয়োজিত হতো। সেখানে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের উৎপাদকদের নিয়োজিত করে উৎপাদন চালানো হতো না। এই ভ্রাম্যমাণ বণিকদের সঙ্গে অন্য বণিকদের পার্থক্য ছিল এই যে, দাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে নগদ টাকায় কেনাবেচা করতেই এইসব ভ্রাম্যমাণ বণিকেরা পছন্দ করত বেশি। আগে থেকে করা চুক্তির বদলে সরাসরি ক্রেতা ও বিক্রেতার দাম কষাকষির মাধ্যমেই এদের বাণিজ্য প্রধানত চলত।[২৩]

অষ্টাদশ শতকের শেষ ত্রিশ দশকে দোয়াবে ও রোহিলাখণ্ডের আঞ্চলিক বাণিজ্যের একটি বিবরণ পাটনার কুঠিয়াল ব্রাউন সাহেব দিয়েছেন (২০ অকটোবর ১৮০৩)। এই আঞ্চলিক বাণিজ্যে নানা ধরনের পণ্য আছে। রোহিলাখণ্ডের পিলাবিৎ নামে এক জায়গার ধানের চাহিদা ছিল ভারতজোড়া। সুবৎসরে এরকম ধান ফলনের পরিমাণ ছিল ৫০ হাজার মণ, এবং 'বানজারা' সারা ভারতে সেই ধান বিক্রি করত। আবার, রোহিলাখণ্ডের তাঁতিরা প্রয়োজনমতো তুলা পেত না। তাদের বার্ষিক গড়পড়তা ঘাটতি ছিল ৩ হাজার মণ। সেই চাহিদা মেটাত মহারাষ্ট্র।

এই আঞ্চলিক বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে কতকগুলি নির্দিষ্ট গঞ্জ ও বাজার গড়ে উঠত। সেইসব বাজারে বার্ষিক নির্দিষ্ট সময়ে কেনাবেচা হতো। অষ্টাদশ শতকে রোহিলাখণ্ডের এইরকম বড় বাজার ছিল হাথরাস। উত্তর-ভারত থেকে শাল, ঘোড়া ও ফলমূল এই বাজারে আসত। রোহিলাখণ্ড থেকে যেত বস্ত্রখণ্ড ও ধান। বণিকদের মধ্যে আদান-প্রদান ও লেনদেন এই বাজারে হতো। দোয়াবের বাণিজ্যে এইরকম লেনদেনের চিত্র সুস্পষ্ট। মারাঠা বণিকরা গঙ্গার পশ্চিম পার পর্যন্ত মাল আনত। তাদের পণ্য ছিল তুলো ও কারওয়া বলে এক জাতীয় মোটা লালরঙে ছোপানো কাপড়। এটোয়ার চারদিক ঘিরে তখন এই পণ্য কেনার নানা বাজার গড়ে উঠেছে। যেমন—লাকনা, ফেরিয়া, নিয়াৎপুর ও কালপির কাছে রসুলপুর। 'হুণ্ডি'র বিনিময়ে তুলো বিক্রি হতো। তা কিনত

কানপুর ও ফরাক্কাবাদের বণিকরা। তাদের কাছ থেকে আবার মির্জাপুরের বণিকরা কিনত। ফরাক্কাবাদ ইত্যাদি শহরের বণিকরা অকটোবর মাসেই মালের অগ্রিম চাহিদা জানাত ও দাম ঠিক করত। আবার, মাল জমা পড়বার আগেই তারা তাদের মাল বিক্রি করার চুক্তিও মির্জাপুরের বণিকদের সঙ্গে করে ফেলত। ফাটকাবাজির যথেষ্ট সুযোগ এই জাতীয় আদান-প্রদানে ছিল।

সামুদ্রিক বণিকদের মতো আঞ্চলিক বণিকরাও নগরেই থাকতেন। রোহিলা-খণ্ড ও দোয়াবের বড় বড় শহরে তাদের বসতি ছিল। রোহিলাখণ্ডে মোরাদাবাদ, চান্দোসি ও নাজিবাবাদ বা দোয়াবে ফরাক্কাবাদ, আগ্রা ইত্যাদি শহরেই তাঁরা থাকতেন। তাঁদের দালালরা মাল সংগ্রহ করত। বিভিন্ন অঞ্চলের সমধর্মী বণিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাঁরা মাল 'রিলে' করতেন। পারস্পরিক একটা বোঝাপড়া ছিল। হুণ্ডির মাধ্যমে মাল লেনদেনই তার প্রমাণ। হুণ্ডির ওপর অধিহার (premium) কত দিতে হবে, তা নির্ভর করত ব্যবসার ঝুঁকির ওপর। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাপূর্ণ এলাকায় হুণ্ডির অধিহার অনেক বেশি। গোটা মহারাষ্ট্রে এই হুণ্ডির কেনাবেচা অষ্টাদশ শতকে বেশ তেজ ছিল। কেবল কাপড়ই নয়, বিশেষ ধরনের দ্রব্যের চাহিদার প্রতিও বণিকরা নজর রাখতেন। মৌ ও শামসাবাদে হস্তশিল্পীরা তলোয়ার তৈরি করত। কারণ, রোহিলাখণ্ডের পাঠান সর্দার ও ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধারা তলোয়ারের ক্রেতা ছিল। প্রয়োজনীয় ইস্পাত বাইরে থেকেই আমদানি হতো। প্রতিবেদন অনুসারে, গোরখপুরের অবস্থা তখন অবক্ষয়ী। তবুও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে হাঁটাপথে ব্যবসা চলত। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ব্যবসার ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। এই ব্যাপক ব্যবসা বিভিন্ন গোষ্ঠীর সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু আঞ্চলিক বাণিজ্যেরও নিজস্ব স্তর আছে, সেখানেও নির্দিষ্ট বণিককুল নির্দিষ্ট এলাকায় ব্যবসার দায়িত্ব নিত। বাজারের একীকরণ এই স্তরেও হয়নি।

ঘ ॥ এবার আসা যাক শেষ স্তরের বণিকদের প্রসঙ্গে—যাদের সঙ্গে আবার অন্য দুই স্তরের বণিকের মাল সরবরাহের জন্যে যোগাযোগ ছিল। এরাই কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত ছিল। অষ্টাদশ শতকের আগে এদের সম্পর্কে তথ্য সামান্যই আছে। তাই আমরা মূলত এদের কার্যাবলি জানতে অষ্টাদশ শতকের তথ্য ব্যবহার করব। তবে মুঘল আমলের ছবি মোটামুটি এক ছিল বলে ধরতে পারি। কারণ, বাণিজ্য-কাঠামোর তলার স্তরে কখনো ব্যাপক পরিবর্তন আসেনি। রেলওয়ে এবং ১৮৬০ দশকে দ্বিতীয় পর্যায়ের অবশিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে সেরকম মৌলিক পরিবর্তন এলো।

অষ্টাদশ শতকের মধ্য থেকে উনবিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত ইংরেজি দলিলপত্রের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, পূর্ব-ভারতের প্রধান প্রধান

শহরে ধানচালের ও মনোহারি দ্রব্যের ফলাও কারবার ছিল। মুর্শিদাবাদের পতনের যুগেই সেই শহরে দিনে ৫ হাজার মণ চাল লাগত এবং চারটি গোষ্ঠী সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করত।[২৪] মুর্শিদাবাদে ভোজরাজের মতো গোলদার বা পাটনার চুনিলালের মতো গোলদার বছরে নিদেনপক্ষে ১ লক্ষ মণ ধান নিয়ে কারবার করত। দিনাজপুরে এদের বলা হতো সদাগর, কারণ এরা আবার ধানচালের নৌকারও মালিক ছিল। দিনাজপুরের একটি গঞ্জে দেখা যায় যে, একেক জনের ২৫টি গোলা আছে এবং তাতে ধান সংরক্ষিত আছে ৭৫ হাজার মণ। কারো আছে ১৪টি গোলা. তাতে আছে ২৬ হাজার মণ। এরা প্রত্যেকেই সাহা বা শ' অর্থাৎ ব্যবসায়ী শ্রেণীভুক্ত।[২৫] এই ধান সংগ্রহ বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে হতো। মুর্শিদাবাদ ও তার আশেপাশের এলাকায় ধান আসত দিনাজপুর, রংপুর, পুর্ণিয়া ও ঢাকা থেকে।[২৬]

মূল বড় শহরের সঙ্গে নানা কারণে আরেক ধরনের বসতির যোগাযোগ থাকত। বরাগাঁও ও শেরপুর নামে দুটি গ্রাম থেকেই বেনারসের লোকেরা সাধারণ মোটা কাপড় কিনত। এই গ্রাম দুটোর সঙ্গে বেনারস শহরের দূরত্ব দুই মাইলের বেশি ছিল না। নদী শুকিয়ে যাবার ফলে মুর্শিদাবাদের দুই মাইলের মধ্যে ভগবানগঞ্জ গড়ে ওঠে। ধানের ব্যবসায়ীরা সেখানেই থাকত। বড় শহরকে ঘিরে এরকম ছোট-ছোট ব্যবসায়-কেন্দ্র গড়ে ওঠা অষ্টাদশ শতকের অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু বুকানন হ্যামিলটনের সাক্ষ্য অনুযায়ী এই গোলদাররা ছিলেন নৈবেদ্যর উপর মণ্ডার মতো। এদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল নিচু স্তরের অনেক ব্যবসায়ী-দের—যারা গ্রাম ঘুরে ঘুরে জোগাড় করত ব্যবসার জিনিসপত্র। পাটনার ধান-চালের কারবারে পাওয়া যায় এরকম অজস্র ক্ষুদে সংগ্রহকারীদের ও ব্যবসায়ী দের নাম, যেমন—চিড়ি ফুরুস, গুলা পাইকার বা পারুচিনা প্রভৃতি। ৫ থেকে ১ হাজার টাকার মাল এরা কেনাবেচা করত। তবে গ্রামাঞ্চলে ধান-চালের কারবারে অগ্রণী ছিল ব্যাপারিরা—যাদের প্রাধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—ক. লাদু বলদিয়া, খ. গৃহস্থ ব্যাপারি। প্রথমোক্তদের মধ্যে অনেকেরই ৫ থেকে ৫০ টাকার বেশি মূলধন থাকত না এবং বড়জোর একটি করে বলদ থাকত। এরই মাধ্যমে এরা হাট থেকে কৃষকদের কাছ থেকে চাল কিনে জমায়েত করে গোলদারের গোলায় বিক্রি করত। টাকা-প্রতি এদের লাভ হতো এক থেকে দু'আনা। এদের মধ্যে অবস্থাপন্নদের বলা হতো কুলজি-ওয়ালা—যারা ৫০০ থেকে ৬০০ বলদের মালিক ছিল এবং সেগুলিকে ধার দিয়ে অন্যদের কাছ থেকে ধানের অংশ নিত, নিজেরা পারতপক্ষে সরাসরি ব্যবসা করত না।

আবেকদিকে ছিল গৃহস্থ ব্যাপারিরা। এরা নিজেরাই সম্পন্ন চাষী। বছরের

সুবিধেমতো সময়ে একশো থেকে হাজার টাকা মতো বিনিয়োগ করে ধান মজুত রাখত এবং পরে বলদিয়া ব্যাপারিদের কাছে বিক্রি করত, বা নিজেরাই বলদ ভাড়া করে হাটে নিয়ে যেত। যাই হোক, এরা মূলধন বিনিয়োগ করে তার আসল উশুল করে হয়তো দু'বার ব্যবসা করত; যেখানে বলদিয়া ব্যাপারিরা বছরে আট মাসে ৩ থেকে ১০ বার মূলধনকে আবর্তিত করতে পারে।[২৭] কিন্তু এই গৃহস্থ ব্যাপারিরা অনেক সময়েই গ্রামের মোড়ল—ধান মজুতের মূল দায়িত্ব এদের ওপর। দিনাজপুরে প্রাপ্ত একটি তালিকায় একেকটি মণ্ডলের গোলায় কম করেও হাজার মণ করে ধান মজুত আছে দেখা যায়।[২৮]

এই ধান সংগৃহীত হতো অল্প অল্প করে এবং বেশির ভাগ সময়েই বছরের মাঝামাঝি সময়ে দুঃস্থ কৃষককে ঋণ হিসেবে আগাম টাকা দেওয়া হতো। সেই আগাম টাকা বা ঋণ নিয়ে কৃষকরা ফসল কাটার সময় ফসলের মাধ্যমে ধনী প্রতিবেশী বা কারবারিকে ধার শোধ দিত। খাজা ইয়াসিন এই ধানচালের কারবারের প্রসঙ্গে 'বায়-ই-সেলাম' পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়: 'মাঠে এখনো ধান ওঠেনি, অথচ একজন লোক সব কিনে নিয়েছে। যখন ধান উঠবে তখনই সে তার দখল নেবে।'[২৯] পরবর্তীকালের ইংরেজি দলিলেও ধানচালের কারবারে এরকম ব্যবস্থারই উল্লেখ রয়েছে।

বাংলার শস্যাগার বর্ধমান সম্পর্কে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ব্রিটিশ শাসক লিখেছে: তাদের ফসল কাটার অনেক আগেই গরিব রায়তরা ধান ব্যবসায়ী ও অন্যান্য সম্পন্নদের কাছে টাকা দাদন পেয়েছে এবং সমস্ত শস্যের প্রায় অর্ধেকই ইতিমধ্যে আগেভাগেই বাঁধা পড়ে গেছে।[৩০] বুকানন হ্যামিলটন জানিয়েছেন, সম্পন্ন চাষীরা এইভাবে বিপুল টাকা আগাম লগ্নি করে এবং শতকরা ২৫ ভাগ লাভ করে।

অন্যান্য ব্যবসা, যেমন—নুন, লোহা, চিনি বা রেশমি ও সুতোর কাপড়ের ব্যবসা সম্পর্কে কি বলা যায়? সেগুলোও এইভাবে দাদনের মাধ্যমে এবং খুচরো ও স্বল্প পরিমাণে কেনা হতো। ১৭৭১ সনে মুর্শিদাবাদের আমদানি-রফতানি বিচার করলে দেখা যায় যে, এককভাবে বিশেষ কোনো ব্যবসায়ীরই একসময়ে রফতানির বা আমদানির বস্তুর পরিমাণের মূল্য ১ হাজার টাকার খুব বেশি নয়। অষ্টাদশ শতকে কলকাতার এক নামী বণিক বেনারস থেকে দামী কাপড় আনছেন, কিন্তু তার মোট মূল্য ৬০০ টাকার বেশি এবং এক একটি বিশেষ ধরনের কাপড়ের সংখ্যা ৫টির বেশি নয়।[৩১] বীরভূম অঞ্চলে একটি তাঁতি মাসে ৪টি বা ৫টির বেশি কাপড় বুনতে পারত না। রেশম-গুটি সংগ্রহ করতে একটি পাইকারকে বিভিন্ন রায়তের কাছে যেতে হতো। একটি হিসেব অনুযায়ী বৌলিয়ায় ৪২ মণ রেশম-গুটি বিভিন্ন জায়গার ১৩ জন রায়তের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তা রায়ত-পিছু ন্যূনতম ৩১ সের থেকে ঊর্ধ্বতম

৬ মণ পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।[৩২] অর্থাৎ বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধরে বিক্ষিপ্ত অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প আকারে উৎপাদন হতো এবং মূলধন অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে আগাম হিসেবে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে প্রাথমিক উৎপাদকদের হাতে পৌছাত। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের আকারও বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এককভাবে গৃহভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় নিয়োজিত প্রাথমিক উৎপাদকের অবস্থিতি—ভারতীয় বাণিজ্যে ফড়িয়া-পাইকার, দালাল প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন জাতীয় মধ্যবর্তী স্তরের ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনকে অপরিহার্য করে তোলে। এরাই বিক্ষিপ্তভাবে উৎপাদিত দ্রব্যকে নানা ঝক্কি-ঝামেলার মধ্যে এককাট্টা করে গঞ্জে ও শহরে বড় ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিত।[৩৩]

গ্রামের হাটে কেউ কেউ নিশ্চয় তেল, নুন ও লকড়ি ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবসা করত। ফারসি গ্রন্থগুলিতে তাদের বেদেহাক, সরথ-বাহক ও বনজিওয়ালা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এরা বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনে রত কৃষকদের গ্রামকে চালও সরবরাহ করত। আকবরের শত্রু হিমু নাকি এই জাতীয় নীচ ধান্য ব্যবসায়ী ধূসরদের মধ্যে জন্ম নেন এবং মেওয়াটের গ্রামে কারবার করেন। এইসব খুচরো 'পসারি'দের বিবরণ বুকানন হ্যামিলটনের প্রতিবেদনেও আছে। এরা কিন্তু গ্রামে বা ব্যবসার জগতে খুব বেশি সম্মানের অধিকারী ছিল না। এরাও দিন আনত দিন খেত এবং বহু সময়েই অন্য উপজীবিকার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে খুচরো বিক্রি করার পথ বেছে নিয়েছিল। কোথাও কোথাও নিজেরাই হাটে মাল বেচত। দক্ষিণ-কর্ণাটকে বুকানন অষ্টাদশ শতকে দু-ধরনের ব্যবসায়ীর কথা বলেছেন। একদল 'উদ্দারু' ও আরেকদল 'কোরা-মারু'। এরা সাধারণত পুকুর খুঁড়ত এবং বেতের পাত্র তৈরি করত। এদের এমনিই আর্থিক অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। তাই, এরাই আবার সময় ও সুযোগ অনুযায়ী হলুদ, সর্ষে ও ধানের খুচরো ব্যবসা করত। বাঙ্গালোরের কাছে বুকানন কোরামারুদের ভ্রাম্যমাণ বসতিরও উল্লেখ করেছেন। তারা তখন ধান ও নুনের ব্যবসা করত।[৩৪]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা গেল যে, প্রথমত কৃষিজাত দ্রব্য অবশ্যই বাজারের আওতায় এসেছিল। মূলধন আগাম বা ঋণের ছদ্মবেশে এই ব্যবসায়ে লগ্নি হতো এবং অসময়ে ধার করা ও ফসল ওঠার সময়ে শোধ দেবার ফলে কৃষকরা ধানচালের কারবারে মার খেত, কারণ ফসল কাটার সময়ে ধানের দাম কম থাকে। কৃষকদের বাজারের টানাপোড়েনে ন্যায্যের চাইতে বেশি ধানই দিতে হতো। মজুতের চলও ছিল এবং এই কারবারের ফলে কৃষকদের মধ্যে একদল সম্পন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। এর বাজারও ছিল দূর-দূরান্তরে। অন্য-দিকে একেবারে তলার দিকে ব্যবসায়ী ছাড়া প্রাথমিক উৎপাদকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ কারো বেশি ছিল না। নিজের উৎসাহে সরাসরি মূলধন

বিনিয়োগ করে স্বকীয় তত্ত্বাবধানে জিনিস উৎপাদন করার ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আগ্রহী ছিল না। অর্থাৎ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় মূলধন বিনিয়োগ হয়ে রূপান্তর ঘটানোর কোনো চেষ্টা হয়নি, কেবল বাজারের চাহিদা ও জোগানের খেলা, দামের ওঠানামার খেলায় কৃষি-অর্থনীতি জড়িয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ব্যবসায়ীদের মূল কাজ ছিল পণ্য জোগাড় করা এবং মোটামুটিভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের মাল জমা দেওয়া। তারা নিজেরা ছিল ছোট বা মাঝারি ধরনের ব্যবসায়ী। তারা বিরাট অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে থাকত এবং প্রাথমিক উৎপাদকদের মধ্যে তারা ব্যবসা করত। রফতানি বাণিজ্যের বিশাল বাজারে দামের খেলার ওপরে তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল কম। পূর্ব-ভারতে বেশির ভাগ বাণিজ্যই হতো জলপথে—যেখানে পশ্চিমে ও দক্ষিণে হতো গোরুর গাড়িতে। বড় ব্যবসায়ীরাই পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করত। পূর্ব-ভারতে নৌকার ওপর কর্তৃত্ব থাকত বড় ব্যবসায়ীদের। নৌকা না থাকলে ধান-চালের ব্যবসায়ে কেউ বড় একটা সফল হতো না। দিনাজপুরে নৌকার মালিকদের সদাগর বলা হতো এবং তারাই ছিল ব্যবসার জগতে প্রতিপত্তি-শালী। পূর্ণিয়াতে নৈয়ারা ছিল মাঝি বা কৃষক। কিন্তু নৌকাভাড়া নিয়ে তারা সম্পদশালী হয় এবং এইসব ঘাটমাঝিদের অবজ্ঞা করে এমন ক্ষমতা কোনো ফড়িয়া বা ব্যাপারির ছিল না। মুর্শিদাবাদে ধান-চালের কারবারে চারটি গোষ্ঠীর একাধিপত্যের কাছে নবাব ও কোম্পানিকে মাঝে মাঝে মাথা নোয়াতে হতো।[৩৫]

তবে, এই ছোট ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। ফলে, কাউকে পছন্দ না হলে বড় ব্যবসায়ীরা অন্য কাউকে মাল সংগ্রহ করার দায়িত্ব দিতে পারত। তাই, নানাভাবে লড়াই করলেও শেষ পর্যায়ে এই স্তরের ব্যবসায়ীরা ওপরের স্তরের ব্যবসায়ীদের প্রভাব খর্ব করে শ্রেণী বা গোষ্ঠী হিসেবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি, সমুদ্রযাত্রায় নিজেদের জাহাজ নিয়ে যাবার কোনো সুযোগই পায়নি।

আবার, এই কাঠামোতে একটি স্তরের সঙ্গে আরেকটি স্তরের নির্ভরশীলতা ও স্তরভেদ ছিল। স্তর অনুযায়ী একজন আরেকজনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বহু সময় চাহিদার খবর ও মূলধন ওপরের স্তর থেকে ধাপে ধাপে নিচের স্তরের ব্যবসায়ীর কাছে আসত এবং মাল সেই অনুযায়ী নিচের স্তর থেকে ওপরের স্তরে পৌঁছাত। এখানে প্রত্যেকটি স্তরেই একেকটি বণিকের নিজস্ব কাজ ও জগৎ আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিকমতো দামে মাল সরবরাহ হচ্ছে ততক্ষণ সেখানে অপর কেউ হস্তক্ষেপ করে না, সেই স্তরে লাভের দায়িত্ব বা মাল সংগ্রহের ঝুঁকি সম্পূর্ণ তার। এ যেন একটি বৃহৎ বৃত্তের সীমানাকে স্পর্শ করে আরেকটি ক্ষুদ্রতর বৃত্তের অবস্থিতি। এইভাবে বৃত্তগুলি সংখ্যায় বেড়েছে এবং পরিধিতে ছোট হয়েছে।

একটি বৃত্তের সঙ্গে অন্য বৃত্তের যোগ আছে, কিন্তু নিজের পরিধিতে বৃত্তের মালিক স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। এই গণ্ডির মধ্যেই সবকিছু সীমাবদ্ধ থেকে যায়, তা থেকে ভাঙবার বড় একটা চেষ্টা করা হয় না, কারণ লগ্নি অনুসারে লাভ যথেষ্ট হচ্ছে।

এর প্রমাণ মাঝারি ব্যবসায়ী হোভানেসের ব্যবসায় খাতা থেকে দেওয়া যেতে পারে।[৩৬]

জিনিস	কেনার জায়গা	বিক্রির জায়গা	লাভ
নীল	খুর্জা	বসরা	৫০
পালঙ্কপুনা	আগ্রা	কাঠমাণ্ডু	৭১
উম্বুগুরি	আগ্রা	কাঠমাণ্ডু	৮৮
তঞ্জনি	শাহজাদপুর	লাসা	১০০
চিনি	পাটনা	লাসা	১৩৭

ওপরের সারণি (table) থেকে এটা স্পষ্ট যে, অন্তর্বাণিজ্যে ভ্রাম্যমাণ বণিকদের লাভ প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত।

সামুদ্রিক বাণিজ্যেও লাভ বেশ চড়া ছিল। লোহিত সাগরে গুজরাটি বণিকরা বছরে ৪ কোটি টাকার কাপড় নিয়ে যেতেন এবং তেজি বাজারে তাদের অন্ততপক্ষে ৫০ থেকে ৬০ ভাগ লাভ হতো।

বড় বণিকদের প্রতি ছোট বণিকদের মনোভাবের মধ্যে নির্ভরতাও সুস্পষ্ট। আগ্রাতে হোভানেস নিজের ব্যবসায়ে শিরাজের হোভানের সঙ্গে যৌথভাবে যুক্ত হয়েছেন এবং প্রত্যেকে সমভাবে প্রায় ৯ হাজার টাকার একটি মূলধনের ভাণ্ডার তৈ'র করেছিলেন। তখন তিনি গুয়েরকেদের দাক্ষিণ্যে নির্ভরশীল নন। তবুও সেখানে তিনি লাসায় বসে লিখছেন: 'আমরা আমাদের প্রভুর দাসানুদাস মাত্র। তারা তাদের ইচ্ছামতো হিসাব ঠিক করতে পারে।'[৩৭]

ভারতীয় বণিকদের এরকম স্তরভেদ ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা কৃষি-অর্থনীতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর স্তরভেদ ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সমান্তরালে পাশাপাশি গড়ে উঠেছে। একই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ারই ফলে বাণিজ্যিক কাঠামোও একটি স্তরবিন্যাসের চিহ্ন নিয়েছে এবং গোটা মুঘল অর্থনীতিকে এক সামগ্রিকতার রূপ দিয়েছে।

এর পরের আলোচ্য বিষয় হলো বণিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে কি পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল? প্রথমত মনে রাখা দরকার যে, মুঘল রাষ্ট্রের কাছে সামুদ্রিক বাণিজ্য বা স্থল-বাণিজ্যের লাভ বা ক্ষতি ছিল ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের চেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গোলমাল হলে মুঘলরা হস্তক্ষেপ করত, কিন্তু সময়মতো কর পেয়ে গেলে বণিকদের কিছু বলা হতো না। বণিকদের ওপর

করের বোঝাও অপেক্ষাকৃতভাবে হালকা ছিল। কৃষকরা যেখানে কম করেও অর্ধেক উৎপাদন রাষ্ট্রকে জমা দিত, বণিকরা সেখানে শতকরা ২½ থেকে ৫ ভাগ শুল্ক, কিছু অন্তঃশুল্ক ও উৎকোচ দিয়েই রেহাই পেত। এই জাতীয় কর মাঝারি বণিকদেরও লভ্যাংশের তুলনায় খুব বেশি ছিল না। হোভানেস লাসা থেকে ২২ হাজার টাকার বিনিময়ে জিনিস আনেন। পাটনায় তাঁর নানা খাতে মোট শুল্ক পড়েছিল ৮৮৯ টাকা। ওটা মালের সমস্ত দামের শতকরা ৪ ভাগ মাত্র। তুলনামূলকভাবে ইরানে শুল্ক ৩ গুণ বেশি ছিল।[৩৮]

বহুসময় সামুদ্রিক বণিকরা নিজেরাই জলদস্যুদের হাত থেকে সমুদ্রের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্যে যুদ্ধজাহাজ পাঠাত। মুঘলরাষ্ট্র তাতে আগ্রহী ছিল না। দ্বিতীয়ত—অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গার জমিদাররা বা স্থানীয় ভূস্বামীরা 'রাহাদারি' কর বসাত এবং একে প্রায় প্রত্যেক মুঘল সম্রাটই অন্যায় বলে বাতিল করেছেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হয়নি। তাভার্নিয়ের দেখিয়েছেন যে, এই জাতীয় করকে আঞ্চলিক বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিকরা তাদের খরচার অঙ্গ হিসেবেই ধরে নিয়েছিল এবং অযথা লুঠতরাজ হবার পরিবর্তে ঐ ধরনের অতিরিক্ত ধার্য দিয়ে মাল নিয়ে যেত। এটা গোটা বাণিজ্যের কাঠামোর স্বাভাবিক অঙ্গ বলেই পরিগণিত হয়েছিল। স্থানীয় ভূস্বামীরা ধার্যকে বেশি করতে বড় একটা ভরসা পেত না, কারণ তাহলে তার হাটে বা তার নিয়ন্ত্রিত পথে ব্যবসায়ীরা না এসে ভূস্বামীর অঞ্চলের আওতায় চলে যাবে। তৃতীয়ত—টাকা ধার দেওয়া, স্থানীয় শাসনকর্তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় শাসনের কাছে ধর্না দেওয়া বা হরতাল করা, বণিক নেতাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ করা, প্রয়োজন হলে ইজারাদারদের জামিন হওয়া ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে বণিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংযোগ ছিল। কিন্তু তা কখনোই অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে যায়নি। আওরঙ্গজেবের সময় মীরজুমলা ও মুরুল্লা খান ছাড়া কোনো সামন্তই ব্যবসায়ীশ্রেণী থেকে আসেনি। তলার দিকে দেখা যায় যে, সুরাটের শাসনকর্তা পদে ব্যবসায়ীদের অংশ শতকরা হিসাবে মাত্র ১২ ভাগ।[৩৯] ১৭৩২ সনে সমস্ত শত্রুতা ভুলে সুরাটের প্রতিদ্বন্দ্বী বণিক পরিবার চেলাবি ও মহম্মদ আলি সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে অত্যাচারী শাসনকর্তাকে সুরাট থেকে বহিষ্কার করেন। এ জাতীয় বণিকদের সশস্ত্র বিদ্রোহ ভারতীয় ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা, কিন্তু তারা তার স্থানে আরেকজন অনুরূপ সামন্তকেই ডাকে। গোটা শহরের শাসনব্যবস্থায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না।[৪০]

এর সঙ্গে তুলনা করা যায় সুরাটের বানিয়াদের আরেকটি বিক্ষোভের কথা। একজন অত্যুৎসাহী কাজি যখন আওরঙ্গজেবের মন্দির ধ্বংসের আদেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজে লাগালেন, তখন পারক পরিবারের নেতৃত্বে ৮ হাজার বানিয়া

আমেদাবাদ শহরে চলে গেল। সুরাটের ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হয়ে গেল। মুসলিম বড় ব্যবসায়ী, সুরাটের আতঙ্কিত সুবাদার ও বানিয়াদের চাপে আওরঙ্গজেব মন্দির ধ্বংস করার নীতিকে শিথিল করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এই যৌথ স্থানত্যাগ কৃষকদের স্বভাবগত ছিল। এখানে একটি বিশেষ নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, গোটা কাঠামোর বিরুদ্ধে বণিকরা কিছু বলেনি।[৪১]

অনেকে রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব বলতে বাংলাদেশের জগৎ শেঠদের অপরিসীম ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত—জগৎ শেঠদের প্রভাব নবাবি আমলে। দ্বিতীয়ত—জগৎ শেঠ আক্ষরিক অর্থে টাঁকশাল নিয়ন্ত্রণ করতেন। সেটাই তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস, বাণিজ্য নয়। তৃতীয়ত—১৭৫৭ সনের পরে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জগৎ শেঠরাও অসহায় হয়ে পড়েন। মীরকাশিমের হাতে এঁদের লাঞ্ছনা এর একটা বড় প্রমাণ।

আবার, সামুদ্রিক বণিক বা অন্যান্য স্তরের বণিকদের সঙ্গে সরাসরিভাবে উৎপাদন-সম্পর্কের এরকম যোগাযোগ ছিল না বলে ভূস্বামীদের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত ব্যাপকতম বা উচ্চতম পর্যায়ে দেখা দেয়নি। দ্বিতীয়ত—স্থানিক বাণিজ্যের বণিকরা কৃষি-অর্থনীতিরই অঙ্গ ছিলেন। ভূস্বামীরা নিজেদের অঞ্চলে শান্তি-শৃংখলা বজায় রেখে ও ছোট ছোট হাট-গঞ্জ বসিয়ে তাদের বাণিজ্যের সহায়তা করতেন। এরই বিনিময়ে ঐসব বণিকরা নির্ধারিত তোলা দিতে দ্বিধা-বোধ করত না, কিন্তু কিছু অতিরিক্ত হলেই গোলমাল বাধত। কালকেতু স্পষ্ট বলছে, ভাঁড়ুদত্তই ন্যায্য সীমা লংঘন করে হাটে গোলমাল বাধায়।

"কিসের কারণে খুড়া ধর মোর ছলা।
পূর্বাপর আছে মোর মণ্ডলিয়া তোলা॥"[৪২]

তাই এখানেও গোটা কাঠামোর মধ্যে স্থানীয় বণিকরা বিনা দ্বিধায় কাজ করত। উৎপাদন-শক্তির বিকাশের অপেক্ষা লাভের দিকে সব ঝোঁক থাকায় এরকম অবস্থায় বণিকদের সঙ্গে রাষ্ট্র বা ভূমিজ স্বার্থের সঙ্গে সংঘাত বাধানোর সুযোগ কম ছিল। বণিকরা তাদের বৃত্তে স্বতন্ত্রভাবে চলত বা ফিরত, সেখানে নিজেদের 'আনজুমান' বা জমায়েতের প্রভাব ছিল অনেক বেশি। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও তারা নিজেরাই মধ্যস্থতার মাধ্যমে মেটাত, সাধারণত রাজশক্তি বা কাজির দ্বারস্থ হতো না।[৪৩]

কিন্তু যোগাযোগ একটা স্তরে নিশ্চয় বজায় ছিল। প্রথমত—আমরা ইয়োরোপীয় দলিলে বারবার মুঘল রাজশক্তির সঙ্গে ইয়োরোপীয় বণিকদের যোগাযোগ রাখার চেষ্টা দেখি। আর্মেনিয়ান বণিকরা তাদের সামাজিক জগতে পৃথক ছিল। কিন্তু খোজা পেত্রুস থেকে গুরগন খান পর্যন্ত সবাই রাজদরবারে নিয়মিত যোগাযোগ করতেন। উমিচাঁদ, ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রমুখদের অন্যতম কাজ ছিল তাদের ইয়োরোপীয় পৃষ্ঠপোষকদের তরফে রাজশক্তিকে তোয়াজ

করা। এই রাজশক্তি অবশ্য নানারকমের—দিল্লীশ্বর থেকে গ্রামের ক্ষুদে অধীশ্বরও এই রাজশক্তির প্রকাশ। বাজারের একাংশ রাজশক্তির আওতায়, মালের সঙ্গে সয়েরও জড়িত। ফলে, বণিকরা হয়তো নিজেদের উদ্যোগে রাষ্ট্রযন্ত্রের কেন্দ্রে যায়নি। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে বণিকদের স্বতন্ত্রতা[৪৪] নিয়ে নির্দিষ্ট মতামত দেবার সময় এখনো আসেনি।

মুঘলযুগের বণিকদের ওপর একটা সাধারণ আলোচনা করে কয়েকটি প্রশ্ন বিচার করা যেতে পারে। বাণিজ্যিক মূলধনের অভাব ভারতে ছিল না। বড় বড় বণিকও ছিল। কিন্তু সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতকে ভারতে বাণিজ্যিক সংগঠনে খুব বড় একটা পরিবর্তন দেখা যায়নি। করমণ্ডলে ওলন্দাজরা সংশ্লিষ্ট ভারতীয় বণিকদের নিয়ে নিয়মিতভাবে যৌথ মূলধনি সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করে।[৪৫]

মাদ্রাজেও এই জাতীয় চেষ্টা ইংরেজরা করে। প্রথমোক্ত স্থানে প্রচেষ্টা আংশিকভাবে সাফল্যলাভ করে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বণিকগোষ্ঠীর নিজস্ব সংঘাতের ফলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টা মূলত বস্ত্রশিল্পেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই পদ্ধতি ইয়োরোপীয় কোম্পানির সঙ্গে লেনদেনে অনুসৃত হতো। দেশীয় ক্ষেত্রে এর বড় একটা প্রসার দেখা যায়নি। যৌথ মূলধনি ব্যবস্থার সুবিধা মোটামুটি দুই ধরনের। সহজে মূলধন পাওয়া যায় এবং প্রাথমিক উৎপাদকদের কাছ থেকে যৌথভাবে পণ্য কিনলে দামে অনেকটা পড়তা পড়ে। এখন মনে রাখা দরকার যে, করমণ্ডলের বণিকরা কিন্তু ইয়োরোপীয় উদ্যোগে বেশ সাড়া দিয়েছিল। তাহলে কি দেশীয় ক্ষেত্রে স্বল্প মূলধনেই কারবার করা সম্ভব ছিল? এ ছাড়া যৌথ মূলধনি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দালাল ও তাঁতিরা বেশ সোচ্চার ছিল। নিশ্চয় দেশীয় ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা স্বভাবতই জোরদার ছিল এবং সেই বাধা অতিক্রম করা অপেক্ষাকৃত দুঃসাধ্য ছিল। ফলত, বাণিজ্যিক সংগঠনের ক্ষেত্রে নতুন কোনো পরিবর্তন আমরা দেখি না।

উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় কোনো অভিনব রূপান্তর ঘটানোর ইতিহাস আমরা এখনো পাইনি। বহির্বাণিজ্য বা অন্তর্বাণিজ্যের চাহিদা মেটাবার জন্যে এর প্রক্রিয়াতে প্রযুক্তিগত বিপ্লব ঘটানোর কোনো চেষ্টা আমাদের আলোচিত সময়ে বড় একটা করা হয়নি। মনে হয়, চাহিদার সঙ্গে তখনকার সরবরাহ মোটামুটি তাল রেখেছে। অসুবিধে দেখা যেত প্রধানত দুটি ক্ষেত্রে। দাম নিয়ে বিরোধ লেগেই থাকত। দ্বিতীয়ত—উৎপাদিত দ্রব্যের নির্ধারিত মান বজায় রাখা একটা সমস্যা ছিল। ইয়োরোপীয় কোম্পানির ক্ষেত্রেই এই জাতীয় ঝামেলার কথা আমরা বেশি শুনি। তারা এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে করত। কখনো তারা প্রাথমিক উৎপাদকদের সুতো সরবরাহ করত। কখনো তারা দালাল বা পাইকারদের ওপর নির্ভরশীলতা

ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করত। সুযোগ বুঝলেই একক প্রতিপত্তিশালী বণিককে কাবু করে বা পাশ কাটিয়ে অন্য বণিকদের সঙ্গে কারবার খোলার উদ্যোগ করত। করমণ্ডল ও মাদ্রাজে যৌথ কোম্পানি খোলবার পেছনে এই ধরনের উদ্দেশ্য কাজ করছিল। আবার, বাংলাদেশে তাঁতিদের আউরঙ্গের এলাকায় বসবাস করিয়ে কড়া নজরে রেখে উৎপাদনের নির্ধারিত মান বজায় রাখার চেষ্টা অনেকদিনই চলেছে। এই প্রয়াস কোথাও বা আংশিক সাফল্যলাভ করেছে, কোথাও বা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু নিজেদের উদ্যোগে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় কোনো প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের চেষ্টা তারাও করেনি।

এক্ষেত্রে আমরা স্বদেশী বণিকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাজারের চাহিদা ও জোগানের প্রকৃতির একটি মৌল পার্থক্য লক্ষ্য করি। যতদূর জানা যায়, বিশেষ ধরনের মান বজায় রাখার জন্যে স্বদেশী বণিকরা বড় একটা ব্যস্ত ছিল না। নানা ধরনের কাপড় তারা কিনত। বাংলার বস্ত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ঢাকার সম্পর্কিত দলিলপত্র এর সাক্ষ্য। নানা ধরনের কাপড় তৈরি হতো। মলমল, খাস ও আব-ই-রওয়ানের মতো দামী কাপড় ছিল। কোম্পানি সেই ধরনের নানা কাপড় কিনত। অন্যদিকে বাফতা থেকে গামছা পর্যন্ত মোটা ও কম দামী কাপড়ও তৈরি হতো। সেগুলি দেশীয় বণিকরা কিনত। ভোগা তুলোর তৈরি গবরা বা গোজি কাপড় গ্রামের গরিব লোকেরা পরত, কাফনে ব্যবহার করা হতো। তারও বেশ একটা ব্যবসা ছিল। সুতা-মিশ্রিত সিল্কের কাপড়েরও মধ্যপ্রাচ্যে বেশ চাহিদা ছিল। মোগলটুলির বণিকরা এই জাতীয় কাপড়েই কেনাবেচা করত। ১৭৪৭ সনের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, ইয়োরোপীয় বণিকরা মোট ৯½ লক্ষ টাকার কাপড় এবং আর্মেনিয়ান সমেত অন্যান্য দেশীয় বণিকরা ১৩½ লক্ষ টাকার কাপড় রফতানি করেছে। এদের মধ্যে তুরানিরা, পাঠানিরা ও হিন্দু বণিকরা মোটা কাপড় কিনেছে, কোনোরকম বাদবিচার করেনি। অন্যান্য বণিকরা তাদের পণ্যসম্ভারের মধ্যে মোটা কাপড়ের ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছে। অপরপক্ষে কোম্পানি কিনেছে মূলত সূক্ষ্ম কাপড়, যদিও ইংরেজ কর্মচারিদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের খাতে মোটা কাপড়ও কেনা হতো।[৪৬]

তাই ইয়োরোপীয় বণিকদের বাজারের চরিত্র ও দেশীয় বণিকদের বাজারের চরিত্রে ফারাক ছিল। দেশীয় বণিকদের বাজার ছিল অনেক বিস্তৃত, বিক্ষিপ্ত। মাল কেনবার লোকও ছিল নানা ধরনের। মুঘল বাদশাহের দরবার থেকে অটোমান সাম্রাজ্যের ও ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ লোকও তাদের ক্রেতার মধ্যে পড়ত। ফলে, মালের বিশেষীকরণ নিয়ে তাদের বিশেষ ভাবতে হতো না। নানা ধরনের চাহিদা তারা মেটাতে সমর্থ হতো বলে তারা নানা ধরনের কাপড় কিনত। কোম্পানির বাণিজ্যে কাপড়ের নির্দিষ্ট মান নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন

দেশীয় বণিকরা হয়নি, কারণ বিভিন্ন ধরনের ক্রেতার অবস্থিতির ফলে তারা বোধহয় নানা রকমের মাল বিক্রি করতে পারত। কমদামি ও নিম্নমানের কাপড়ের ক্ষেত্রে বোনার উৎকর্ষ নিয়েও প্রশ্ন ওঠে কম। ফলে বাজারের চরিত্রের ভিন্নতার জন্যে এবং ক্রেতার বৈচিত্র্যের জন্যে উৎপাদনের মান নিয়ন্ত্রণ দেশীয় বণিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। ফলে, ইয়োরোপীয় কোম্পানির অনুরূপ কোনো সমাধান করবার কোনোরকম তাগিদ তারা বোধ করেনি। তাই শুধুমাত্র সাধারণ অর্থে চাহিদা ও জোগানের খেলার মাধ্যমে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের ভারতে উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারকে ব্যাখ্যা করলে চলবে না। চাহিদার প্রতিটি স্তরকে বিশ্লেষণ করা এবং রফতানি-কৃত বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রের নিজস্ব নির্দিষ্ট চাহিদার প্রকৃতি ও স্থিতি-স্থাপকতার বিচার করা প্রয়োজন। তাহলে আমরা ভারতীয় বণিকদের ক্রিয়াকলাপের যুক্তিকে অনেকটা বুঝতে পারব।

উৎপাদন-কাঠামোর পরিবর্তনে ভারতীয় বণিকদের অনীহার পেছনে আরেক ধরনের সামাজিক কারণ আমরা দেখতে পাই। ভারতীয় বণিক ও প্রাথমিক উৎপাদকদের মধ্যে নানা স্তর ছিল। দালাল ও পাইকার এই ব্যবস্থায় সর্বব্যাপী ছিল।[৪৭] তাদের মাধ্যমেই প্রাথমিক উৎপাদকদের কাছ থেকে কেনাবেচা হতো। ফলে কেন্দ্রীভূত মূলধন কখনোই প্রাথমিক উৎপাদকদের সংহত করে নি। বিরাট মূলধন দালাল ও পাইকারের মাধ্যমে আলাদা হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে দাদনের মাধ্যমে হস্তশিল্পীদের কাছে পৌঁছাত। ফলে, মূলধন আকারে ক্ষুদ্র, হস্তশিল্পীরাও তাদের ক্ষুদে ক্ষুদে 'ইউনিট'-এর মাধ্যমেই উৎপাদন চালাত। ঢাকার অবস্থাপন্ন তাঁতিরা পাঁচ-ছয়টা করে তাঁত রাখত, তাদের আওতায় জোগানদার ও কারিগরও কাজ করত। কিন্তু তার চেয়ে বৃহদায়তন উৎপাদন-সংগঠনের খোঁজ পাওয়া যায় না। রেশমগুঁটি বা রেশম-কাপড় সংগ্রহ করা হতো—টুকরো-টুকরো ভাবেই করা হতো।[৪৮] মূলধনের কেন্দ্রীভবন হয়নি। 'দাদনি' ব্যবস্থা ও বিপুল পরিমাণ মধ্যবর্তী গোষ্ঠীর অবস্থানের দরুন মূলধন বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থেকেছে, তার চাপে উৎপাদন-ব্যবস্থার 'ইউনিটে'র কোনো পরিবর্তন হয়নি, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মাত্রা ক্ষুদ্রায়তনই থেকে গেছে, তার চরিত্রগত রূপান্তর হয়নি।

এই প্রসঙ্গেই বোধহয় বাণিজ্যিক মূলধনের রূপান্তর ঘটাবার সম্ভাবনা প্রসঙ্গে মার্কসের বিশ্লেষণ অনুধাবনযোগ্য। মূলধনের আয়তন বা তার আঙ্কিক বৃদ্ধি উৎপাদন-কাঠামোর রূপান্তর ঘটাবার পক্ষে আদৌ যথেষ্ট নয়। সেখানে মূলধনের সামাজিক ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[৪৯] মূলধন এইসব ক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বাইরেই থেকে গেছে। বাজারে কেনাবেচার মাধ্যমেই বাণিজ্যিক মূলধনের বৃদ্ধি হয়। বিভিন্ন বাজারের দূরত্বের ও পণ্যের হাতবদলের সুযোগ

নিয়ে লাভ করাই জাতীয় মূলধনের উদ্দেশ্য। পণ্য সঞ্চালনের ক্ষেত্রেই বাণিজ্যিক মূলধন সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে এই মূলধনের বৃদ্ধির জন্যে উৎপাদন-কাঠামোর ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি হয় না। মূলধনের মালিকরা উৎপাদন-ব্যবস্থা বদলানোর জন্যে কোনো সামাজিক তাগিদ অনুভব করেন না। বরং এই জাতীয় মূলধনের বৃদ্ধি আরো অনেক বেশি করে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন 'ইউনিটে'র সংখ্যা বাড়িয়ে চলে, পুরনো কাঠামোকেই জোরদার করে।

উপরিউক্ত আলোচনা নিয়ে নিঃসন্দেহে বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন আছে। তবে মুঘলযুগে ভারতীয় বাণিজ্যিক মূলধনের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে প্রশ্নের অবতারণা করার জন্যেই অন্য একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হলো। হিন্দুধর্ম বা বর্ণ দিয়ে ভারতীয় বণিকদের বিনিয়োগের স্পৃহাকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রাপ্ত সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। দ্বিতীয়ত—সামুদ্রিক বাণিজ্যের সমস্ত নামকরা ইতিহাসবিদরা আরেকটি তত্ত্বের পেছনে অনেকটা সময়, কালি ও কাগজ ব্যয় করেছেন। ওলন্দাজ ইতিহাসজ্ঞ ভ্যান লুয়ার (Van Leur), ইংরেজ ইতিহাসজ্ঞ পিটার মার্শাল (Peter Marshall) ও ভারতীয় ইতিহাসবিদ অশীন দাশগুপ্ত ভারতীয় সামুদ্রিক বণিকের চরিত্র ফেরিওয়ালা (Peddler) কিনা, তা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। মেলিক রোএলসফেজ প্রমুখ বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ইতিহাসবিদরাও আছেন। ফেরিওয়ালার চরিত্রের মাধ্যমে তাঁরা ভারতীয় বণিককুলের সীমাবদ্ধতা বোঝার চেষ্টা করেছেন। ইয়োরোপীয় বণিককুলের সঙ্গে তার পার্থক্য টানবার চেষ্টা করেছেন।[৫০] খুচরো পণ্য বিক্রি করার পদ্ধতি, তার পরিমাণ ও এশীয় বাজারের অস্বচ্ছতা থেকে সুরাটের বণিকসম্রাট আবদুল গফুরের মক্ষিকাসুলভ মানসিকতা—সমস্তই ফেরিওয়ালা-চরিত্রের লক্ষণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় আলোচনা 'পেশাদারি' 'অ্যাকাডেমিক' ইতিহাসবিদদের নিজেদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মাত্র। ভারতীয় বণিকদের সামাজিক চিত্রায়ণ বোঝাবার জন্যে ফেরিওয়ালা নিয়ে বিতর্ক নিছক অর্থহীন তুচ্ছ একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে কুস্তি করা মাত্র। ফেরিওয়ালা বণিককে ঘিরে অস্বচ্ছ ও বিচ্ছিন্ন বাজারের চরিত্র যে কোনো প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ফেরিওয়ালা মানসিকতা আমরা মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় অনেক বণিকের চরিত্রেই দেখতে পাবো। আর নিছক ক্ষুদে বণিকের প্রাচুর্য মধ্যযুগের ইয়োরোপে কিছু কম ছিল না। তবুও ইয়োরোপে ধনতান্ত্রিক রূপান্তর হয়েছে এবং বাণিজ্যিক মূলধন তথা বণিককুলের ভূমিকা সেখানে স্বতন্ত্র ছিল। ঐতিহাসিক 'category' বা বিশিষ্ট প্রকার হিসেবে এশিয়ার ফেরিওয়ালা ভারতীয় বণিককুলের সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্বন্ধে আমাদের বেশি কিছু বোঝাতে পারে না। আসলে ফেরিওয়ালা-চরিত্রও নিরালম্ব অবয়ববিহীন ভারতীয় বণিকেরই

রকমফের মাত্র, গোটা সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে তাকে মেলাবার চেষ্টা করা হয়নি। এদিক থেকে ভারতের বাণিজ্য-জগতের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদরা একই বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছেন, নতুন কোনো দিগন্ত উন্মোচন করছেন না।

বিক্রয়-বাজারের বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতার অভাব এবং মাল কেনার বাজারে দালাল ও পাইকারদের উপস্থিতি ও মূলধনের, বিচ্ছিন্নতা, বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্রাকারে মূলধনের বিনিয়োগই ভারতীয় মূলধনের সামাজিক ভূমিকাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ফেরিওয়ালা থেকে জবরদস্ত বণিক সবাই এই উৎপাদন-কাঠামোর অঙ্গীভূত হয়েছে, সেটাকে ভেঙে ফেলবার কোনো উদ্যোগ নেবার প্রয়োজন তারা অনুভব করেনি।

অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় বণিকদের ভূমিকা নিয়ে সামগ্রিক আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। কয়েক বছর আগে ইতিহাসজ্ঞ অরুণ দাশগুপ্ত ভারতীয় বণিকদের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মন্তব্য করেন। সাম্প্রতিক কালে অশীন দাশগুপ্ত কয়েকটি প্রবন্ধে এবং সুরাটের ওপরে অসাধারণ গবেষণাগ্রন্থে অষ্টাদশ শতকের সংকটের সময় ভারতীয় সামুদ্রিক বণিকের অসহায়ত্ব ও নপুংসকতার চিত্র বিশদ তথ্য, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও দক্ষ লিপি-কুশলতার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। অরুণ দাশগুপ্ত মশই গুজরাটের সামুদ্রিক বাণিজ্যের জগৎকে ভারতীয় অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। তা বণিক-সমাজের অন্যান্য অংশের অঙ্গীভূত নয়। ফলে, গুজরাটি বণিকরা কোনো রাজনৈতিক অভিলাষ বা শক্তি সঞ্চয় করেনি। সামরিক বা রাজনৈতিক চাপের কাছে তারা অসহায় ছিল। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবই তাদের পতনের মূল কারণ।

সুরাটের সামুদ্রিক বণিকদের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করে অশীন দাশগুপ্ত এই যুক্তিগুলিকে আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।[৫১] অষ্টাদশ শতকে সুরাটের সামুদ্রিক বণিকরা সংকটে পড়ে এবং তার কারণ ছিল রাজনৈতিক। মারাঠা আক্রমণ ও মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় সুরাটকে তার সরবরাহ কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ফলে, আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের পতন হয় এবং জমির সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন মুঘল শাসনকর্তারা সুরাটের বণিকদের ওপর জুলুমের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে সাফাবি রাজবংশের পতন এবং ইয়েমেনে শাসককুলের গৃহবিবাদ মোখা, জেদ্দা ও বসরার বাজারে চাহিদার সংকটকে ঘনিয়ে তুলল। ইয়েমেনের গৃহবিবাদে বিভিন্ন দল-উপদলের টাকার খাঁই গুজরাটি বানিয়াদেরই মেটাতে হলো। আর ইয়োরোপিয়ানদের দাপটের অনেক আগে থেকেই ভারতের সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী বণিককুলের সংকট ঘনিয়ে এসেছে। মালাবারেও সেই এক চিত্র। এখানে অবশ্য সেভাবে বাণিজ্যের সংকট আসেনি। কিন্তু মার্তণ্ড বর্মার ত্রিবাঙ্কুর সব বাণিজ্যকে রাষ্ট্রীয় আওতায় নিয়ে নেওয়ার ফলে মালাবারের

বণিককুলের সমৃদ্ধি কমে গেল, রাষ্ট্রের কর্মচারিতে রূপান্তরিত হওয়া ছাড়া তাদের বাঁচবার পথ রইল না। পরে ঝগড়াটে যুদ্ধবাজ টিপু মালাবারে লুঠতরাজ শুরু করলেন, গোলমরিচ উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রচণ্ডভাবে মার খেল।

ওলন্দাজ ভাষায় লেখা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ভারতীয় বণিকদের অবক্ষয়ের পেছনে রাজনৈতিক সংকটকে অনুসন্ধান করা একদিক থেকে অর্থবহ। যে কোনো প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক সম্পর্কের সরাসরি বহিঃপ্রকাশ রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত আনুগত্য ও কর্তৃত্বের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়।[৫২] কিন্তু তার পেছনে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটও থাকে। এই কথা মনে রেখে আমরা অশীন দাশগুপ্ত মশায়ের ব্যাখ্যাকে বিচার করতে পারি। তথ্যগত দিক থেকে দেখলে তাঁর বিশ্লেষণের মধ্যে কয়েকটা ফাঁক দেখা যায়। প্রথমত – যদি রাজনৈতিক সংকটই পতনের প্রধান কারণ হবে, তবে একই এলাকায় একই সময়ে কফির বাজার এত তেজি ছিল কি করে? ইয়েমেনি বা অন্যান্য বণিকরা কি করে বাণিজ্য করত বা লাভ করত? বস্ত্রশিল্পের বাজারের মন্দার পেছনে কি বিশেষ কারণ কাজ করছে, তার কোনো ব্যাখ্যা অশীনবাবুর আলোচনায় নেই। সেটাকে তিনি 'রহস্যজনক'ই বলেছেন। বার্ষিক তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে আগত বণিকদের কাছেই কফি ও কাপড় বিক্রি হতো। যেহেতু অশীনবাবুর অঙ্কিত রাজনৈতিক বিপর্যয়ের চিত্র সার্বিক, সেহেতু ঐ এলাকায় কফি ও কাপড়ের বাজার একই সঙ্গে ঐ সংকটের কমবেশি শিকার হতো। আসলে তা কিন্তু হয়নি। রাজনৈতিক সংকটকে পতনের প্রধান কারণ বললে কফির বাজারের বোলবোলাও অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে হয়। তা না হলে যুক্তি অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত – অশীনবাবু অষ্টাদশ শতকের বিশ দশকের কয়েক বছরের মন্দাকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং গুজরাটি বণিকদের দ্রুত অবক্ষয়ের কথা বলেছেন। কিন্তু আধুনিক গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, বাজারে ভারতীয় কাপড়ের চাহিদার পতন অনেক ধীর গতিতে হচ্ছে এবং ১৭৪০ সন পর্যন্ত ইংরেজরা বাংলার কাপড় নিয়ে এসব অঞ্চলে ব্যবসা করছে। গুজরাটি ব্যবসায়ীদের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজদের ব্যক্তিগত ব্যবসা এই অঞ্চলে জাঁকিয়ে বসল এবং তারাও ঐ কাপড়ের ব্যবসাই করত।[৫৩] ফলে, অটোমান সাম্রাজ্যে ১৭২০ সনে বস্ত্রের চাহিদা নিশ্চয় দীর্ঘ সময়ের জন্যে একেবারে কমে যায়নি। এশিয়ার বাজারে চাহিদার হঠাৎ ওঠানামার কথা প্রায় সব গবেষণাতেই স্বীকৃত হয়েছে। ১৭২০ সনের মধ্যপ্রাচ্যে মন্দার বিশেষ বৈশিষ্ট্য অশীনবাবুর গবেষণায় স্পষ্ট নয়। তৃতীয়ত – রাজনৈতিক চাপ ভারতীয় বণিকদের ওপর কিছু নতুন নয়। সেকালের সব এশীয় বণিকরাই এরকম চাপের মোকাবিলা করত এবং নিজেদের অবস্থার সঙ্গে সামলে নিতে পারত। অন্তত্তর গভীর সামাজিক সংকট এর সঙ্গে জড়িত আছে বলে মনে হয়।

দেশীয় সংকটের ক্ষেত্রে অশীনবাবুর যুক্তি নিঃসন্দেহে অনেক বেশি জোরদার। অষ্টাদশ শতকে শহর লুণ্ঠন বা লুঠতরাজ অনেক বেশি হয়েছে। অতিরঞ্জনের কথা বাদ দিলেও মিরাৎ-ই-আহমদির পাঠকরা গুজরাটে মারাঠা অভিযানের বিধ্বংসী ফলকে সহজেই অনুমান করতে পারবেন। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুটি কথাও বিবেচনা করা দরকার। প্রথমত—ভারতীয় প্রাথমিক উৎপাদকদের দ্রুত চলমানতা এবং সহজেই আবার নতুন করে উৎপাদন শুরু করার ক্ষমতা অপরিসীম; তাদের উৎপাদন-ব্যবস্থার সহজসাধ্যতাই এর কারণ। বাংলার রেশমশিল্পীরা মারাঠা লুণ্ঠনের ধাক্কা সামলাতে পেরেছিল। কোম্পানির শাসনের ফলে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া শুরু হলো তার চাপই তারা শেষপর্যন্ত সইতে পারেনি। দ্বিতীয়ত—কিছুদিন পরেই স্থানীয়ভাবে মারাঠারা নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে এবং বণিকদের অভয় দেয়। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে গাইকোয়াড়ের মোটামুটি সুশৃংখল শাসনব্যবস্থাই তার প্রমাণ। তাই গুজরাটের মতো প্রদেশেও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের প্রভাবকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো সম্ভব। মালাবারে ঐ জাতীয় জঙ্গী রাষ্ট্রের উৎপত্তি ভারতীয় ইতিহাসে ব্যতিক্রম। তবুও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যেও বণিকদের সহযোগিতা প্রয়োজন। মালাবারে বাণিজ্যিক কাঠামোকে রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করা নিঃসন্দেহে বণিককুলের ওপর নানাধরনের নিয়ন্ত্রণ বোঝায়, কিন্তু তাদের চরম ধ্বংসের কারণ হতে পারে না।

এবার কতকগুলি সাধারণ প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। অশীনবাবুর বক্তব্য ও তথ্য ভারতের উপকূলভাগে নিয়োজিত সামুদ্রিক বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বণিক-কুলের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। ভারতীয় বাণিজ্যে নিয়োজিত অন্য নানা ধরনের বণিককুলের সম্পর্কে তাঁর কোনো বক্তব্য নেই। এমনকি তাঁর লেখা বইতে শুধুমাত্র সুরাটের বণিকদের বাণিজ্য ও তাদের মধ্যে উপদলীয় কোন্দলের বর্ণনা আছে। তাদের সমাজ ও অন্যান্য জগতের আভাসমাত্র নেই। ফলে, তাঁর বিশ্লেষণ ভারতীয় সমাজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সীমিত কার্যকলাপের তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

অন্যান্য অঞ্চলের ভিন্ন স্তরের-বণিকদের ভাগ্য অষ্টাদশ শতকে অনেকটা আলাদা ধরনের। বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক কর্তৃত্ব আঞ্চলিক ও দূরপাল্লার বাণিজ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে বাংলা ও অযোধ্যার আঞ্চলিক বাণিজ্য বেশ জোরদার ছিল। মালব ও বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে মারাঠা শাসন তখন সুসংহত হয়েছে। 'মুলকগিরি'র প্রকোপ সেখানে ত্রিশের দশক থেকেই কমতে শুরু করেছে। মহারাষ্ট্রীয় 'বণিক' ও সন্ন্যাসীরা এই অঞ্চলে ব্যবসা করছিল। লাহোর ও মুলতানের আংশিক অবক্ষয় হয়, কিন্তু সেই জায়গায় কাশ্মীর, বিলাসপুর ও মোরাদাবাদের ব্যবসায়ীরা নানারকম ব্যবসা করতে থাকে। পাঞ্জাবের ক্ষত্রি-ব্যবসায়ীরাও এই জাতীয় ব্যবসায়ে প্রতিপত্তিশালী

ছিল। এইসব ক্ষেত্রে উদ্যোগী পরিবারের উত্থানও দেখা যায়। বাংলায় অষ্টাদশ শতকে সামান্য দাদনি ব্যবসায়ী থেকে উমিচাঁদের উত্থান এবং বেনারসে লালা কাশ্মীরি মল ও গোকুলচাঁদের প্রতিপত্তিই এর প্রমাণ। অষ্টাদশ শতকে জেদ্দার বাজারে মন্দার প্রভাব ভারতীয় বাণিজ্য জগতে সর্বময় প্রভাব ফেলেনি, অথবা সুরাটে বণিককুলের অবক্ষয়ই ভারতীয় বণিক-সমাজের একমাত্র ছবি নয়। এমনও নয় যে রাষ্ট্রীয় চাপ শুধুমাত্র অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় শহরেই বণিকদের নিস্পেষিত করত। সুশাসিত ইয়োরোপীয় এলাকাগুলিতেও ইয়োরোপীয় গভর্নর-দের দাপট বড় কম ছিল না। মাদ্রাজের সুনকা ভেনকাটাচলম্ এবং পণ্ডিচেরির নায়নিয়া পিল্লাই-এর মতো ইয়োরোপীয় কোম্পানির নামকরা 'দুবাসরা' অর্থলোভী গভর্নরের চাপে এবং কুঠিয়ালদের নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে নিঃস্ব ও দেউলিয়া হয়ে যান। শেষজনের মৃত্যু হয় কারাগারে। আনন্দরঙ্গ পিল্লাইয়ের জবানিতেও গভর্নরের দয়ার ওপর নির্ভরশীল দুবাসের জীবনের অনিশ্চয়তার কথা উল্লিখিত আছে।[৫৪] তবুও এইসব শহরে ভাগ্যান্বেষী বণিকরা জমায়েত হতো ও ব্যবসা করত। সুতরাং রাজনৈতিক চাপ ভারতীয় বণিকরা নানাভাবে চির-কালই প্রতিরোধ করেছে। মুঘল শাসনের অবক্ষয় জনিত পটভূমিই এই ধরনের চাপের একমাত্র কারণ নয়।

আবার, এই ধরনের চাপের কথা বিবেচনা করার ক্ষেত্রে আরো একটা কথা মনে রাখা দরকার। রাষ্ট্র আহরিত সামাজিক সম্পদের সিংহভাগে বণিককুলের অবদান কিন্তু নগণ্য। একথা মুঘলরাজের রাজস্ব আয়ের খাতে মাল (কৃষি থেকে আয়) ও সয়ের (বাণিজ্য থেকে আয়) মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলেই বোঝা যাবে। আকবরের সময় সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী বাণিজ্য-অঞ্চল গুজরাটের শুল্ক সেখানকার রাজস্বের মাত্র শতকরা ৬ ভাগ ছিল। অষ্টাদশ শতকে ১৭৭০-৮০ সনে বাংলার অন্যতম সমৃদ্ধশালী বর্ধমানের সয়েরের খাতে মোট গড়পড়তা বার্ষিক রাজস্বের মাত্র শতকরা ২ ভাগ ছিল।[৫৫] সপ্তদশ শতকে হোভানেস ইরানের তুলনায় ভারতে শুল্কের হারের শিথিলতার কথা বলে গেছেন। ফলে, অষ্টাদশ শতকে বণিকদের ওপর অর্থলোভী ফৌজদার ও অভাবি মনসবদারদের চাপ তাদের কতটা চরম আর্থিক সংকটে ফেলেছিল, তা ভাববার কথা। সুরাট পতনের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় বিশ্লেষণ করে অর্থনৈতিক চাপের তুলনামূলক বৃদ্ধি ও তার ব্যাপ্তির কথা অশীনবাবু বললেও তা নিয়ে আরো তথ্য পাবার প্রয়োজন আছে। কারণ, অষ্টাদশ শতকে বণিকদের ওপর যে কোনো ধরনের চাপই সপ্তদশ শতকের বিক্ষিপ্ত ও সাময়িক অত্যাচারের তুলনায় ভয়াবহ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ভারতীয় বণিককুল সেই লুঠতরাজের ফলে একেবারে ধনেপ্রাণে মারা গেল কিনা, সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে।

কিন্তু অরুণ দাশগুপ্ত ও অশীন দাশগুপ্তের গবেষণা কোনোরকম রাজনৈতিক

চাপের মুখে ভারতীয় বণিককুলের ক্লীবতা ও নপুংসকতাকে প্রমাণিত করেছে। অষ্টাদশ শতকের পটপরিবর্তনে তারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি এবং রাজনৈতিক উদ্যোগ নিয়ে কোনো সামাজিক উত্তরণের পথ বাৎলাতে পারেনি। অশীনবাবুর ব্যাখ্যা এই পর্যন্ত এসেই থেমে গেছে। তাঁর কাছে এর কোনো সদুত্তর নেই। ফলে, তাঁর কাছে অর্থক্লিষ্ট রাজপুরুষদের অত্যাচার, গুণ্ডামি ইত্যাদি মারাঠা ও টিপুর এবং মার্তণ্ড বর্মার জোরজুলুমই বণিককুলের পতনের কারণ। বড়জোর বাজারের অস্থিরতা এই প্রক্রিয়াকে জোরদার করেছে। সামাজিক প্রেক্ষাপটের ব্যাপকতা তাঁর বিশ্লেষণে নেই, যদিও গুজরাটি সামুদ্রিক বণিকদের বিচ্ছিন্নতার কথা অরুণবাবু বারবার বলেছেন।

এখানে বোধহয় ব্যাখ্যাটা সামগ্রিক উৎপাদন-কাঠামো এবং সেখানে বণিকদের স্থান কি, সেদিকেই জোর দিতে হবে। বড় বণিকরা উৎপাদন প্রক্রিয়ার পাইকাররা শুধুমাত্র 'দাদন' দেয় বা কাপড় জোগাড় করে, তাদের কাছে তাঁতিরা দাদনের সূত্রে বাঁধাও থাকে। কিন্তু তারা কেউ সরাসরি উৎপাদন-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে না। ছোট ছোট বণিকরা প্রাথমিক উৎপাদকদের কাছে থেকে নগদ অর্থে সরাসরি মাল কেনে। মুর্শিদাবাদে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে গোসাই বা ব্যবসায়ীরা নেমে আসত। তাদের তাঁতিরা নগদ টাকায় কাপড় বিক্রি করত। কিন্তু সেখানেও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের কোনো বালাই নেই। অর্থাৎ ইয়োরোপে যে বণিকরা মূলত সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছে, তারা বার্গার (burger) শ্রেণীভুক্ত। তারা নিজেদের তদারকিতে ক্ষুদে ক্ষুদে কারখানা রাখত, সেখান থেকে মাল তৈরি করে বিক্রি করত। এখানকার বণিককুলের আওতায় সেরকম কোনো কারখানা গড়ে ওঠেনি। ফলে, সামাজিক নেতৃত্ব দেবার শক্তিও এইসব বণিকের ছিল না, কৃষক বিদ্রোহের সঙ্গেও এরা যোগ দেয়নি।[৫৬]

শিখ-ক্ষত্রিরা বান্দার বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিল, কারণ কৃষক বা গ্রামীণ কারিগরদের স্বার্থের সঙ্গে এইসব বণিকদের স্বার্থের সংহতি গড়ে ওঠবার কোনো সামাজিক ভিত্তি ছিল না। তাই ভারতীয় বণিককুলের ব্যর্থতা খুঁজতে হলে আমাদের দৃষ্টি অনেক বেশি করে ফেরাতে হবে গ্রামীণ কারিগরদের দিকে, তাদের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের বণিককুলের সম্পর্কহীনতার বা সম্পর্ক বিন্যাসের কারণ বিশ্লেষণে। লোহিত সাগর বা পারস্য উপসাগরের ভাগ্য বিপর্যয়, বাজারের টানাপোড়েন বা কিছু সামন্ত প্রভুর জোরজুলুম অনেকটাই গৌণ কারণ হিসেবে কাজ করেছে বলে মনে হয়। ভবিষ্যতে মুঘলযুগে ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি উত্তরোত্তর বাড়বে বলে মনে হয়। তখন তথ্যের আলোকে অনেক প্রশ্নের জবাব মিলবে, তর্কের অবসান হবে, নতুন প্রশ্ন উঠবে।[৫৭]

খ. বাজারদাম ও কৃষক :

বাজার ও তার দামের ওঠাপড়ার সঙ্গে কৃষকদের ও কৃষি-অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে সাম্প্রতিক কালে। এখানেও আমরা কতকগুলো আপাত সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করতে পারি। পরিসরের অভাবের জন্যে প্রাথমিক উপকরণের ব্যাপক বিশ্লেষণ ও সংখ্যাতত্ত্বের নানা ধরনের প্রয়োগ এখানে দেখানো যাবে না। আমরা শুধুমাত্র প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটা মোটা কথা বলতে পারি। প্রথমত—বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারের সঙ্গে এক যোগসূত্র ও অখণ্ডতা ছিল। বাজারও নানা ধরনের ছিল। কয়েকটি গ্রাম ঘিরে হাট বা পেঠ, ধানের বাজার হিসেবে গঞ্জ ও বিভিন্ন আধাশহরে মণ্ডি এবং তার ওপরে আঞ্চলিক বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে ছিল কসবা। এইসব বিভিন্ন ধরনের বাজারের মাধ্যমে দাম ও মুদ্রামানের মধ্যে সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক সমতা মাঝে মাঝে থাকত। মোরল্যাণ্ড দেখিয়েছেন যে, পশ্চিম ও উত্তর-ভারত জুড়ে রূপার মুদ্রা কিভাবে বাজারে স্থির মূল্যমান হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[৫৮] এরকম যোগাযোগ দাম, মুদ্রা ও কৃষি উৎপাদনের কয়েকটি পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়েও প্রমাণিত হয়।

বিভিন্ন যাদুঘরে মুঘল আমলে সংগৃহীত 'তঙ্কা' মুদ্রাগুলোকে বছর অনুযায়ী যোগ করে এবং এর বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, বহির্বাণিজ্যের সূত্রে ভারতে ক্রমশ বেশি করে রৌপ্য আসা ও টাঁকশাল থেকে বেশি করে মুদ্রা বার হবার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে এবং একটা পর্যায়ে চালু তঙ্কা মুদ্রার সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল।[৫৯] দেখা যায় যে, ১৬৩৯ সনে চালু মুদ্রার সংখ্যা ১৫৯২-এর প্রায় ৩ গুণ ছিল। তারপর মাঝে ভাঁটা পড়ে। এই ভাঁটার টান ১৬৮৪ পর্যন্ত থাকলেও তখন চালু মুদ্রার সংখ্যা ১৫৯০-এর দশকের প্রায় দ্বিগুণ ছিল। আবার, ১৬৫৫ থেকে ১৬৬৩ পর্যন্ত ঐ ভাঁটার মধ্যেও মুদ্রার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বাড়ে। এখন এই মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বাণিজ্যিক পণ্যের দামও বেড়ে যায়। সরখেজ বা বায়ানায় কৃষকরা নীলচাষই করত এবং নীল বিদেশের বাজারে রফতানি হতো। দেখা যায় যে, নীলের দাম ঠিক এই জাতীয় মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ওঠানামা করেছে এবং বাড়তির মুখে প্রায় ৫ গুণ বেড়েছে। আবার, সিন্ধু প্রদেশে নির্মিত নীল যখন প্রতিযোগিতায় হেরে গেল ও তার চাহিদা পড়ে গেল, তখন সেখানে নীলচাষও কমে গেল। কেবল বাণিজ্যিক পণ্য নয়, মুদ্রাস্ফীতির এই সাধারণ প্রভাব অন্যান্য কৃষি দ্রব্যেও পড়েছিল। যেমন, ১৬৭০ সনে আগ্রায় অত্যন্ত ভালো ফসল হয় এবং খাদ্যশস্যের দাম সে বছর শস্তা হয়। কিন্তু সেই দাম আকবরের রাজত্বের সময় থেকে ৩ গুণ বেড়ে যায়। তাই, বাজারে টাকা আসা-যাওয়ার সঙ্গে কৃষিজাত দ্রব্যের দামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল—এটা মুদ্রা-অর্থনীতি প্রসারের একটা প্রমাণ।

কৃষকদের বাজারমুখিনতার প্রমাণ হিসেবে আগেই আফিম চাষের প্রসারের কথা বলা হয়েছে। মুঘলরা টাকায় রাজস্ব আদায় করত বলে কৃষকরা বহুসময় শস্য বিক্রি করত এবং সেদিক থেকেও বাজারের দামের টানাপোড়েনে তাদের আগ্রহ ছিল। রাজস্থানের ওপর সাম্প্রতিক গবেষণায় স্পষ্ট যে, বাজারের দামের বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে কৃষকরা টাকায় খাজনা দিতে আগ্রহী হতো এবং দাম পড়লে তারা শস্যের হিসেবের মাধ্যমে রাজস্ব দেবার জন্যে প্রার্থনা করত। অন্যান্য বিক্ষিপ্ত ঘটনা দিয়েও কৃষকদের উৎপাদনের সঙ্গে বাজার ও দামের সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। ১৬৩০-৩২ সনে গুজরাটে দুর্ভিক্ষের ফলে শস্যের দাম বেড়ে যায় এবং বাণিজ্য ও উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় সুতার চাহিদা কমে যায়। ফলে, তুলার জায়গায় খাদ্যশস্যের চাষ অত্যন্ত বেড়ে গেল। ১৬১৮ ও ১৬২৮ সনে কাঁচামাল সরবরাহ নিয়ে তাঁতি ও ইংরেজদের সংঘর্ষের কথা আর পরবর্তী কালে শোনা যায়নি। কারণ, ততদিনে বোধহয় তুলা ও সুতার সরবরাহ অতিরিক্ত চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। ১৬৭৬ সনে কাশিমবাজারে দেখতে পাই যে, রেশমবস্ত্র তৈরির চাহিদা মেটাবার জন্যে গোটা অঞ্চল জুড়ে তুঁতগাছ বসানো হয়েছে।[৬০]

বাণিজ্যের প্রধান ধারা ছিল গ্রাম থেকে শহরের দিকে। এবং ছোট ছোট হাটগুলি কতকগুলি গ্রামের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাত। গ্রামে ষোড়শ-সপ্তদশ শতক থেকে জমিদার শ্রেণীর উদ্ভবও গ্রামেতে এক ধরনের চাহিদার সৃষ্টি করেছিল। তবে, কৃষকদের ব্যাপক দুঃস্থ অবস্থা অবশ্যই গ্রামের চাহিদাকে শহরের চাহিদার সমপর্যায়ে নিয়ে যায় না। এই প্রসঙ্গে কতকগুলো বিক্ষিপ্ত তথ্য দেওয়া যেতে পারে। কর্নাটকের রাজস্বভারে জর্জরিত, নগ্ন, সাধারণ লোকের খাদ্য ও বস্ত্রের বিবরণ দিয়ে ভীমসেন বুরহানপুরী জানিয়েছেন যে, তাদের বার্ষিক খরচ বড়জোর ৫ থেকে ৬ টাকা। ষোড়শ শতকের চৈতন্যভাগবত-এর বর্ণনায় সবজি বিক্রেতা ও গোয়ালা শ্রীধরের বদান্যতায় শ্রীচৈতন্যকে যে উৎকৃষ্টতম খাবার দেবার পরিচয় পাই তা হলো—

> "শ্রীধরের গাছে যেই লাউ ধরে চালে।
> তাহা খায় প্রভু দুগ্ধ মরিচের ঝালে॥"

সাধারণ অর্থে কৃষকের উৎকৃষ্ট খাবারের নমুনা ছিল এই এবং এরকম জিনিস সংগ্রহের জন্যে তাকে শহরের বাজারের ওপর নির্ভর করতে হতো না। তবে, গ্রামীণ সমাজের সবার ক্ষেত্রে এককথা প্রযোজ্য নয়। কর্নাটকের শহরের বাজারে দামী জিনিসের খরিদ্দার ছিল বড় জমিদার ও স্থানীয় রাজারা, একথা ভীমসেন স্পষ্টভাবে বলে গেছেন। তবে, সাধারণভাবে জমিদারদের আয় জায়গিরদারদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম ছিল এবং কেউ কেউ বলেন যে, লোকলস্কর রাখতেই লাভের গুড় পিঁপড়ের খেত।[৬১] ষোড়শ শতকের শেষভাগ

থেকে সপ্তদশ শতক ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম কয়েকটি দশক পর্যন্ত কৃষিজ দ্রব্যের দামও সাধারণভাবে বেড়েছে। কিন্তু রাজস্ব চাপের ভারে এবং ব্যাপারিদের অর্থগৃধ্নুতা ও মহাজনি শোষণের মাধ্যমে কতটুকু লাভ সাধারণভাবে তাদের উপকার করেছে, তা ভাববার কথা। কিন্তু বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনে রত এবং অপেক্ষাকৃত বেশি মূলধনের অধিকারী কৃষকরা আপেক্ষিক অর্থে লাভবান হয়েছিল। আবার, যেসব অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিক পণ্য উৎপন্ন হতো সেখানকার কৃষকরা বাজারের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং বাজারের বিকাশ, দামের ওঠানামা ইত্যাদি মুঘল কৃষি-অর্থনীতিকে গ্রামীণ সমাজের আদিম অবস্থায় ফেলে রাখে না।[৬২]

সবশেষে বলা যেতে পারে যে, ভারতের মূলভিত্তি কিন্তু কৃষি-অর্থনীতি এবং মুঘলরাষ্ট্রও সেখান থেকেই উদ্বৃত্তের সিংহভাগ নিত। কতকগুলো বিক্ষিপ্ত তথ্য এখানেও দেওয়া যেতে পারে। কোনো অঞ্চলে বিলাসদ্রব্য ও উচ্চমানের কাপড় রফতানি ও উৎপন্নের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ অনেকদূর এগিয়েছিল। ১৬২৬ সনে বাংলার যে কাঁচা রেশমের মাধ্যমে আগ্রায় ও গুজরাটে রফতানি হয়েছিল, তার দাম ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা থেকে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার মতো। ১৬৭৬ সন নাগাদ মালদা থেকে জলপথে একসময় প্রায় আড়াই কোটি টাকার মতো মসলিন রফতানি হতো। অষ্টাদশ শতকের ৭০ দশকে লখিমপুর (বর্তমান নোয়াখালি) বছরে উৎপন্ন ১৬ হাজার টন ধানের মধ্যে ৩ হাজার টন রফতানি করত। এছাড়া, ৫০০ টন পান এবং ৫ হাজার টন নুনও এই রফতানির তালিকায় ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ সামগ্রিক কৃষিজ ক্রিয়াকলাপের অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে নগণ্য ছিল। একথা, রাষ্ট্রের রাজস্ব আয়ের খাতে মাল (কৃষি থেকে আয়) ও সায়ের (বাণিজ্য থেকে আয়) মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলেই বোঝা যায়। এই প্রসঙ্গে তথ্য আগেই দেওয়া হয়েছে। এতে করে কৃষি-অর্থনীতির ব্যাপকতা এবং সেখান থেকে উৎপন্নজাত সম্পদের ওপর রাষ্ট্রের বিপুল দাবি বা নির্ভরশীলতা বোধহয় প্রমাণিত হয়।[৬৩]

গ. হস্তশিল্প :

আমরা গ্রামীণ হস্তশিল্পীদের আলোচনায় আবার কতকগুলি জিনিস বাদ দিচ্ছি। প্রথমত—সুতী ও রেশমের কাপড়ই ভারতীয় রফতানিতে মুখ্য ভূমিকা নিত, তাই হস্তশিল্পের চরিত্র বুঝতে আমরা প্রধানত তাঁতিদের অবস্থা নিয়েই আলোচনা করছি। দ্বিতীয়ত—কোম্পানিদের বাণিজ্যের কথা এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আলোচনা করছি না। দেশীয় বণিকদের ও কৃষি-অর্থনীতির কাজ-কারবারের পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকছে।

তৃতীয়ত—শহরে বিভিন্ন বিলাসদ্রব্য উৎপাদনে রত কামার বা নৌকা বা জাহাজ তৈরি করতে ব্যস্ত হস্তশিল্পীদেরও আমাদের আলোচনার আওতায় খুব বেশি রাখছি না। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও গোটা অর্থনীতিতে নিয়োজিত লোকের তুলনায় এরা নগণ্য ছিল।

হস্তশিল্পীদের আলোচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। প্রথমত—সপ্তদশ শতকে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেছিল এবং কাপড়ের চাহিদা বেশ বেড়েছিল। দ্বিতীয়ত—ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্রীভবন ঘটেছিল। পাঞ্জাব, গুজরাট, করমণ্ডল ও বাংলাদেশের নাম এর মধ্যে উল্লেখ করা যায়। এই কেন্দ্রীভবনের মধ্যে অবশ্য তফাৎ ছিল। পশ্চিম ও উত্তর-ভারতে বহির্বাণিজ্যের জন্যে উৎপাদনকারী তাঁতিরা শহরের কাছেই ভিড় করত, এবং গ্রামের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হয়েছিল। বাংলা ও করমণ্ডলে তাঁতিরা গ্রামে ও শহরে ছড়িয়ে থাকত।

এই কেন্দ্রীভবনের পেছনে বহির্বাণিজ্যের চাহিদা, পরিবহন ও কাঁচামাল পাবার সুবিধা, বাজারের অবস্থিতি ইত্যাদি নানা কারণ বিভিন্নভাবে কাজ করেছিল। দ্বিতীয়ত—এই কেন্দ্রীভবনের সঙ্গে জড়িত বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের তাঁতিরা বিশেষ বিশেষ বাজারের চাহিদা মেটাত। ১৬৬৪ সনে সুরাটের তাঁতিরা মোখা ও বসরার ক্রেতাদের মনোমত কাপড় তৈরি করতে ব্যস্ত থাকত। ফলে, ইংরেজ কোম্পানির চাহিদা অনুযায়ী কাপড় তৈরি করতে তারা রাজী হয়নি। তৃতীয়ত—গুজরাট অঞ্চলে কাপড় তৈরির শিল্পে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন লোক লাগত। রঙ্গরেজি, রফুগার প্রভৃতি স্বতন্ত্র কারিগর ছিল। বিহারের একটি নিদর্শন থেকে ১৬২০ সনে জানা যায়, পাটনা থেকে ১৪ ক্রোশ দূরে লখেওয়ার নামে একটা গ্রাম থেকে আধা তৈরি কাপড় তাঁতিদের কাছ থেকে নিতে হতো। সেটাকে প্রমাণসই করে ও রং ছাপিয়ে বাজারে বিক্রির জন্যে তৈরি করতে আরো ৩ মাস লাগত। সেটা 'ক্রেতা' রঙ্গরেজিদের মাধ্যমেই করতে তার সঙ্গে তাঁতিদের কোনো সম্পর্ক থাকত না। আধা তৈরি কাপড় বাজারে তৈরি কাপড়ের চেয়ে শতকরা ২৫ ভাগ কম দামে বিক্রি হতো।[৬৪]

সুতরাং কাপড় তৈরি হবার ক্ষেত্রে শ্রমবিভাজনের রীতিও প্রসারলাভ করেছিল। রেশমশিল্পের ক্ষেত্রেও এটা দেখা যায়। বাংলাদেশে তাঁতিরা ছাড়া আর যারা রেশমসুতা বুনত ও সরবরাহ করত—তারা ছিল স্বতন্ত্র লোক—নকদ্, এবং যারা গুটিপোকা রক্ষা করত ও তুঁতগাছ চাষ করত, তারা ছিল চসর। চতুর্থত—দ্বিতীয় পর্যায়ে কয়েকটি জায়গায় কাপড় রং করা বা ধোয়ার কাজ অনেক সময় শিল্পীরা সমবেতভাবে করত। করমণ্ডলে কাপড় ছাপার জন্যে হস্তশিল্পীকে মজুরি দিয়েও নিয়োগ করা হতো।[৬৫]

তাঁতিদের মধ্যে নানা স্তরভেদও এসেছিল। কর্নাটকে অষ্টাদশ শতকে বেশির

ভাগ তাঁতিই কৃষিকাজ করত না। হোয়ালিয়ার বলে গরিব তাঁতিরাই কেবল দিনমজুরি খাটত। ভোগোতার ও পুর্তিগার বলে অন্য দুটি স্তরের তাঁতিও ছিল। তার মধ্যে প্রথমোক্তরা বেশ ধনী ছিল এবং তাদের অধীনে অন্য কিছু তাঁতিও কাজ করত। এদের সঙ্গে কৃষিকাজের বিশেষ কিছু সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু অধীনস্থ তাঁতিরা তাদের নিয়োগকারীদের কাছে এমন ঋণজালে আবদ্ধ ছিল যে তারা প্রায় দাসের মতোই ছিল। নিজেদের আবার সর্দার তাঁতি হবার সম্ভাবনা এদের পক্ষে ক্ষীণ ছিল।[৬৬]

কিন্তু এসব সত্ত্বেও গ্রামীণ হস্তশিল্প পরিবারভিত্তিক ও বিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলাদেশের তাঁতিরা বহির্বাণিজ্যের সঙ্গে থাকলেও তারা বেশির ভাগ গ্রামেই বাস করত। বলা হয়েছে যে, অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বাংলাদেশ ও করমণ্ডলের এমন কোনো গ্রাম ছিল না যেখানে শিশু, বা বয়স্ক লোক কাপড় তৈরিতে হাত লাগাত না। ঐ সাক্ষ্য অনুযায়ী, এই হস্তশিল্পের ধারা পরিবারভিত্তিক ও বংশানুক্রমিক ভাবে পিতা থেকে সন্তানে চলে এসেছে।[৬৭] ভারতীয় বণিকরা শুধু থোক টাকা 'দাদন' দিয়ে কাপড় নিয়েছে।

বিদেশি কোম্পানিগুলোর মতো তারা তাঁতিদের পারতপক্ষে সুতা কিনে দিত না। তারা আলাদা করেই তাঁতিদের সঙ্গে চুক্তি করত। ফলে, তাঁতিরা আলাদাভাবে নিজেদের তাঁতে কাপড় বুনত। ঢাকা বা সুরাটে, যেখানে বহির্বাণিজ্যের ধাক্কা খুব জোর লেগেছে সেখানে বড় তাঁতিরা তাদের অধীনে তাঁতে কিছু তাঁতি নিযুক্ত করলেও মূল ঝোঁকটা ছিল ছড়ানো পরিবার ভিত্তিক বংশানুক্রমিক শিল্পের দিকে। ভারতীয় বণিকরা দায়ে পড়ে সব তাঁতিদের এক জায়গায় মাঝে মাঝে জমা করলেও সেখানেও উৎপাদনে সমতা কিছুতেই আনা যেত না, কারণ তাঁতিরা আগের কায়দাতেই কাপড় বুনত। ১৭০৪ সনে একটি ফরাসি চিঠির সাক্ষ্য অনুযায়ী জানা যায় "তারা স্থানীয় (বণিকরা) হাজারটা বস্ত্রখণ্ডের জন্যে তিন ও চারশো লোককে টাকা দেয়। এদের একজনের সঙ্গে অন্যজনের বিন্দুমাত্র মিল নেই। একজন যদি কাপড়কে সূক্ষ্ম করে বোনে, অন্যজন করবে মোটা। আরেকজন এমন সুতা ব্যবহার করবে যেটা আকারে গোল··· এদের তৈরি জিনিস দৈর্ঘ্যে আলাদা হবে। 'অর্ডারি' মালের চাইতে কেউ এক আঙুল বা দুই আঙুল বেশি দেয়, আবার কেউবা দেয় কম। গত ২৫ বছরের ব্যবসার অভিজ্ঞতা বলে···এই অঞ্চলে একই মাপে ১০০টি জিনিসও পাওয়া যায় না।"[৬৮]

এখন এই বিচ্ছিন্ন পরিবারভিত্তিক উৎপাদনে রত হস্তশিল্পীদের অনেকেই কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল। কোম্পানির বোলবোলাওয়ের যুগেও এরকম অবস্থা মালদা ইত্যাদি অঞ্চলে ছিল। নকৃদদের মধ্যেও অনেকে রায়ৎ ছিল এবং এ নিয়ে কোম্পানির বাণিজ্য অধিকর্তার সঙ্গে জমিদার বা রাজস্ব আদায়ের

কর্তার প্রায়ই অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে ঝগড়া বাধত। ১৭৮০ এবং ১৭৯০ সনের সাক্ষ্য অনুযায়ী মালদার তাঁতিরা 'বেশির ভাগই চাষী' ছিল। আবার, নকৃদদের অবস্থাও রংপুর বা দিনাজপুরে সেরকম ছিল।[৬৯] কোম্পানি কৃষির ওপরে এ ধরনের নির্ভরশীলতা নিজের সুবিধের জন্যেই প্রথমদিকে ভাঙতে চেয়েছিল, তারা তাঁতিদের নিজেদের আড়ঙে বসবাস করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন কয়েকটি অঞ্চলে অষ্টাদশ শতকের শেষেও এরকম অবস্থা থেকে যায়, তখন আগের সময়ের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। নিছক ভারতীয় বাণিজ্যে পুঁজির দিক থেকে এরকম কোনো চেষ্টার নিদর্শন কিন্তু আমরা দেখি না,—না বাংলায়, না করমণ্ডলে।

আবার একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, গ্রামাঞ্চলের সব তাঁতিরা বহির্বাণিজ্যের বিপুল চাহিদা মেটাবার জন্যে নানা ধরনের কাপড় তৈরি করত। গ্রামাঞ্চলেও তাঁতিদের মধ্যে স্পষ্ট দুটো শ্রেণী ছিল—'কুমি' ও 'নাকুমি'। নাকুমি তাঁতিরা গ্রামীণ বাজারের সীমিত চাহিদার জন্যে শস্তায় মোটা কাপড় বুনত এবং তারা উচ্চমানের কাপড় বুনবার কোনো কায়দাই জানত না। তাদের জোর করে দাদন দিলেও তারা কাপড় সরবরাহ করতে পারত না। তারা কৃষকই ছিল। অবসর সময়ে বা বছরে যখন চাষ করত না, তখন কাপড় বুনত।[৭০]

অষ্টাদশ শতকে মেদিনীপুরের কয়েকটি পরগনায় বাজারের চাহিদা মেটাবার জন্যে উচ্চমানের কাপড় তৈরি করবার জন্যে তাঁতিদের এবং গ্রামের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাবার জন্যে তাঁতিদের একটি তুলনামূলক হিসাব পাওয়া যায়।[৭১] যেমন—

পরগনা—	মোট তাঁতি পরিবার—	বাইরের বাজারের সঙ্গে যুক্ত অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের কাপড় তৈরিতে নিয়োজিত তাঁতি পরিবার—	গ্রামের বাজারের চাহিদা মেটাতে রত নিচুমানের কাপড় তৈরিতে নিয়োজিত তাঁতি পরিবার—
নারায়ণগড়—	৯৪	১৩ (১৩·৮৩)	৮১ (৮৬·১৭)
সান্দর—	৩০১	১৫১ (৫০·১৭)	১৫০ (৪৯·৮৩)
জালকাপুর—	৮	×	৮
প্রতাপপুর—	১০৫	৫ (৪·৭৬)	১০০ (৯৫·২৪)
ভুমন্তা—	৫০	×	৫০
আতুরাবহার—	৫০	×	৫০
দন্তামোতা—	৩৮	৩৪ (৮৯·৪৭)	৪ (১০·৫৩)

পরগনা—	মোট তাঁতি পরিবার—	বাইরের বাজারের সঙ্গে যুক্ত অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের কাপড় তৈরিতে নিয়োজিত তাঁতি পরিবার—	গ্রামের বাজারের চাহিদা মেটাতে রত নিচুমানের কাপড় তৈরিতে নিয়োজিত তাঁতি পরিবার—
কেদার—	৪৬	৯ (১৯·৫৭)	৩৭ (৮০·৪৩)
বলরামপুর—	৪৯	৩৯ (৭৯·৫৯)	১০ (২০·৪১)
খড়্গপুর—	৩৫	×	৩৫
ধারিন্দা—	১৩	×	১৩

অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র এই ধরনের তাঁতিদের অত্যন্ত সীমিত দক্ষতার কথা মনে রেখেই লিখেছিলেন—"খুঁয়ে তাঁতি হয়ে তসরেতে হাত।"[৭২]

সব ধরনের গ্রামীণ বস্ত্রশিল্পীদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। নতুন উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধিতে বা ব্যবহারে তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না। তাদের অবস্থা সম্পর্কে ১৬৭৬ সনে মাদ্রাজে একজন ইংরেজ পরিদর্শক লিখছেন: "ইয়োরোপে তাঁতিরা নিজেদের সম্পত্তি বাড়াচ্ছে…এখানে ঠিক উল্টো। গরিব তাঁতিরা… দিন আনে দিন খায়, কদাচিৎ তারা আগে থেকে আগাম টাকা ছাড়াই (সুতা কিনে) কাপড় তাঁতে বুনতে পারে।"[৭৩]

অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে একটি ডেনিস প্রতিবেদন এইভাবে বীরভূম তথা বাংলাদেশের তাঁতি ও তার উৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছে।

"এই দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ইয়োরোপীয় উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে একেবারে আলাদা। সেখানে কিছুটা জমানো টাকা, যন্ত্র এবং পেশাদার উদ্যোক্তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে উৎপাদন ব্যবস্থা চলে, অপরপক্ষে বাংলাদেশে কোনো যন্ত্রই কারিগরের কাজকে লাঘব করে না। কাঁচামাল কেনা, পেটপুরে খেতে পাওয়া ও একটু অবকাশ পাওয়ার জন্যে যতটুকু দরকার, তার অতিরিক্ত কিছু সুতা নির্মাতা তাঁতিরা কিন্তু পায় না, বা প্রত্যাশাও করে না; তারা সবসময়েই গরিব। এমনকি অবস্থা ভালো করার কথা না ভেবে তারা তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই পরিশ্রম করে। তাদের পক্ষে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করা অথবা উৎপাদন সংগঠন বা নিজেদের ব্যবহারের যন্ত্রগুলোতে পরিবর্তন করার কোনো সম্ভাবনাই নেই। …যতক্ষণ পর্যন্ত সে যথেষ্ট টাকা বা দাদন পাচ্ছে যা দিয়ে সে তার বউ ও পরিবারের লোকরা মিলে কয়েক সের তুলো কিনে সুতো তৈরি করতে পাবে এবং তার তৈরি কাপড় নিয়ে বাজারে যেতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আগামী দিনের কথা ভাবে না।"[৭৪]

এখন এই পরিস্থিতি ইয়োরোপের মতো নেতৃস্থানীয় কারিগরের বিকাশ এবং

তাদের নিজেদের উদ্যোগে অন্য কারিগর নিয়োগ করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে বদলাবার চেষ্টা ভারতে বিশেষ দেখা যায়নি। কিছু জায়গায় এদের বিকাশ যে একেবারে হয়নি, সেরকম অবশ্য নয়। ঢাকায় মসলিন তৈরি করা তাঁতিদের কথা বলা যায়। কিন্তু তাদের কার্যকলাপ মূলত শহরভিত্তিক ও কোনো-না কোনো কোম্পানির কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল। মূল ঝোঁকটা ছিল ভিন্ন। কৃষির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত বংশানুক্রমিক পরিবারভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার আওতার মধ্যে বয়নশিল্পে নিয়োজিত গ্রামীণ তাঁতিরা আবদ্ধ ছিল।

অন্যান্য কারিগদের ক্ষেত্রেও সেরকম কথাই বলা যেতে পারে। মহারাষ্ট্রের গ্রামে কতকগুলো শিল্পী বা 'বলুতা' থাকত। এরা লোহার, চামার, মহার প্রভৃতি। নিজের গ্রামে স্বীয় ব্যবসায়ে একাধিকার থাকত এইসব বলুতাদের। এই বংশানুক্রমিক একাধিকারই হলো 'বতন'; কোনো কারণে কোনো 'বলুতা' গ্রাম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেও বংশধররা সেই ত্যক্ত স্বত্বে দাবি করতে পারত। সেই অধিকার মানাও হতো। এরকম উদাহরণ ১৭৮০ সনে পুনায় ও ১৭৫০ সনে নেবাসে পরগনার অন্তর্গত চিঞ্চোভি গ্রামে ক্ষৌরকারের বতনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। সুতরাং 'নাকুমি তাঁতি' বা এইসব কারিগরদের ক্ষেত্রে বাজারের জন্যে উৎপাদন খুব প্রভাব ফেলতে পারত না।

বলুতাদের মধ্যেও দুটি শ্রেণী থাকত—ওয়াতনদার ও উপরি। ওয়াতনদাররা তাদের অধিকার বিক্রি বা ভাগাভাগি করতে পারত। এখন এই ভাগাভাগি তাদের কাজের মধ্যে কোনো ভাগ আনত না, বা গ্রামে তারা যে পরিবারদের সেবা করছে, তাদের মধ্যে কোনো ভাগ করত না। বার্ষিক আয়কে ভাগ করা হতো। অন্যদিকে একটি পরিবারের জায়গায় দুটি পরিবার কাজ করত মাত্র। উপরিদের গ্রামের বসতির কোনো স্থিরতা ছিল না। যতদিন তারা গ্রামে কাজ করত, ততদিন তাদের সুবিধা সুযোগ একই ছিল। কিন্তু আদি বলুতা ফিরে এলেই তাকে গ্রাম ছাড়তে হতো। বলুতারা এককভাবে পরিবারের চাহিদাই মেটাত, কিন্তু তারা সমস্ত গ্রামের দ্বারাই নিযুক্ত হতো। গ্রামবাসী সকল পরিবারের কাজই তাদের করে দিতে হতো। তারা গ্রামের শস্য কাটার সময় একটা নির্দিষ্ট অংশ পেত, বা বছরে প্রত্যেকটি পরিবার নির্দিষ্ট সময়ে কিছু অর্থ বলুতাদের দিত। এছাড়া ক্ষুদ্র ইনাম (নিষ্কর) জমি এবং কিছু নির্ধারিত ধার্যও বলুতাদের প্রাপ্য ছিল।[৭৫]

অঞ্চলে অঞ্চলে কিছু পার্থক্যও দেখা যায়। পাটনার কাছাকাছি গ্রামের কামার ও ছুতোররা গ্রামীণ সমাজ থেকে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট শস্যের ভিত্তিতে কাজ করত। আবার দিনাজপুরে কলুদের মধ্যে নানা স্তরভেদ ছিল। কিছু কলু বেশ ধনী ছিল এবং সরিষার জন্যে কৃষকদের দাদন দিত। দূর বাজারে রপ্তানি করাই তাদের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু কিছু কলু আবার একদিনের ঘানি চালাবার

মতো সরিষা কিনত। আবার কিছু কলু দিন এনে দিন খেত এবং প্রতিবেশী চাষীর কাছে ধানের বিনিময়ে কাজ করত।[৭৬]

মন্দির বা বিশাল অট্টালিকা তৈরি, বড় নৌকা বা জাহাজ তৈরি করায় বহু সংখ্যক কারিগর জমায়েত করা হতো। কিন্তু মুঘল আমলে বাংলাদেশে মন্দির তৈরি করার ওপর শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল মশায়ের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, মন্দির নির্মাণস্থল থেকে কারিগরদের বসতির দূরত্ব ২৫ থেকে ৩০ মাইলের বেশি হতো না।[৭৭] এছাড়া কারিগররা নৌকা ইত্যাদি তৈরি করার ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে কাজ করতে আসত। কাজ শেষ হলেই যে যার স্বস্থানে ফিরে যেত। উৎপাদন ব্যবস্থা এমনভাবে সংগঠিত ছিল না যাতে করে প্রচুর সংখ্যক শিল্পী দীর্ঘদিন স্থায়ীভাবে সংগঠিত অবস্থায় অনেকদিন ধরে কাজ করতে পারে। গোলকুণ্ডার বিখ্যাত হীরের খনিতে কাজের বিবরণ পাওয়া যায়। মেথওয়াল্ডের বিবরণ অনুযায়ী প্রায় ৩০ হাজার লোক কাজ করত। কাজের পদ্ধতি আদিম ধরনের ছিল। মাটির উপরেই কাজ হতো বা মাটি, একজন আরেকজনের উপর বসে তুলত। ভূগর্ভস্থ খননের কোনো কায়দা ছিল না। জায়গা মেপে খনিটা নানা লোককে ইজারা দেওয়া হতো। ফলে, একটি সংগঠনের অধীনে অতগুলো লোকের কাজ হতো না। বিশেষ দক্ষতার দরকার নেই বলে বহুসময় লোক এই বৃত্তি ছেড়ে চাষে চলে যেত।[৭৮]

কর্নাটকে অষ্টাদশ শতকে বুকানন হ্যামিলটন একটি দেশীয় কামারশালায় ইস্পাত তৈরি হবার বিবরণ দিয়েছেন। বলা হয়েছে : "এইসব কামারশালায় নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ১৩ জন। একজন সর্দার কারিগর থাকে। সে ইস্পাত তৈরি করে···অপেক্ষাকৃত অদক্ষ শ্রমিকের চারটি দল থাকে। প্রত্যেক-টিতে ৩ জন করে লোক থাকে। একজন আগুন দেখে, আর তিনজন হাপর চালায়। এরা প্রত্যেকেই চাষী একজন মালিকও থাকে। সে প্রয়োজনীয় সব টাকা আগাম দেয় এবং ইস্পাত বিক্রি হলে টাকা ফেরত পায়। ···এইসব শ্রমিকরা মাঝে মাঝে নিযুক্ত হয় যখন তাদের ছোট ক্ষেতে কাজ থাকে না। ··· তার লোহা থেকে যে ইস্পাত হয় প্রত্যেক মানুষ সেটাই নেয়···সেই ইস্পাতের পরিমাণের অনুপাতেই (মালিকের) টাকার অংশ প্রত্যেকে ফেরত দেয়···সে (মালিক) সাধারণত টাকা কোনো বণিকের কাছ থেকে ধার পেতে পারে এবং সেই ধারই সে সাধারণত নেয়।"[৭৯]

এইসব বিবরণ থেকে একথা স্পষ্ট যে, মূলত গ্রামাঞ্চলে কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে গ্রামীণ কারিগররা কিভাবে যুক্ত ছিল। আবার ঐ কামারশালাগুলোও মহাজনি ব্যবস্থার নিগড়ে আবদ্ধ ছিল। বিশেষীকরণ যেখানে ছিল, ব্যক্তিগত মালিকানাও ছিল। কিন্তু সেসব সত্ত্বেও ছিল বাণিজ্যিক পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া। তুলনামূলকভাবে উন্নত এইসব কামারশালাগুলো তা অস্বীকার করতে পারেনি।

আবার, কর্নাটকে অষ্টাদশ শতকে আকরিক লোহার খনিতে দেখা যায় যে, খনি শ্রমিকরা সেখানে ঋণের দায়ে আবদ্ধ থাকত। ঐসব খনিগুলো সাধারণত ব্যবসায়ীদের ইজারা দেওয়া হতো। ইজারাদারদের অনুমতি ভিন্ন শ্রমিকরা অন্য কোনো উপজীবিকা নিতে পারত না। যখন খনিতে কোনো কাজ থাকত না, তারা তখন ইজারাদারদের কামারশালায় হাপর চালানোর বা চাষের জমিতে কৃষি শ্রমিকের কাজ করত। তাদের নিয়োগের প্রকৃতি কৃষিতে বাঁধা মজুরদের চাইতে অন্য কিছু ছিল না।[৮০]

এই সমস্ত কারিগরদের সম্পর্কে বার্নিয়েরের কথাই বোধহয় প্রণিধানযোগ্য। "কারিগরদের দক্ষতা ও কারিগরদের স্বাধীনতা এখানে সমার্থক নয়। একান্ত প্রয়োজন বা লগুড়াঘাতই তাদের কাজ করতে বাধ্য করে। তারা কখনোই বড়লোক হতে পারে না। ক্ষুধা নিবৃত্তি ও নিজেদের শরীর মোটা কাপড়ে ঢেকে রাখা তাদের কাছে সহজসাধ্য নয়। লাভের অংশ তার পেটে যায় না, বরং সেটা বণিকের অর্থবৃদ্ধি ঘটায়।"[৮১]

উপরের তথ্যগুলি বিচার করলে কতকগুলো কথা বলা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষে কারিগরদের পক্ষ থেকে সামাজিক সম্পর্ক বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার রূপান্তর ঘটানো শক্ত ছিল। মার্কস বর্ণিত বৈপ্লবিক পন্থায় উত্তরণের প্রক্রিয়া এখানে সম্ভব হয়নি। কারণ তারা গ্রামীণ সমাজে ন্যূনতম উদ্বৃত্তের উপর নতুন মহাজন বা বণিকের দাদনি পুঁজির উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিল। মূলধন ঐভাবে সংহত অবস্থায় উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করেনি, বরং বিচ্ছিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থাকেই বাঁচিয়ে রেখেছে। ফলে, গ্রামীণ কারিগরদের মধ্যে গিল্ড জাতীয় সংগঠনের প্রাদুর্ভাব আমরা দেখি না। বস্তুত, বেনারস ও গুজরাটের কিছু বড় শহর ছাড়া কারিগর ওভাবে সংগঠিত ছিল না। গিল্ডের নেতা বা তাদের হাতে ব্যাপক মূলধনও সংগৃহীত হয়নি। বাজারে কেনাবেচাও তারা সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না; সেখানে মধ্যবর্তী দালাল বা পাইকারদের কৃতিত্বই ছিল বেশি।

অনেকে 'বর্ণ' ব্যবস্থার নিগড়কে এরকম অবস্থার একমাত্র কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। পর্যটকদের রচনায় কারিগরদের মধ্যে এ ধরনের পিছুটানকে বর্ণ দিয়েই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কারিগররা যে বর্ণ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি বংশানুক্রমিক ভাবে অনুসরণ করত, একথা সাধারণভাবে সত্য। গুজরাটে লোহা তৈরি করা বা তাঁত নির্মাণে কোনো বর্ণের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের রাজকীয় নির্দেশ একদিক থেকে উৎপাদনে বর্ণ নিয়ন্ত্রণের কথাই প্রমাণ করে।

অষ্টাদশ শতকের মহারাষ্ট্রে দেখা যায় যে, জঙ্গম বলে তাঁতি গোষ্ঠী রেশমের কাজ করে। পালওয়েকারিরা বরাবর এই কাজ করত এবং তারা পৈঠানের গ্রামীণ সভার কাছে জঙ্গমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। গ্রামীণ সভা ও ছত্রপতি

জনগণের রেশমে কাজ করতে মানা করেন, কারণ তাদের জাতবৃত্তি হলো সুতী কাপড় তৈরি করা।

কিন্তু বর্ণবৃত্তি পরিবর্তনের পথে তা একেবারে অনতিক্রম্য বাধা ছিল না। চণ্ডীমঙ্গলে দেখতে পাই—

"নিবসে হলিক গোপ না জানে কপট কোপ
খেতে উপজায় নানা ধন
গুড় তিল মুগ মাষ গম সর্ষা কাপাস
সভার পূর্ণিত নিকেতন।"
... ...
"পল্লব গোপ বৈসে পুরে কান্ধে ভার বিক্রী করে
বন ভাঙ্গ্যা বসায় বাথান।"

আবার—

"তেলী বসে কতজনা কেহ চাষী কেহ ধনা।
কিনিঞা বেচায় কেহ তেল।"

এরই সঙ্গে : "কলু নগরে পিড়ে ঘানী।"

ভারতচন্দ্রও উল্লেখ করেছেন—

"আগরী প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগি চাষা ধোবা চাসা কৈবর্ত অনেক।"[৮২]

এখানে একই বর্ণের লোক দুটি কাজ করে স্বতন্ত্র হচ্ছে, যেমন হালি গোপ ও পল্লব গোপ বা চাষা ধোপা ও চাষা কৈবর্ত। অন্যদিকে, কলুরা তিলিদের কাজ করছে। গুজরাটে দেখা যায়, পারসিরা হিন্দু তাঁতিদের মধ্যে সহজেই জায়গা করে নিয়েছে। মহারাষ্ট্রের একটি নিদর্শন পাওয়া যায় যে, অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে দর্জিরা নীল ছোপানোর কাজে নেমে পড়ে।[৮৩] নির্মলকুমার বসু মশায় দেখিয়েছেন যে, উড়িষ্যার সরাইকেল্লায় তেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঘানির উন্নতি করতে তেলিরা পিছিয়ে যায়নি। ঘানির পরিবর্তন করে তেলিরা দু-বলদের ঘানি ব্যবহার করেছে।[৮৪] সুতরাং বর্ণব্যবস্থার আওতায় কারিগরদের বৃত্তি বা অন্যান্য পরিবর্তন একেবারে অসম্ভব নয়। বর্ণ 'গিল্ড' ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের মতো অতটা আঁটসাঁট ছিল না।

এখানে বিকাশের অভাব অন্যত্র খুঁজতে হবে। কৃষি-অর্থনীতির ওপর গ্রামীণ কারিগরদের অপরিবর্তনীয় ও অচ্ছেদ্য সংযোগ ও বাণিজ্যিক পুঁজির সঙ্গে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিচ্ছিন্নতাই ভারতীয় গ্রামীণ হস্তশিল্পের পারিবারিক ও বংশানুক্রমিক কাঠামোর মূল কারণ।

এই সামাজিক পরিস্থিতির ফলই বর্ণব্যবস্থা। আবার, বর্ণব্যবস্থা এ ধরনের

প্রক্রিয়াকে নিজের মতো করে জোরদার করেছে; কিন্তু কখনোই প্রক্রিয়াটির একমাত্র নির্ধারক কারণ হিসেবে কাজ করেনি।

ঘ. বর্ণব্যবস্থার সামাজিক দিক:

বর্ণব্যবস্থা নিয়ে যথার্থ আলোচনা করতে গেলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করা দরকার। আমরা এখানে মাত্র দুটি বা তিনটি দিকের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কৃষিপ্রধান সমাজে শ্রমিক সরবরাহের উৎসকে সজীব রাখাই এই ব্যবস্থার একটি উদ্দেশ্য। একটি বিশেষ বর্ণ বা জাতির সঙ্গে অন্য কোনো বর্ণের বা জাতির গোষ্ঠীগতভাবে সুনির্দিষ্ট সামাজিক বা অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার নামই যজমানি ব্যবস্থা। গ্রামে উচ্চবর্ণের বিশেষ কাজ করে নিম্নবর্ণের লোকেরা কতকগুলি নির্দিষ্ট সুবিধা ভোগ করত। যেমন, নির্ধারিত সময়ে কাজ পাওয়া ইত্যাদি। এখন এই ব্যবস্থার ফলে গ্রামাঞ্চলে হাতের কাছে দিনমজুর পাবার সুযোগ হয়েছিল, তা আগেই বলা হয়েছে। তাদেরই বহুসময় বেগার খাটা ইত্যাদি নানা ধরনের অতিরিক্ত কাজের মাধ্যমে উচ্চবর্ণকে সেবা করতে হতো।[৮৫]

আবার গ্রামীণ কারিগরদের ক্ষেত্রেও একথা বলা যায়। জাঠদের গ্রামে দু-ধরনের শিল্পী দেখা যায়— ক. লাগদার খ. কামিন। প্রথম ধরনের শিল্পীরা দক্ষ ও অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম কাজ করে, যেমন লৌহকার বা তাঁতি। দ্বিতীয় ধরনের শিল্পীরা 'তথাকথিত' অশুদ্ধ কাজ করে যেমন চামার। এরা প্রত্যেকেই উঁচু জাঠ গোষ্ঠীর প্রতি তাদের চাহিদা মেটাতে দায়বদ্ধ। এবং তার পরিবর্তে নিজেদের সামাজিক স্থান অনুযায়ী ফসলানা বা নির্দিষ্ট ঋতুতে নির্ধারিত হারে গ্রামীণ ফসলের অংশ পায়।[৮৬] কৃষিকাজে সহায়ক এই নিচু জাতরা গ্রামের উৎপন্নের কতটা অংশ পেত, তা নিয়ে সামান্য তথ্য পাওয়া যায়। রাজস্থান থেকে জানা যায় যে, উঁচুবর্ণের কৃষকরা রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় পেত। আবার, কৃষিকাজে অন্যকে সহায়তা করার জন্যে মজুররা অত্যন্ত কম আয় করত। ১৭৫২ ও ১৭৬০ সনে রাজস্থানের মলারানা ও টঙ্ক পরগনা থেকে যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে জানা যায়, কৃষিকাজে নিচুজাতির দিনমজুররা সাংবাৎসরিক মোট শস্যের মাত্র ০·৬ ও ০·৭ ভাগের অধিকারী ছিল।

আবার, গ্রামের কারিগরদের বেগার খাটতে হতো নানাভাবে। সময় সময় উচ্চশ্রেণীর কাছে, সময় সময় রাষ্ট্রের কাছে। অষ্টাদশ শতকের মহারাষ্ট্রে বিশেষ বিশেষ ধরনের কাজের সঙ্গে বিশেষ ধরনের নীতির বেগার খাটার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। মেরামত ও তৈরির কাজে বেগার খাটত ছুতোর ও রাজমিস্ত্রিরা অশ্বশালে এবং খুচরো কাজে বেগার দিত মহাররা।[৮৭]

এখন গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতিতে এরকম কাজের ভূমিকা আছে। তলার দিকে লোকদের জন্যে উদ্বৃত্ত সম্পদ কম থাকে। অথচ সেটা সবাইকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে। প্রত্যেককেই কাজ ও ধার্য নির্দিষ্ট করে দিলে নিম্নবর্ণ লোকেদের জীবনধারণের ন্যূনতম নিরাপত্তা থাকে। অন্যদিকে, পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতার বোধও জোরদার থাকে। প্রত্যেকেই সমাজের নিজের স্তরে থাকে এবং ঠিক তার উঁচু ও নিচু ধাপের সঙ্গে দেওয়া বা নেওয়ার সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। একদিকে থাকে শ্রম বিভাজন, অন্যদিকে থাকে সাধারণ সহযোগিতা। সীমিত উদ্বৃত্ত বণ্টনই এর ভিত্তি। এটাই যজমানি ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভূমিকাও আছে।

এই বর্ণব্যবস্থা বা সামাজিক চেতনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র ও ঘনরামের নগর-বর্ণনায় জাতির ক্রমানুসারে বসতির কথা বলা হয়েছে। গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণে মারাঠাদের আক্রমণে গ্রাম থেকে বিতাড়িত জনসাধারণের বর্ণনাও বর্ণের ক্রমানুসারে করা হয়েছে। সংস্কারমুক্ত তান্ত্রিক কুলাচারে ভৈরবীকে কতকগুলো নীচজাতির মেয়ে হতেই হতো। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা বৈষ্ণবরা জগতের চরম মুক্তির দিনে অংশীদার হিসেবে 'আচণ্ডাল' জন নিয়ে সমস্ত জাতিকেই আহ্বান করেছিলেন। তাই, সংস্কারবাদী আন্দোলনের প্রতিবাদী রূপেও প্রকারান্তরে বর্ণব্যবস্থার সামাজিক গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। ভারতীয় মুসলিমরাও এই বর্ণব্যবস্থার আওতার বাইরে থাকেনি। 'আজলাফ' ও 'আশরাফ' বলে মুসলিমদের মধ্যে নানা ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে এবং তাদের নিচুস্তরের মধ্যেও পীরদের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।[৮৮]

এখন এই ধরনের সামাজিক জগৎ বা চিন্তাধারার সঙ্গে কৃষি-অর্থনীতির সম্পর্ক কি ? কৃষি-অর্থনীতিতে পরিবর্তনের ফলে সামাজিক দ্বন্দ্বগুলো মাথাচাড়া দেবার সুযোগ পায়·· ক্রমে সেই দ্বন্দ্বগুলো স্তিমিত হয়ে পড়ে, তবে তাতে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হয় না। যজমানি ব্যবস্থার কেন্দ্রে সামাজিক সম্পর্কের কর্তৃত্বে গরীয়ান এক গোষ্ঠী থাকছে। তারাই সেই সম্পদ অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে নির্দিষ্ট কাজের ভিত্তিতে বণ্টন করার কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করত। সম্পদের মালিকানায় বদল হতেই পারে, কিন্তু তাতে গোটা কাঠামোর চরিত্র বদলায় না। কেবল এক গোষ্ঠী তার সামাজিক মর্যাদার ধাপটা পরিবর্তন করে মাত্র। ককতগুলো উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যেতে পারে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার গোপভূমে জঙ্গল হাসিল করে সদগোপরা গোরক্ষণ থেকে কৃষিকাজে মন দেয় এবং অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়। তখন মন্দির তৈরি করে ও জমি দিয়ে এই গোপরা তাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিয়োজিত করে এবং তারা 'নবশাখ' বলে

উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা পায়। মানভূমে দেখা যায়, উপজাতি ভূমিজরা কিভাবে ক্ষত্রিয় রাজার মর্যাদা দাবি করে বিবাহপদ্ধতি ও ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের দয়া-দাক্ষিণ্যের মাধ্যমে বর্ণব্যবস্থার তলার ধাপ থেকে উপরের ধাপে উঠে গেল।[৮৯] গুজরাটের নিদর্শন থেকে দেখা যায় যে, যে ভূণ শতকে বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনে ও বাণিজ্যে নিয়োজিত কিছু কিছু সম্পন্ন 'কুন ব' চাষীরা আস্তে আস্তে 'পাটিদার' নাম নিয়ে জমিদারি অধিকার দাবি করল এবং অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে রাজপুতদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তিতে পাল্লা দিয়ে বর্ণ ক্ষত্রিয়ের মর্যাদায় ভূষিত হলো।[৯০]

মহারাষ্ট্রে মারাঠা তথা ভোঁসলেদের স্থান বর্ণব্যবস্থায় খুব স্পষ্ট ছিল না। তারা সাধারণ কৃষক ছিল এবং তাদের জাতভাই কুনবিদের সঙ্গে তাদের সময় সময় নিচুজাত হিসেবেই চিহ্নিত করা হতো। আগেই বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে শিবাজী বেনারসের গর্গ ভট্টকে লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়ে অভিষেকে ক্ষত্রিয় হবার অনুমোদন আনিয়ে নিলেন এবং নিজেকে শিশোদীয় বংশধর বলে জাহির করতে লাগলেন।

এটাও লক্ষণীয় যে, শিবাজীর সঙ্গে যোগ ছিল রামদাসের। মহারাষ্ট্রের অন্যান্য সন্তরা সবাই সমাজের নিচুতলার মানুষ, তাঁদের প্রভাবও কারিগরদের ও বণিকদের মধ্যেই ছিল। বর্ণপ্রথা তাঁরা মানতেন না। কিন্তু রামদাস বর্ণপ্রথার অনুগামী ছিলেন, উপবীত ধারণও তাঁদের ভক্তদের মধ্যে চালু ছিল। তাই, জাতের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্যে শিবাজী স্বভাবতই রক্ষণশীল রামদাসের পৃষ্ঠপোষকতা পাবার চেষ্টা করলেন।

জাঠরা পাঞ্জাব ও দোয়াব অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ পশুপালক ছিল এবং জলচাকি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারা কি করে সম্পদশালী কৃষকে রূপান্তরিত হলো,—একথা আগেই বলা হয়েছে। এখন মথুরা অঞ্চলে জাঠরা রাজপুতদের কাছে অচ্ছুৎ ছিল। জাঠরা লাল কাপড়, পাগড়ি বা তাদের মেয়েরা নথ পরতে পারত না। জাঠদের মধ্যেও দুটো ভাগ ছিল—ক. দে-জাঠ, খ হেলে-জাঠ। দে-জাঠরা আরো নিচু ছিল এবং চূড়ামন দে-জাঠভুক্ত ছিল। ভরতপুরে ক্ষমতা স্থাপন করে চূড়ামনের উত্তরাধিকারী বদন সিং জাঠ 'ঠাকুর' উপাধি নেন। ঠাকুর সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের সম্মানসূচক। অন্যদিকে, তিনি যাদববংশ সম্ভূত ব্রজরাজ বলে নিজেকে দাবি করেন। তিনি হেলে-জাঠদের চিরশত্রু সওয়াই রাজা জয়সিংহের অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত থাকেন। মন্দির নির্মাণ ইত্যাদি কার্যাবলী ও হেলে-জাঠদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেও সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে বদন সিং কুণ্ঠিত হননি। এর ফলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হলো। হেলে-জাঠ বা মালেক-জাঠদের সঙ্গে রাজপুতদের শত্রুতাকে ব্যবহার করে দে-জাঠরা রাজপুতদের যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে ঈপ্সিত সামাজিক মর্যাদা লাভ করল। যেমন

নিচু জাতরা এতদিন ধরে যে-জাঠদের সমগোত্রীয় ছিল, তারাই এবার যে-জাঠদের সঙ্গে যজমানি সম্পর্কে গেল।[৯১] ঠাকুর বদন সিং-এর উত্তরসূরী সুরজমল রাজা উপাধি পান। 'বজ্জাত' চূড়ামন ও সামান্য 'গোকলা' থেকে রাজা সুরজমলে উত্তরণ সামাজিক বৃত্তের এক আবর্তন মাত্র।

সকলের ও সব রকমের পরিবর্তনের স্থান যে এই ব্যবস্থায় ছিল, তার প্রমাণ আছে। মুসলিমরাও এই সর্বব্যাপী বর্ণব্যবস্থায় অপাংক্তেয় নয়। তারা বিজেতা বা শাসক নয়, বরং হিন্দুসমাজের থেকে পৃথক অথচ পাশাপাশি বসবাসের ও সম্মানের উপযুক্ত একটি গোষ্ঠী। কালকেতুর গুজরাট পত্তনের গোড়াতেই মুকুন্দরাম মুসলিমদের আসার কথা এবং তাদের গোষ্ঠীর কথা বলেছেন।

"কলিঙ্গ নগর ছাড়ি প্রজা লয় ঘরবাড়ি
নানা জাতি বীরের নগরে।
বীরের লইয়া পান বৈসে যত মুসলমান
পশ্চিম দিগ বীর দিল তারে॥"

এরপরে মুসলিম বসবাসকারীদের নানাগোত্রে ভাগ করা হয়েছে এবং তারপর হিন্দুদের বসবাসের বিবরণ শুরু করা হয়েছে। এখানে মুসলিমদের কথা ব্রাহ্মণদের কথারও আগেই এসেছে। যেমন—

"নানা বৃত্তি করিয়া বসিল মুসলমান
সাবধান হইয়া শুন হিন্দুর উঠান।
... ...
পাইয়া বীরের পান বৈসে জত কুলস্থান।
বীরের নগরে বিপ্রগণ॥[৯২]

মারুদা গ্রাম স্থাপনের সময়েও মুসলমানদের অন্যান্য বর্ণের পাশাপাশি বসতি দেবার জন্যে ঠিক একইভাবে স্বতন্ত্র জায়গা ও গরুড়স্তম্ভ স্থাপনের উল্লেখ আছে। যেমন "এরপরে যবনদের রাজত্ব আসবে। সেজন্য গ্রামের উত্তরে এবং গরুড়স্তম্ভ ছাড়িয়ে একটি শূন্য অঞ্চল স্থাপন করা হলো। সেই শূন্য রাজ্যের পূর্বে এবং গরুড়স্তম্ভের পশ্চিমে যবনদের থাকবার জন্যে একটা জায়গা স্থির করা হলো।"[৯৩]

উপরে প্রদত্ত তথ্যগুলি আমাদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। বর্ণব্যবস্থা একটি সামাজিক কাঠামো হিসেবে একদিকে নির্দিষ্ট। আবার, অন্যদিকে খোলামেলা, এখানে ক্রম ও ধাপ বা ক্রমিক স্তর আছে। প্রত্যেকটি জাতি কৃষি-অর্থনীতিতে তার কাজ, তথা সামাজিক সম্পদ বণ্টনে তার নিয়ন্ত্রণ ও অংশ অনুযায়ী একটি ধাপে থাকে। সেই ধাপের উঁচু ও নিচু ক্রমে অবস্থিত সামাজিক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্দিষ্ট নিয়মকানুন অনুসারে চলে। এর মধ্যে পরিবর্তন আসে, নানা কারণে একটি গোষ্ঠী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নতুন ভূমিকা নেয়। সামাজিক

সম্পদের সৃষ্টি ও বণ্টনে তাঁর ভূমিকা সেই অনুসারে পাল্টায়। কিন্তু ঐ কাঠামোতে ঐসব অর্থনৈতিক, তথা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে নির্ধারিত গোষ্ঠীগুলোর নির্ধারিত ক্রম বদলে যায়; তলা থেকে উপরে যেতে কোনো বাধা থাকে না। সমাজের ধাপের এই গতিশীলতা গোটা কাঠামোকে আঘাত করে না, শুধুমাত্র গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক ক্রম অবস্থান বদলে নেয়। এককালের নিম্নবর্ণরা জাতে উঠে, পরবর্তীকালে অন্যান্য নিম্নবর্ণের ওপর একই-ভাবে খবরদারি করতে দ্বিধাবোধ করত না। গোটা কাঠামোর ভারসাম্যের বিরুদ্ধে উঠতি নিচু জাতদের ক্ষোভ দানা বাঁধে না। বরং তারা চেষ্টা করে কিভাবে যজমানি ব্যবস্থায় তারা নিজেরা লাভবান হবে। ফলে, নানা সামাজিক ক্রিয়াকলাপে তারা নিজেদের প্রতিপত্তি জাহির করে উচ্চবর্ণদের রীতিনীতি অনুসরণ করে এবং এতদিনের জাতভাই নিচুজাতিদের থেকে দূরে সরে যেত। শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিষ এভাবেই ঝরে যেত।

কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত সামাজিক সম্পদের অধিকারী হতে পারলে নিচুজাত উঁচু জাতের মর্যাদা পেয়ে যজমানি ব্যবস্থায় লাভ পেতে পারত। কারণ, তাতে করে গোটা কাঠামোর কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসত না। এই 'জাতে ওঠার' দরজা বন্ধ থাকলে সামাজিক পরিবর্তনের ধাক্কায় উঠে আসা কৃষিতে নতুন শক্তিশালী গোষ্ঠীরা গোটা ব্যবস্থাতেই একটা মৌলিক পরিবর্তনের দাবি করত। তা না হয়ে প্রত্যেকটি পরিবর্তনশীল গোষ্ঠীই সামাজিক মনোভাব ও অভীপ্সার দিক থেকে এই কাঠামোরই অঙ্গীভূত থেকে যায়।

এই কাঠামোয় আবার স্তর আছে, তার মধ্যে যোগাযোগ আছে। কিন্তু প্রত্যেকেই তার নিজস্ব কাজ বা দায়িত্ব পালন করে। উপরিউক্ত কাঠামোর এই ছবি মুঘল অর্থনীতির নানা খোপে বিভক্ত স্তরভেদ আবার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ছবিরই প্রতিফলন। এখানে স্বতন্ত্রতাও আছে, আবার স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে থাকছে পারস্পরিক যোগাযোগ—যা সেই স্বাতন্ত্র্যকেই জোরদার করে, কাঠামোকে বজায় রাখে।

৮

মুঘলযুগে কৃষক বিদ্রোহ

(একটি প্রাথমিক রূপরেখা)

প্রাক্-আওরঙ্গজেব আমলের প্রতিরোধ আন্দোলন॥ মুঘল আমলে কৃষক বিদ্রোহের অস্তিত্বের কথা বর্তমানে স্বীকৃত ঐতিহাসিক সত্য।[১] এর পটভূমিও আমরা আলোচনা করেছি। [দ্র. ৬ষ্ঠ অধ্যায়] কিন্তু এই বিদ্রোহগুলির চরিত্র এক ছিল না। স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী এর রূপ বিভিন্ন হয়েছে, শত্রু ও মিত্রের ধারণা বদলেছে এবং সংগঠন ও নেতৃত্ব পালটিয়েছে। এই বৈচিত্র্যকে বোঝা বা ব্যাখ্যা করার বোধহয় দরকার আছে। এই অংশে যে তার সমস্তটাই করা সম্ভব হবে, এরকম উচ্চাশা নেই। সব তথ্য এখনো সংগৃহীত হয়নি। ফারসি গ্রন্থ ছাড়াও আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত উপাদানগুলির ওপর দখল থাকা প্রয়োজন, যা বর্তমান লেখকের আয়ত্তের বাইরে। এখানে মাত্র ফারসি উপাদান থেকে সংগৃহীত সহজলভ্য তথ্যগুলোর ভিত্তিতে একটি রূপরেখা দেবার চেষ্টা করা হলো। এই বিষয়ে কাজ শুরু করার একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবেই রচনাটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

মনে রাখা দরকার যে, গোটা মুঘল আমল জুড়ে কৃষক বিদ্রোহ ও জমিদার বিদ্রোহ হয়েছে। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন : "বহু জায়গায় সমতলভূমি কাঁটা-ঝোপের দ্বারা এতদূর আবৃত যে পরগনার জনসাধারণ তাদের আশ্রয়ের জন্যে সেই বনের ওপর নির্ভরশীল হয় এবং সেই

দুর্ভেদ্য আশ্রয়ের ওপর ভরসা রেখেই বিদ্রোহ করে এবং রাজস্ব (মাল) দিতে অস্বীকার করে।"[২] তারিখ-ই-ফিরিস্তাতে অনুরূপ কথাই বলা হয়েছে। "হিন্দুস্তান বনে-জঙ্গলে পরিপূর্ণ, বৃক্ষ সমাবৃত। এই জঙ্গল এত বিস্তৃত যে তা সবসময় রাজা ও তার প্রজাদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করে থাকে"।[৩]

আকবরের সময় মুঘল রাষ্ট্রের প্রসার ও বিস্তৃতির যুগ। এ সময় প্রতিরোধ আন্দোলন তীব্র ছিল। হিন্দু সামন্ত ও জমিদাররা মুঘল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হতে বহু জায়গাতেই অনিচ্ছুক ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তারের প্রথম চাপটা তাদেরই সহ্য করতে হয়। ফলে, প্রথমদিকে তাদের বিদ্রোহের সংখ্যাই বেশি ছিল। সাম্প্রতিক এক আলোচনা অনুযায়ী, আকবরের ৫০ বছরের রাজত্বে এই জাতীয় সামন্ত বিদ্রোহ ২৯ বার হয়েছে। এর সঙ্গে যদি আমরা নতুন বিজিত প্রদেশে আফগান, গুজরাটি মুসলমান, আমির ইত্যাদি পুরনো সুবিধাভোগী শাসকশ্রেণীর বিদ্রোহ বিচার করি, তবে তার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৭৯টি ঘটনায়। অর্থাৎ মোট সংখ্যা হয় ১০৮টি। কিন্তু তাই বলে আকবরের রাজত্বে বিশুদ্ধ কৃষক-বিদ্রোহ যে একেবারে হয়নি, তা নয়। ১৫৬২ ও ১৫৭৭ সনে আগ্রার কৃষকরা হাঙ্গামা করে। ১৫৬২ সনে আগ্রার নিকটে সাকেৎ নামে এক জায়গায় ৮টি গ্রামের কৃষক (আথগড়) রাজকীয় সৈন্যের কাছে কয়েকজন অপরাধীকে সমর্পণ করতে অস্বীকৃত হয় এবং রাজকীয় বাহিনী তাদের অনুসন্ধানে গ্রামের ভেতর প্রবেশ করলে বাধা দেয়। আবুল ফজল এই গ্রামগুলির অধিবাসীদের গোড়া থেকেই কতকগুলি বাছা বাছা বিশেষণে ভূষিত করেছেন। সেগুলো হলো—টেঁটিয়া (সরকশি), চোর (দুজ্‌দি), লোকেদের ওপর জুলুমকারী (আদমকশি), নির্ভীক ও চরমভাবাপন্ন।

আকবর নিজে এই বিদ্রোহীদের দমন করেন। ১৫৭৭ সনে আগ্রার চিরবিদ্রোহী রায়তরা আবার হাঙ্গামা করে এবং কাশিম খান তাদের শায়েস্তা করেন। আগ্রায় সরাসরি কেন্দ্রীয় শাসন প্রথম থেকেই গেড়ে বসেছিল এবং তলার দিকে প্রসারিত হয়েছিল। ফলে, রাজস্ব আদায়ের কাঠামোর সঙ্গে এই অঞ্চলের কৃষকরা গোড়া থেকেই পরিচিত হয় এবং প্রতিরোধও এই অঞ্চলে দানা বাঁধে। এছাড়া, এই অঞ্চলের মেওয়াটি ও জাঠ কৃষকরা সুলতানি আমলেও অবিরাম বিদ্রোহ করে। বলবন, মহম্মদ-বিন তুঘলক বা সিকান্দার লোদি প্রত্যেককেই এই অঞ্চলের কৃষকদের মোকাবিলা করতে হয়, এবং ১৫০৬ সনে আগ্রায় দুর্গ নির্মাণ করার পেছনে কারণই ছিল—এই অঞ্চলের কৃষকদের নিয়ন্ত্রণ করা। সুতরাং গোটা মুঘল আমল জুড়ে এই অঞ্চলের কৃষকরা যে সুযোগ পেলেই বারবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, তাতে বিচিত্র কিছু নেই।[৪]

এটা লক্ষণীয় যে, অন্যান্য বিদ্রোহেও জনগণের একটা সমর্থন ছিল এবং মুঘলদের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে চাপা বিক্ষোভ কাজ করেছে। কাশ্মীরের

দৃষ্টান্ত দিয়েই এটা বোঝা যেতে পারে। ১৫৮৬ সনে চাক সুলতান ইয়াকুবকে কাশিম খান পরাস্ত করে কাশ্মীর দখল করেছেন। কিন্তু তাঁর শাসনের কঠোরতা গোটা কাশ্মীরবাসীকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। তিনি আগের বছরের রাজস্ব দাবি করলেন, যা কাশ্মীরের লোকেরা ভূতপূর্ব সুলতানকে দিয়েছিল। তাঁর অত্যাচার শীতকালটা কাশ্মীরের লোকেরা সহ্য করলেও গরমকালে বিদ্রোহ শুরু হয় (১৫৮৬ খ্রী.)। ইয়াকুব এই বিদ্রোহে যোগ দিয়ে আবার ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন। আরেকটি ব্যাপক লড়াই হয় ১৫৯২ সনে। দরবেশ আলি, ইয়াকুব, আদিল বেগ খান প্রমুখ চাক সামন্তরা বিদ্রোহ করলেও এর পেছনেও একটা গণবিক্ষোভ কাজ করেছিল।

কাশ্মীরে মোটামুটিভাবে উৎপন্ন শস্যে রাজস্ব দেওয়া হতো। প্রত্যেকটি গ্রাম থেকে গাধার পিঠ বোঝাই (খরওয়ার) আন্দাজ মতো ধান রাজকোষে পাঠানো হতো। (বেশুমারে অন হর দে রা চান্দ খরওয়ার শালি আন্দাজে গেরেফতেআন্দ)। এখন আকবরের সময় কাশ্মীরে ভূমিরাজস্ব পরিমাপ করার একটি ব্যবস্থা হয়। এখন দেখা যায় যে, করের হারের সঙ্গে প্রকৃত উৎপাদনের কোনো যোগাযোগ নেই এবং শস্যপিছু রাজস্বের হারের চেয়ে অনেক বেশি হারে কর সংগ্রহ করা হতো। আকবর গোটা রাজস্ব ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং আগের ২০ লক্ষ খরওয়ার শালির জায়গায় আরো মাত্র ২ লক্ষ বৃদ্ধি করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার রাজস্বের হার বেড়ে গিয়ে হয় ৩০ লক্ষ খরওয়ার শালি। দ্বিতীয়ত—এই রাজস্ব বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল রেখে জায়গিরদাররা টাকায় রাজস্ব দাবি করতে লাগলেন। এর ফলে রায়তদের অসুবিধার অন্ত রইল না। আবার, কাশ্মীরেও বোধহয় সৈন্যদের নিষ্কর ভূমির মাধ্যমেই বেতন দেওয়া হতো। কারণ আবুল ফজল স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন, কাশ্মীরের কৃষকদের অনেকেই সৈন্য (বরজগার বেসিয়র সিপাহি)। ফলে, এই সাধারণ বিক্ষোভকে অস্ত্রধারী রাইয়ৎ ও ভূতপূর্ব সামন্তরা সহজেই কাজে লাগালো। আকবরের কাশ্মীরে উপস্থিতির সময়েই এই বিক্ষোভ ফেটে পড়ে এবং কাজি নুরুল্লা সারা কাশ্মীরে বিক্ষুব্ধ লোকদের (না সাজগারি মরদুম) অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন। বিদ্রোহের চাপে আকবর তাঁর রাজত্বের ৪২-তম বছরে (১৫৯৮ খ্রী.) টাকায় রাজস্ব নেওয়ার নীতি খারিজ করে দেন।[৫] এই বিদ্রোহে একাধারে রাজস্বের হারের তীব্রতা এবং অন্যদিকে সীমান্ত অঞ্চলের রাজ্যকে এক কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অঙ্গীভূত করার সমস্যা—দুটোই কাজ করেছিল।

জাহাঙ্গিরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি'-তে এরকম বিক্ষিপ্ত উদাহরণ প্রচুর ছড়িয়ে আছে। ১৬১০ সনে আগ্রায় কৃষকদের হাঙ্গামা দমনের জন্যে মুয়াজ্জম খানকে পাঠানো হচ্ছে। ১৬১২ সনে খাট্টায় কৃষক-বিদ্রোহ দমনের জন্যে

আবদুর রজ্জাককে পাঠানো হচ্ছে। ১৬১১ সনে কনৌজ ও কালপির কৃষক-বিদ্রোহ দমন করছেন আবদুর রহিম খান-ই খানান। এসব বিক্ষিপ্ত হাঙ্গামা ঘনঘন হয়েছে এবং জাহাঙ্গির এগুলোর সম্পর্কে মাত্র একছত্র করে লিখেছেন; এতে মনে হয় যে, এরকম প্রতিরোধ নিত্যকার ব্যাপার ছিল। ১৬১০ সনে অবশ্য কুতব খান নামে এক দরবেশের পোশাকধারী লোক পাটনার নিম্নবর্ণ ও নিচুকাজ করা লোকেদের নিয়ে শহর কয়েকদিন দখল করে থাকে এবং নিজেকে জাহাঙ্গিরের বিদ্রোহী পুত্র খসরু খান বলে প্রচার করতে থাকে। নির্মম হস্তে সেই বিদ্রোহ দমন করা হয়।

শাহজাহানের আমলে মির্জা রাজা জয়সিংহ উচ্চপদস্থ ও বিশ্বস্ত মনসবদার ছিলেন। তিনি সামান্য ফৌজদার বা সিপাহসালার ছিলেন না। অথচ সম্রাট ১৬৩০-৪০ সনের মধ্যে যে নির্দেশনামা পাঠিয়েছেন তার অধিকাংশই হচ্ছে রাজস্থানের বিভিন্ন খালিসা মহলে বিদ্রোহী ও কর প্রদানে অনিচ্ছুক রায়তদের কাছ থেকে বলপ্রয়োগে কর আদায় করা। জয়সিংহের মতো মনসবদারের কাছেও এটা সাধারণ নৈমিত্তিক কর্তব্য ছিল।

কৃষক-বিদ্রোহের প্রতি মুঘল রাজশক্তির প্রতিক্রিয়া আমরা এই আমলের একটি চিঠিতে দেখাতে পারি। চিঠিটি মুনশির কাছে 'আদর্শ' স্থানীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। ফলে আমরা মুঘল আমলের প্রতি ঘটনাকে স্বাভাবিক বলেই বিচার করতে পারি। চিঠিটি জাহাঙ্গিরের আমলে কোনো এক সেনানায়কের প্রতিবেদন :

"আহমেদাবাদ জেলার বিদ্রোহীদের শাসন ও দমনের জন্যে আমি বিদ্রোহীদের গ্রাম আক্রমণ করলাম। জায়গিরদারদের কর্মচারিদের বিবরণ অনুযায়ী তারা তিন বছর ধরে তাদের রাজস্ব দেয়নি···এবং বিদ্রোহী হয়েছে। যখন বিদ্রোহীরা এই বিনীত দাসের আসার কথা শুনল তৎক্ষণাৎ তারা জমায়েৎ হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিল এবং শত্রুর আগমনের পথে মোতায়েন রইল। এই সংবাদ পেয়ে আপনার বিনীত দাস সব জায়গা থেকে জঙ্গল পরিষ্কার করার লোকদের ডেকে পাঠিয়ে জঙ্গল কাটাতে শুরু করল। যদিও জঙ্গলে আশ্রিত এইসব অপরিণামদর্শী (কুতে আন্দিশে) সমাজবিরোধীরা তাদের আগ্নেয়াস্ত্র ও তীর ব্যবহারে (তোফানগ্ আন্দাজি ওয়া তীরবাজি) বিরত ছিল না, তথাপি যখন সৈন্যবাহিনীর বীররা তাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল তখন গ্রামবাসীরা হতাশ হয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো। প্রচণ্ড লড়াই জঙ্গে আজিম) শুরু হলো। মনসবদারদের দেড়শ-জন শহিদ হবার মর্যাদা পেল।··· অবিবেচক গ্রামবাসীদের প্রায় এক হাজার জন তীর ও তরবারির দ্বারা নিহত হয়ে জাহান্নমে গেল।···সকালে রাজকর্মচারিরা ঘোড়ায় চড়ে বিদ্রোহীদের গ্রামে গেল। জঙ্গলের মধ্যে দুর্গ বিশিষ্ট বড় গ্রাম সেলিমপুরে এই বিদ্রোহীরা পরিবার

ও শিশুসমেত জমায়েৎ হয়েছিল। যদিও এরা জোর লড়াই চালাল, ঘোড়-সওয়াররা শেষ পর্যন্ত গ্রামে প্রবেশ করল ও গ্রাম আগুনে জ্বালিয়ে দিল। তারপর তাদের মেয়ে ও শিশুদের বন্দী করে ও তাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে আমি সবকিছু জায়গিরদারদের কর্মচারিদের হাতে দিয়ে দিলাম। আমি তাদের হাতে গ্রামের প্রধানদের (সরদারান) ভারও অর্পণ করলাম যাতে করে তারা তিন বছরের রাজস্ব পায়।"[৬]

বিদ্রোহ, বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ ও তার মোকাবিলায় মুঘল সৈন্যের ব্যবহার এই চিঠিতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর আত্মজীবনীতে জাহাঙ্গির অনুরূপ একটি বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "এই সময় আমি সংবাদ পেলাম, যমুনা নদীর অপর পারের গ্রামবাসী ও কৃষকেরা (গানওয়ারান ওয়া মুজারিয়ান) অবিরত রাহাজানি ও ডাকাতিতে নিয়োজিত হয়েছে এবং দুর্গম গড়ের গভীর জঙ্গলের (দর পনাহে জঙ্গলহ) আশ্রয়ে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে এবং জায়গিরদারের নির্ধারিত রাজস্ব তারা দেয় না। (মাল ওয়াজিব ব জায়গিরদারান নমিদেহান্দ)। আমি খান-ই-জাহানকে কিছু উচ্চপদস্থ মনসবদার নিতে বললাম এবং তাকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করার আদেশ দিলাম যাতে করে হত্যা, বন্দী ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে (কোতল ওয়া বনদ ওয়া তরাজ) মাধ্যমে তাদের দুর্গ ধূলায় মিশিয়ে দেওয়া যায়।...যেহেতু গ্রাম-বাসীদের পালিয়ে যাবার সুযোগ ছিল না, তারা মুখোমুখি যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে বাধ্য হলো। তাদের অনেককে হত্যা করা হলো, মেয়ে ও শিশুদের দাস করা হলো এবং বিজয়ী সৈন্যরা প্রচুর লুঠের মাল পেল।"[৭]

এই বিদ্রোহগুলো শুধুমাত্র অত্যধিক রাজস্ব সংগ্রহ করার বিপক্ষে হতো তা নয়। নানা কারণে তা হতে পারে। জাহাঙ্গিরের আমলে পূর্বাঞ্চলে দুটো বিদ্রোহের কাহিনী দিয়ে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।[৮] এসময় মুঘলরা পূর্ব-ভারতে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করছিল এবং গোটা কুচবিহার ও আসাম সীমান্ত জুড়ে তাদের বিরুদ্ধে অহরহ কৃষক বিদ্রোহ হতে থাকে। এরকম একটা বিদ্রোহের নেতা ছিলেন পাইক সর্দার সনাতন। এই বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল খুন্তাঘাট (ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে ও বর্তমান গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত ছিল) এবং বিদ্রোহ কামরূপ পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল।

নতুন রাজ্য জয় করেই রাজস্ব সংগ্রহের জন্যে এইসব অঞ্চলে 'ক্রোরি'কে নিয়োজিত করা হলো। তমসুকের বিনিময়ে কিছু অঞ্চলে 'মুস্তাজির' বা ইজারা-দারদেরও পাঠানো হলো। (খতে কবুলাৎ গেরেফতে অন্ পরগনাৎ রা ব মুসতাজিরন সোপরদ্)। এদের অত্যাচারে গোটা অঞ্চলে ত্রাহি-ত্রাহি রব উঠল। খুন্তাঘাট পরগনার ক্রোরি জামান তব্রিজি কৃষকদের ওপর অত্যাচার করতে লাগলেন এবং তাদের সুন্দরী স্ত্রীদের নিজের হারেমে পুরতে লাগলেন।

রায়তরা তাদের ভিহিদারদের বিষ খাইয়ে হত্যা করতে লাগল। রায়তদের চক্রান্তে পরপর কয়েকজন ক্রোরি ও মুস্তাজির মৃত্যুবরণ করল। কামরূপে মীর সফি সমস্ত পরগনার রাজস্ব আদায় বাড়িয়ে দিলেন এবং ধনুর্ধর সৈন্য বা পাইকদের 'বৃত্তি-ভুক্ত' জমিকেও রায়তি স্বত্বের আওতায় এনে তার ওপর রাজস্ব ধার্য করলেন। কোনো কোনো অংশে তিনি মুস্তাজিরদেরও বসিয়ে দিলেন। এই মুস্তাজিররা নিজেদের লাভের (বদৌলৎ খহাযি) জন্যে রাজস্ব আরো বাড়াবার কথা ভাবতে লাগল। ফলে, পাইক ও রায়তদের মধ্যে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল।[৯] মীর সফি ও পরবর্তীকালে শেখ ইব্রাহিম এদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করলেন না। শেখ ইব্রাহিম এই সময়ে আত্মসাতের মাধ্যমে নিজের সম্পদ প্রায় ৭ লক্ষ টাকায় বাড়িয়ে নিয়েছিলেন।

কুচবিহার রাজবংশের প্রতি মীর সফির দুর্ব্যবহার আগুনে ঘৃতাহুতি দিল এবং খুন্তাঘাটে বিদ্রোহ শুরু হলো। ১৬১৫-১৬ সনে কৃষকেরা ক্রোরি ও মুস্তাজিরদের হত্যা করল। কোচ সামন্তরা তাদের সঙ্গে যোগ দিল। মুঘল সেনানায়ক আলামা বেগ সসৈন্যে নিহত হলেন এবং বিদ্রোহীরা রাঙামাটি পর্যন্ত দখল করল। একজন কোচবংশীয় অভিজাত রাজা বলে স্বীকৃত হলেন এবং মুঘল কর্তৃত্ব ঐ অঞ্চলে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সামন্তদের বিশ্বাস-ঘাতকতায় এবং মির্জা চাতুর্যে চতুরতায় এই বিদ্রোহ দমন হলো। কিন্তু এই বিদ্রোহের নতুন রাজা বন্দী হলেও কৃষকরা খুন্তাঘাটে বর্ষাকালে, বা মির্জা নাথন সরে গেলেই বারবার মাথা চাড়া দিয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গেই কোচ পাইক সর্দার সনাতন কামরূপে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং মুঘল ক্রোরিদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। তাঁদের অভিযোগ: "ক্রোরি আমাদের শুধুমাত্র দুর্দশাগ্রস্ত করেনি, সে আমাদের পরিবারের সুন্দরী ও সুশ্রী মেয়ে ও ছেলেদের নিয়ে যায় এবং এটা সে করতেই থাকে।"[১০]

মির্জা নাথনের নেতৃত্বে মুঘল সৈন্যবাহিনী এই পাইক সর্দার সনাতন ও তার সমবেত কোচ কৃষকদের কিছুই করতে পারে না, এবং তাদের দুর্গ ধমধমা দখল করতে ব্যর্থ হয়। মির্জা নাথন শান্তি প্রস্তাব পাঠান ও বলে পাঠান যে অত্যাচারী ক্রোরিকে পদচ্যুত করা হবে। সনাতন এর প্রত্যুত্তরে একটি দীর্ঘ জবাব দেন। কৃষক-বিদ্রোহের নেতার জবাব মির্জা নাথনের রচনায় সুরক্ষিত হয়েছে এবং সেদিক থেকে এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এর প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া গেল:

"এই দেশে যে অত্যাচার হয়েছে তা আপনাকে জানানো হয়েছে। এখন রাজস্ব পাঠাবার দিকে মনোযোগ দেবার মতো ক্ষমতা বা সামর্থ্য রায়তদের নেই। সুতরাং আপনার আগমন কি করে আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে? আমাদের দু'জন মহান নৃপতি সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করেছেন এবং লক্ষ ও

কোটি টাকা দিয়েছেন। তাঁরা এমন কি উপকার পেয়েছেন যেটাকে আমি সুবিধা বলে মনে করতে পারি? যাহোক আমি নিম্নলিখিত চুক্তিতে একমত। প্রথমত —শেখ ইব্রাহিমকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে; দ্বিতীয়ত—পুরো এক বছরের জন্যে খাজনা মাফ করতে হবে (ইয়েক সাল দরসথ আজ মুতালেবে মালগুজারি না ফরমান্দ); তৃতীয়ত—মুঘল সৈন্যকে গিলাহানয় পর্যন্ত পিছু হঠতে হবে; চতুর্থত—পাইকদের বৃত্তি তাদের সরাসরি দিতে হবে এবং সরকারি দেয় রাজস্বের খাতে সেগুলোকে যোগ করা চলবে না। (মজুরারি পাইকানেজা দাখিল জমা না কারদে)।"[১১]

মির্জা নাথন প্রথম শর্ত মানলেও শেষ শর্তগুলো মানলেন না। ফলে, সনাতন প্রতিরোধ চালালেন। দুর্গের উপর সরাসরি আক্রমণ কৃষক যোদ্ধা বা পাইকরা বারবার ব্যর্থ করল। ফলে, মির্জা নাথন আশেপাশের গ্রামগুলো পুড়িয়ে দিলেন যাতে করে নামমাত্র খাদ্যও দুর্গে সরবরাহ না হতে পারে।[১২] এইভাবে দুর্গ দখল করা হলো এবং সনাতন শেষ পর্যন্ত দুর্গ ছেড়ে পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে গেলেন।

হাতিখেদা অধিকার নিয়ে দ্বিতীয় কৃষক-বিদ্রোহ শুরু হয় ১৬২১ সনে। এরও কেন্দ্রস্থল খুন্তাঘাট। আসামের জঙ্গলে যুদ্ধের উপকরণ বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ও পার্বত্য দুর্গ দখল করার জন্যে হাতি অপরিহার্য ছিল। এই অঞ্চলে মুঘল সৈন্যকে হাতি ধরায় সাহায্য করা রায়তদের একটি কর্তব্য ছিল। হাতিকে বিশেষভাবে একটি অঞ্চলে বেড় দিয়ে আটকে রাখার জন্যে দরকার ছিল 'পালি'দের, আর হাতিকে তাড়িয়ে সেখানে আনবার জন্যে দরকার ছিল 'ঘরদুয়ারি' পাইকদের। এইসব ঘরদুয়ারি পাইকদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসার জন্যে কর্মচারিদের বিশেষ নির্দেশনামা দিয়ে পাঠানো হতো।[১৩] স্বভাবতই ঐসব নির্দেশ রায়তদের নিজস্ব কৃষিকাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করত।

বকির খান নামে এক মুঘল রাজকর্মচারি ঐ অঞ্চলের রায়তদের নিয়ে হাতিদের একটি ঘেরা জায়গায় আটকে রাখে। যখন এই হাতিদের বন্দী করা হবে, তখন কিছু হাতি পালিয়ে যায়। ফলে, পালি রায়ত ও ঘরদুয়ারি রায়তদের মধ্যে কিছু হাতিখেদা সর্দারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং বাকি লোকদের চাবুক মারা হয়। বকির খান হাতিখেদা রায়তদের ওপর হুকুম দেয় "হয় পালিয়ে-যাওয়া হাতিদের ধরে নিয়ে এসো, নতুবা প্রত্যেকটি হাতির জন্যে হাজার টাকা (হর ফিলি হাজার রূপয়ে) করে দাও।" এবং তারই ফলস্বরূপ শুরু হয় বিদ্রোহ। মির্জা নাথনের ভাষায়: "এই সমস্ত অসন্তুষ্ট লোকেরা তার বিরুদ্ধে গোটা অঞ্চলের জনসাধারণকে খেপিয়ে তুলল এবং রাত্রিতে আক্রমণ করল। বকির খানকে জ্যান্ত ধরা হলো (বকির রা জিনদে গেরেফতে) ও দু-টুকরো করে কাটা হলো। তার সৈন্যবাহিনীর যারাই জড়াহ করেছিল তাদের প্রত্যেককে মেরে ফেলা হলো। বাকিদের বন্দী করা হলো এবং সমস্ত রাজকীয় হাতিদের

বাজেয়াপ্ত করা হলো। হাতিখেদা একজন সর্দারকে তারা নিজেদের রাজা বলে ঘোষণা করে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করল (ইয়েকি আজ সরদারানে ফিলগির রা ব রাজগি বরদাশতে) এবং এক বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হলো।"[১৪] রাজা পরীক্ষিতের ভাই কোচ সামন্ত ভাবা সিংহও এই বিদ্রোহে যুক্ত ছিলেন। মির্জা নাথনের হিন্দু অনুচর বলভদ্রের অত্যাচারে নিপীড়িত রায়তদের এই বিদ্রোহে যোগদান আন্দোলনকে ব্যাপক রূপ দিল। নাথন আবার বহু চেষ্টায় এই বিদ্রোহ দমন করলেন। এই বিদ্রোহ নিছক নিম্নবর্ণের সাধারণ লোকেদের দ্বারা হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মির্জা নাথনের প্রতি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের কথায় "কেবলমাত্র একদল জেলে (মেছুয়া) ছাড়া তুমি কোনো বিদ্রোহীদের দমন করেছ? তারাই গোয়ালপাড়ায় একটি কেল্লা তৈরি করেছিল।"[১৫]

এখন এই বিদ্রোহ দুটোকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রথমত—বিদ্রোহের এলাকা এক, যদিও কারণগুলো একটু আলাদা। প্রথম বিদ্রোহের ক্ষেত্রে রায়তদের ওপর মুঘল রাজকর্মচারিদের রাজস্ব আদায়ের জন্যে জুলুম সংঘর্ষের মূল কারণ ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে জুটেছিল অন্য ধরনের বিশেষ অনুযোগ। 'পাইক'রা একাধারে সৈনিক ও কৃষক। সামন্ত প্রভুদের যুদ্ধের সময় সাহায্য করার জন্যে বা সীমান্ত অঞ্চল পাহারা দেওয়ার জন্যে এরা বিনা রাজস্বে 'পাইকান' বা 'চাকরান' বলে চাষযোগ্য ভূমি ভোগ করত। এরা আসলে এই অঞ্চলে জমি ভোগ করার পরিবর্তে যুদ্ধের সময় শ্রম দিত। অর্থাৎ কুচবিহার ও আসাম অঞ্চলে অর্থের পরিবর্তে শ্রমের মাধ্যমে রাজস্ব দেওয়া চালু ছিল এবং তার পরিবর্তে জমি দেওয়া হতো। পরবর্তীকালে গৌরীপুর জমিদারির ১৬৭৬ সনের মুঘল সনদ ও শিহাবুদ্দিন তালিশের 'ফতিয়া-ই-ইব্রিয়া'র সাক্ষ্য, গোয়ালপাড়া ও কামরূপে এই জাতীয় সেবার পরিবর্তে জমির স্বত্বভোগের প্রথার ব্যাপক প্রচলনের ইঙ্গিত দেয়। ১৬৯৭ সনের দলিলে রাজা রূপনারায়ণ ভূপের আমলে 'লস্করগণের বেরোজগারে খাটা' এবং তার পরিবর্তে জমি পাবার উল্লেখ আছে।[১৬] কুচ রাজপরিবারের বংশাবলী ও চিলা রায় কর্তৃক নির্মিত মন্দিরের শিলালিপি থেকে জানা যায়, সেবার জন্যে নানা ধরনের লোককে বিনা রাজস্বে পাইকান' জমি দেওয়া হতো। তারা তার পরিবর্তে নানা ধরনের কাজ করে দিত। মন্দিরের ১৪০টি সেবায়েৎ পরিবারকে জমি দেওয়া হয়েছিল—যার মধ্যে কামার, কুমোর, তাঁতি, ভাট, মালি ইত্যাদি পরিবারও ছিল।[১৭]

শাহজাহানের আমলের সরকারি ইতিহাসে লেখা হয়েছে—"এদের রাজার হুকুমে জায়গির দেওয়া হয়। এই সৈন্যদের পাইক বলা হয়···জীবিকা নির্বাহের জন্যে এরা চাষবাসে (ব জিরায়ৎ) নিয়োজিত থাকে এবং হাতিধরা ও খেদার কাজেও থাকে।"[১৮] ফতিয়া-ই-ইব্রিয়াতে এই অঞ্চলের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে একই কথা বলা হয়েছে। "এই অঞ্চলের কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা নেওয়া

(খেরাজ আজ রাইয়া) রীতি (দাব) নয়। প্রত্যেকটি বাড়ি থেকে তিনজন পিছু ১জন করে লোক রাজার সেবার জন্যে আনা হয়। (আজ হর খনে কি সে নফর এয়েক নফর ব খিদমতে রাজে মুমায়িদ)।[১১] কোচ ও আহোম রাজত্বে তাই এই পাইক-ব্যবস্থা কৃষি-অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছিল। উচ্চপদস্থ কর্মচারি, দাস ও পুরোহিত ব্যতীত সকল কর্মক্ষম পুরুষকেই 'গোতের' মাধ্যমে পাইক-ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়। একজন করে এক বছরের জন্যে রাজকাজ করবে ও বাকিরা তার জমিজায়গা দেখবে, এবং এইভাবে এক বছরের জন্যে সবাইকেই ক্রমানুসারে পাইক হতে হবে। তাই, রায়তরাই ঘুরে ফিরে পাইকের কাজ করত।

যেহেতু সৈন্য সংগ্রহের জন্যে মুঘলদের মনসবদারি ব্যবস্থা ছিল এবং যেহেতু মুঘলরা সরাসরি অর্থে রাজস্ব আদায়ের দিকে জোর দিত, তাই এই ধরনের ব্যবস্থা মুঘলরা বদলাতে চাইল। ফলে, পাইক ও তাদের সর্দার বা যারা যুদ্ধের সময় তাদের নেতা ছিল, তাদের স্বার্থে আঘাত লাগল। বিনা রাজস্বে উপভোগ্য চাকরান ভূমির জন্যে এখন ফসলে বা নগদে কর দিতে হবে। এছাড়া, ইজারাদাররা সেই হারকে বাড়িয়ে দিল। এগিয়ে থাকা রাজস্ব-ব্যবস্থা ও কেন্দ্রীভূত সামরিক ব্যবস্থার সঙ্গে পিছিয়ে থাকা রাজস্ব-ব্যবস্থা ও বিকেন্দ্রিক স্থানীয় ক্ষমতার সংঘর্ষ বাধল। সনাতন তাঁর চিঠিতে সরাসরি রায়তদের পক্ষে কথা বলেছেন। মুঘল শাসনব্যবস্থা তাঁদের কোনো উপকারেই লাগেনি। রাজস্ব বৃদ্ধি হয়েছে ; ক্রোরির অত্যাচারে প্রজারা পরিবার হারিয়েছে, এতদিনের প্রথা ভেঙে পাইকদের জমির ওপর করধার্য হয়েছে এবং ইজারাদাররা রাজস্ব সংগ্রহ করেছে। সনাতন তাই দাবি করলেন, রাজস্ব মকুবের ও পাইকদের জমিকে খাজনার আওতায় না আনার। অবশ্যই এই দাবির সঙ্গে মুঘল রাজনীতির বিপুল রাজস্ব আদায়ের নীতি খাপ খেল না।

সাধারণ রায়ত ও পাইকরা, বা যারা নিজেরা একাধারে রায়ত ও সৈন্য, —তারা বিদ্রোহ করল। যেহেতু পাইকরা যুদ্ধে অভ্যস্ত ও সশস্ত্র ছিল, তাই তাদের সর্দাররাই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিল। গ্রামাঞ্চলে যে তাদের ব্যাপক সমর্থন ছিল, তারও প্রমাণ নাথনের রচনায় পাওয়া যায়। আশেপাশের গ্রাম থেকে রায়তরা সনাতনকে নিয়মিত খাদ্য দিত। মির্জা নাথনকে দু'দিন ধরে সেই গ্রামগুলো ধ্বংস করতে হয় এবং প্রায় দু-হাজারেরও বেশি খাদ্য সরবরাহকারীকে বন্দী ও হত্যা করতে হয়। তৃতীয়ত—খুন্তাঘাটের বিদ্রোহে সদ্য-রাজ্যচ্যুত কোচ সামন্তদের একটা ভূমিকা ছিল, যদিও নাথন যেভাবে বর্ণনা করেছেন—তাতে মনে হয় যে, রাজস্ব সংগ্রহকারীদের ওপর কৃষকদের আক্রোশই বিদ্রোহের প্রধান দিক ছিল।

দুর্গাদাস রচিত বংশাবলীতে কোচ সামন্তদের সঙ্গে নৃপতির 'তাজাকি

প্রতিজ্ঞাপত্রে'র উল্লেখ আছে। কোচ সামন্তরা নরনারায়ণের কাছ থেকে এলাকার অধিকারের বিনিময়ে নৃপতির কাছে বংশানুক্রমিক আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ('আমার বংশক তব বংশ নাহি ছাড়ে')। ফলে, বিদ্রোহে রাজার সঙ্গে তাঁর সামন্তদের জমায়েতের সূত্র সামন্ততান্ত্রিক আনুগত্যের ধারণায় বিধৃত ছিল।

অতএব এই আঞ্চলিক বিদ্রোহে ৩টি ধারা এসে মিলেছে। যথা—ক. সাধারণ রায়তদের বিক্ষোভ, খ. পাইক বা এক বিশেষ শ্রেণীর রায়ত ও যোদ্ধাদের বিক্ষোভ, গ. কোচ সামন্তদের বিক্ষোভ। কামরূপে সশস্ত্র রায়তদের অস্তিত্ব ও নেতৃত্ব বিদ্রোহকে দীর্ঘকালীন প্রতিরোধে রূপান্তরিত করেছিল ও ব্যাপক জনসমর্থন পেয়েছিল। মুঘল রাষ্ট্রশক্তি একটা পর্যায়ে আগ বাড়িয়ে কিছু শান্তির প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু খুন্তাঘাট অঞ্চলে সামন্তদের বিশ্বাসঘাতকতা বিদ্রোহের আগুনকে অতটা প্রসারিত হতে দেয়নি।

খুন্তাঘাটের দ্বিতীয় বিদ্রোহ হয়েছিল কিন্তু হাতি ধরার অধিকার নিয়ে। এখানে 'হাতিখেদা'য় সিদ্ধহস্ত রায়তরা বিদ্রোহ করে এবং তাদের সঙ্গে হাত মেলায় অন্যান্য নিপীড়িত রায়তরা। এরা অত্যন্ত 'নিচুজাতের' লোক এবং এদের নেতৃত্ব দেয় এদেরই একজন সর্দার। সম্পূর্ণ নিচু ও অবহেলিত চাষীদের বিদ্রোহ হিসেবেই এটাকে চিহ্নিত করা যায়। এই বিদ্রোহেও আমরা একজন কোচ সামন্তের নাম পাই, কিন্তু তার ভূমিকা আদৌ স্পষ্ট নয়। মনে হয়, নেতৃত্বের উৎস ছিল নিচুতলার রায়তের হাতেই, উচ্চতর গোষ্ঠীর কাছে নয়। তবে, হাতি-খেদায় এক শ্রেণীর রায়তরাই বিশেষত্ব অর্জন করত। তাদের মধ্যে একটা পেশাগত ঐক্য বা সামাজিক বন্ধন থাকা অসম্ভব নয়। সেই সংহতির জন্যেই তারা হয়তো এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হয়। কারণ, এই হাতিখেদায় নিয়োজিত রায়তরা যে বিশেষ পেশায় দক্ষ এবং তারাই যে সাধারণ লোকেদের খেপিয়ে তোলায় অগ্রণী ভূমিকা নেয়—এ আভাস নাথনের রচনায় স্পষ্ট। এখানকার বিক্ষোভের ধারা দুটি—ক. 'ঘরদুয়ারি' পাইক ও 'পালি' পাইকদের বিক্ষোভ, খ. সাধারণ কৃষকদের বিক্ষোভ।

প্রভেদের কথা মনে রেখেও দুটি সাধারণ প্রবণতা দুটো বিদ্রোহেই লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত—মুঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে কৃষকদের অবিরাম প্রতিরোধ। অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় বা হাতি ধরার অধিকার নিয়ে বিরোধ, যে কারণেই হোক-না কেন,—বিদ্রোহ দমনের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে একই অঞ্চলের কৃষকরা বারবার প্রতিরোধ করেছে। দ্বিতীয়ত—কৃষকরাই প্রধানত এই বিদ্রোহগুলির নেতা। কিন্তু কৃষকদের মধ্যেই স্তরভেদ আছে। তাই, যারা একটি বিশেষ পেশায় নিয়োজিত ও বিশেষীকরণের দিকে এগিয়ে গেছে—তারাই এই বিদ্রোহের সামনের সারিতে এসেছে বলে মনে হয়। যেমন এসেছে সনাতনের বিদ্রোহে

যোদ্ধা পাইকরা বা হাতিখেদায় ঘরদুয়ারি ও পালি পাইকরা।

এই দুটি বিদ্রোহের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কথাও মনে রাখা দরকার। এই দুটি বিদ্রোহই বাংলা ও আসাম সীমান্ত অঞ্চলে দেখা দেয়। মুঘলরা তখন সবেমাত্র এই অঞ্চল জয় করেছে। আবার, এই অঞ্চলের রাজস্ব-ব্যবস্থা ও সামাজিক শক্তির অবস্থানের সঙ্গে উত্তর-ভারতের সমাজ ও রাজস্ব-ব্যবস্থার ফারাক যথেষ্ট ছিল। সংখ্যায় উপজাতিদের ব্যাপক উপস্থিতি এই অঞ্চলের অবস্থাকে আরো জটিল করে। ফলে, মুঘল শাসনব্যবস্থার পক্ষে এই অঞ্চলে গেড়ে বসা ততটা সহজ ছিল না, বা স্থানীয় শক্তিদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে সময় লাগত। ফলে, এই অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মুঘলশক্তির বিরুদ্ধে কৃষকদের ঘন ঘন ব্যাপক বিদ্রোহ তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল।

বস্তুত, এই অঞ্চলে রায়তদের বিক্ষোভ সব সময়েই ছিল এবং সুযোগ পেলেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। বলভদ্র দাসের সময়ে পুটামারির রায়তরা মুঘলদের খাজনা দিতে অস্বীকার করে। ক্ষত্রিবাগের রায়তরা বন্যার প্রকোপে খাজনা দিতে চায়নি। পরে স্থানীয় জমিদারদের সহায়তায় তাদের দমন করা হয়। কেন্দুগিরি ও বদানত্রা গ্রামে মুঘল সৈন্যের রসদ সংগ্রহের জন্যে যখন বণিকরা যায়, তখন রায়তরা তাদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে।[২০] মির্জা নাথন 'সিতাব খান' উপাধি পাবার পর হাতিখেদার কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে পাইক-সর্দারদের বেত্রাঘাত করেন। ফলে, পাইকদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং যেকোনো সময়ে আরেকটি ব্যাপক বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তখন খাজা সাদাৎ খান বলে আরেকজন রাজকর্মচারি বেগতিক বুঝে সর্দারদের ছেড়ে দেন এবং হাতিখেদা পাইকদের সর্দার বাকি লসকরদের অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঠাণ্ডা করেন।[২১]

কিন্তু এই কৃষকদের বিদ্রোহ ছাড়াও জমিদারদের বিদ্রোহেরও একটা ধারাবাহিকতা আছে। আবার, আমরা 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি'র সাহায্য নিতে পারি। ১৬১৮ সনে শোভান কুলি নামে এক রাজপুরুষ বিদ্রোহ করে এবং তাকে আগ্রার কৃষকরা সাহায্য করে। ১৬২০ সনে কিসওয়ার অঞ্চলে জমিদার ও কৃষকদের একটি সম্মিলিত বিদ্রোহ হয়। শাহজাহানের রাজত্বে বুন্দেলাদের বিদ্রোহ বোধহয় 'পেশকশি' জমিদারদের বিদ্রোহের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[২২] বুন্দেলা নায়ক বীরসিংহ আবুল ফজলকে হত্যা করে জাহাঙ্গিরের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ ক্ষমতা পায়। তার পুত্র ঝুঝর সিংহ মুঘল রাজশক্তির ছত্রছায়ায় অগণ্য বুন্দেলা ও বিশেষত গোণ্ড জমিদারদের এলাকা দখল করতে শুরু করেন। ফলে, তাঁর সম্পত্তির আয় বৃদ্ধি পায়। এবং সেই অনুপাতে শাহজাহানও 'পেশকশ'-এর পরিমাণ বাড়াতে চান। ফলে ঝুঝর সিংহ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তখন ওরছা সিংহাসন দাবি করে আর একজন বুন্দেলা বংশধর। তাঁর নাম দেবী সিংহ। আইনগতভাবে তিনিই বয়োজ্যেষ্ঠ, যদিও জাহাঙ্গিরের পৃষ্ঠপোষকতায়

বীরসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বেশি পেশকাশ পাবার প্রত্যাশায় মুঘলসৈন্য দেবী সিংহের দাবিকে স্বীকার করল। আবার, একদিকে অন্যান্য জমিদারদের ধ্বংস করে একজন জমিদার তার এলাকা ও ক্ষমতা বাড়াচ্ছিল। এই জাতীয় অত্যধিক ক্ষমতাবৃদ্ধি মুঘল রাজশক্তির পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। দ্বিতীয়ত—পেশকশের পরিমাণ নিয়ে গোলমাল বাধল। তৃতীয়ত—একই পরিবারভুক্ত সামন্ত রাজার বংশের মধ্যে উত্তরাধিকারি সংক্রান্ত বিরোধ বাধল এবং মুঘলরা তার সুযোগ নিতে দ্বিধা করল না। ঠিক এই জাতীয় বিরোধই পরবর্তীকালে মেবার ও মাড়োয়ার বিদ্রোহে দেখা যায়। একদিকে অন্যান্য জমিদারদের প্রতি রাজসিংহের নেতৃত্বে মেবারের আগ্রাসী ভূমিকা ও অন্যদিকে যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর মাড়োয়ার রাজপুত সর্দারদের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে অন্তর্বিরোধই আওরঙ্গজেবের আমলে তথাকথিত রাজপুত বিদ্রোহের জন্ম দেয়।[২৩] কিন্তু শাহজাহানের আমলের বুন্দেলা বিদ্রোহ ও আওরঙ্গজেবের আমলের রাজপুত বিদ্রোহের মূল চরিত্র বোধহয় একই। এগুলো স্থানীয় সামন্ত বা 'পেশকশি' জমিদারদের প্রতিরোধ আন্দোলন।

মুঘল আমলে উপজাতি ও প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলনও দেখা যায়। প্রসংগত, আকবর থেকে শাহজাহানের আমল পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠানদের মধ্যে রোশনিয়া আন্দোলনের কাহিনী একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পারি।[২৪] এই ধর্মের প্রবক্তা বায়াজিদ আনসারির জীবন সম্পর্কে প্রচুর বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। বায়াজিদ জলন্ধরের লোক এবং তাঁর পিতা ধর্মনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন। বায়াজিদ নাকি প্রথম জীবনে অশ্ব-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং সেই সময় মোল্লা সুলেমান বলে এক ধর্মপ্রচারক দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি প্রথমে কান্দাহারের আশেপাশের জায়গায় তাঁর ধর্মের প্রচার শুরু করেন। কিন্তু সেখানকার কৃষিজীবীদের মধ্যে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। এর কারণটা খুব স্পষ্ট নয়। নিনগ্রাহর এলাকায় 'তাজিক'দের বাস ছিল এবং তারা মূলত কৃষিজীবী। এই তাজিকদের মধ্যেই আখুন্দ দরওয়েজের জন্ম। এখন 'তাজিক' কথাটা বিশেষ জাতিসত্তার অর্থে প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ এরা পাঠান উপজাতি নয়। লিডেনের ধারণা, এই গোষ্ঠী অগ্রসর কৃষিসমাজ ছিল এবং এদের মধ্যে 'সুন্নি' মতবাদ বেশ প্রভাব বিস্তার করে। ফলে, বায়াজিদ এখানে খুব সুবিধা করতে পারেন নি। তিনি কোহাটের কাছাকাছি তিরা নামে একটা জায়গায় আস্তানা গাড়েন এবং উরমারদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করেন এবং পরে সেই ধর্ম ঘোরিয়া-খেলের অন্যান্য উপজাতি আফ্রিদি, মুহম্মদি প্রভৃতিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

এখন দেখা যাক, বায়াজিদ আনসারির মূল ধর্মমতটা কি ছিল। ইসমায়েলাইৎ বা খারিজাইৎ ধর্মমতের প্রভাব তাঁর ওপর থাকা কিছু বিচিত্র নয়। তাঁর মতে শরিয়ৎ বা কোরানের বাহ্যিক আইনকানুন আল্লার সঙ্গে ভক্তের মিল হতে দেয়

না। তিনি পুরোপুরি 'শরিয়ৎ-ই-জাহিরি'র বিপক্ষে ছিলেন। তাঁর ভাষায়— "যে কাষ্ঠবহনকারী দাস প্রভুকে জানে না, তাকে অনন্তকাল তার মাথায় ভার বহন করতে হয় এবং চিরস্থায়ী দুঃখ ও যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। কিন্তু যে জানে তার প্রভুকে এবং কোথায় মাল জমা দিতে হবে, সে তাড়াতাড়ি ভারমুক্ত হয়। সুতরাং হে শিষ্য, এসো এই পৃথিবীর স্রষ্টাকে জানো। এবং নিয়মে সিদ্ধ হয়ে তুমি তোমার মাথার উপর থেকে নির্দেশের বোঝা নামিয়ে ফেল।"

এই ঈশ্বরকে জানবার আটটি স্তর বা 'জিগর' আছে। এই ৮টি স্তরের মাধ্যমে কেউ সাফল্য লাভ করলে সে সমস্ত পার্থিব আইনকানুন ও নীতির উর্ধ্বে পরিগণিত হয়। যেমন—"হে মূর্খ, তুমি এখন আল্লাকে উপলব্ধি করেছ। এখন কেন তুমি আবার পূজা বা কোনো ধর্মীয় আচরণ পালন করবে। তুমি আল্লার মহিমা জানার জন্যে শরিয়ৎ মেনেছ। আল্লাকে জানার পরে ঐ কর্তব্য আর করো না, কারণ তার প্রয়োজন শেষ হয়েছে।"

বায়াজিদের আল্লাকে মরণশীল মানুষ নিজের ব্যক্তিসত্তার মধ্যে উপলব্ধি করতে পারে। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'খয়ের-উল-বয়ানে' নাকি লেখা হয়েছিল— "যা কিছু বস্তুময় অস্তিত্ব, তাই আল্লার দর্পণ। প্রত্যেকটি জীবসত্তাই আল্লা। আত্মা রূপময়, শরীর গুণময়, এবং আল্লা প্রাণময়।" এবং এই ব্যক্তিসত্তার মধ্যে আল্লার উপলব্ধি থেকে বায়াজিদ নিজেকে আল্লার সর্বোচ্চ প্রকাশ বলে ঘোষণা করলেন। তিনি নিজেকে বলতেন 'পীর-ই-রুশন' (আলোর গুরু) এবং তাঁর শত্রুরা তাঁকে বলত 'পীর-ই-তারিক' (অন্ধকারের গুরু)। আলোকপ্রাপ্ত এইসব লোকেদের কাছে পার্থিব পাপ বা পুণ্য অর্থহীন, কেবলমাত্র পীরের নির্দেশই একমাত্র পথ। তিনি ও তাঁর শিষ্যরা সবাই একেকজন আল্লা, আলাদাভাবে কোনো আল্লার অস্তিত্ব তাঁদের কাছে নেই। তাই—"ন্যায় বা অন্যায়, ভালো বা মন্দ—এই কথাগুলির মানে একটি ছাড়া আর কি হতে পারে? সেটা হলো প্রত্যেক মানুষই তার পীরের কথা শুনবে: আমিই তোমাদের একাধারে আল্লা ও নবী।"

এর পরের ধাপই হলো নিজেকে আল্লার প্রেরিত পুরুষ বলে ঘোষণা করা ও বিশ্বের মুক্তিদাতা রূপে স্থায়ী ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা।— "আমি মহম্মদের ধর্ম ধ্বংস করব।···আমি কোনোভাবেই মহম্মদের চেয়ে খাটো নয়। আমাকে মাহাদ মনে করো।"

এই মাহদির কাছে সম্পদই হচ্ছে বেহেস্ত, এবং দারিদ্র্য জাহান্নম। কিন্তু এই সম্পদ আসবে কোথা থেকে?— "যা ভিক্ষা করে বা অনুরোধ করে পাওয়া যায় তা খাওয়া বেআইনি। যা কিছু হিংসা, ডাকাতি ও তলোয়ারের জোরে পাওয়া যায় তা খাওয়াই আইনসংগত।"

কাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যাবে, সে বিষয়েও বায়াজিদের নির্দেশ

স্পষ্ট। যারা বায়াজিদের ধর্ম মানে না তারা সবাই আসলে মৃত। মৃতদের সম্পত্তি ও স্ত্রী তো জীবিতরাই ভোগ করতে পারে।

বায়াজিদের ধর্মে স্ত্রী ও পুরুষের সমানাধিকার। সকলে একসঙ্গে বসে আলোচনা করতে পারত। এছাড়া, বায়াজিদের ভক্তরা নমাজ পড়লেও 'ওজু' করতেন না। বায়াজিদের রচনায় আত্মার জন্মান্তরবাদের আভাসও পাওয়া যায়। বায়াজিদের কাছে এক অর্থে নিজের আন্দোলন ব্যতীত যেকোনো স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধর্মই অসত্য। শিয়া বা সুন্নির মধ্যে তাঁর কোনো ভেদাভেদ নেই। এবং এক আত্মোপলব্ধি সম্পন্ন হিন্দু একজন গোঁড়া মুসলিমের চেয়ে বায়াজিদের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।[২৫]

এখন ইসলামিক ধর্মীয় মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বায়াজিদের ধর্মমতের বৈশিষ্ট্য নিয়ে মোটামুটি কিছু বলা যায়। গোঁড়া ইসলাম ধর্মে মহম্মদই হচ্ছে আল্লার শেষ প্রেরিত পুরুষ বা নবী। তাঁর বাণীই চরম এবং মুসা, ঈশা প্রমুখ আগেকার প্রেরিত নবীদের বাণী মহম্মদের আসবার পরে বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একটি বিশ্বাসের ধারা আছে যে, পৃথিবী যখন অন্যায় ও অত্যাচারে পূর্ণ হবে তখন আবার একজন ঈশ্বরের প্রতিনিধি আসবেন এবং ধর্মরাজ্য স্থাপন করবেন। এইরকম প্রতিনিধিকেই বলা হয় 'মাহদি' বা পথপ্রদর্শক। এই মাহদিদের আবির্ভাবের কথা বলা বা ঘোষণা করার অর্থই হচ্ছে কোরান এবং শরিয়তের প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যাওয়া এবং গোঁড়া মুসলিম উলেমাদের প্রাধান্যকে খর্ব করা। আবার যেকোনো মরণশীল জীব নিজের মধ্যে আল্লার পূর্ণ সত্তাকে উপলব্ধি করতে সমর্থ, একথা বলা গোঁড়া মুসলিম ধর্মমতের চরম বিরোধিতা। এদিক থেকে মাহদি আন্দোলন একটি প্রতিবাদী ধারার জন্ম দেয়। এছাড়া স্ত্রী-পুরুষে সমানাধিকার, মুসলিম আইনের পূর্ণ বিরোধিতা এবং হিন্দুদের প্রতি অপেক্ষাকৃত সম মনোভাব নিঃসন্দেহে বায়াজিদের আন্দোলনকে বিশিষ্ট রূপ দিয়েছে।

কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, মাহদি আন্দোলন তৎকালীন ভারতে নতুন কিছু নয়। লোদির শাসনকালেই এই আন্দোলন জোরদার হয়। আন্দোলনের প্রবীণ প্রবক্তা ছিলেন সৈয়দ মহম্মদ জোনপুরি। তাঁর অনুগতদের মধ্যে আমির ওমরাহ ছাড়া বহু কারিগর এমনকি ডাকাতও ছিল। তাঁর 'দায়েরতে' কৃচ্ছ্রসাধনতা, সঞ্চয়ের বিরোধিতা ও শিষ্যদের মধ্যে সমবণ্টনের দিকে অত্যধিক জোর দেওয়া হতো। পীরের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য ও কাফেরদের প্রতি অন্তহীন ঘৃণা, এই ছিল মাহদি আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এঁরা কোনো নতুন ধর্মমত ঐ অর্থে প্রচার করতেন না। বরং ইসলামকে তার পুরনো গৌরবের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই এদের উদ্দেশ্য ছিল। এই ধর্মীয় ধারার বিকাশই পরবর্তীকালে দেখা যায় শেখ আহমেদ সরহিন্দির মধ্যে। শেখ আহমেদ

সরহিন্দির জন্ম ১৫৬৪ সনে এবং জাহাজিরের রাজত্বকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

আকবর এবং জাহাজিরের আমলে মুঘল সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় কাঠামো মজবুত করার উদ্দেশ্যে 'সুল-ই-কুল' বা সর্বজনীন ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি নেওয়া হয়। এরই দার্শনিক ভিত্তি রচনা করেন আবুল ফজল প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা। তাঁরা রুমি, ইবন আরবি প্রমুখের ওপর ভিত্তি করে 'ওয়াদাৎ উল উজুদ' বা 'সবকিছুই আল্লা' —এই শ্লোগান দেন। কিন্তু আরেক দল প্রশ্ন তোলেন যে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থে কোরানের বহু বাণীকে পরিশোধিত করা হচ্ছে, ইসলামের প্রাচীন জঙ্গী প্রচার-ধর্মিতাকে হ্রাস করা হচ্ছে। তাদের শ্লোগান হচ্ছে—'ওয়াদাৎ-উস-শুহুদ' অর্থাৎ আল্লা থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি। এই শ্লোগান একটি গোঁড়া ইসলামিক পুরোহিততন্ত্র স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল। শেখ আহম্মদ এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রবক্তা ছিলেন এবং নিজেকে 'মুজাহিদ' (ধর্মযোদ্ধা) বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর অবশ্য মূল লক্ষ্য ছিল, আমির বা ওমরাহদের ওপর নানা ধরনের চাপ সৃষ্টি করে এবং বাদশাহকে বশীভূত করে নিজের কাজকে কি করে হাসিল করা যায়। জনগণ অপেক্ষা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারীর ওপর নির্ভরশীল হওয়াতেই শেখ আহমেদ সরহিন্দি অনেক বেশি উৎসুক ছিলেন।[২৬]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, মুঘল সাম্রাজ্যের প্রাক্‌কালে ভারতে বিভিন্ন জায়গায় 'মাহদি' আন্দোলনের প্রাদুর্ভাব হলেও তার রকমফের ছিল এবং বায়াজিদ আনসারি পরিচালিত 'রোশনিয়া' আন্দোলন কতকগুলি বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। প্রথমত—অন্যান্য মেহেদি আন্দোলন যখন কোরানের বিশুদ্ধতা বা মহম্মদের দোহাই পাড়ছে, সেখানে বায়াজিদ তাঁর নিজের ভক্তদের জন্যে গোটা শরিয়ৎ ও মহম্মদের মহিমাকেই অস্বীকার করছেন। দ্বিতীয়ত—সৈয়দ মহম্মদ জৌনপুরি সরাসরি রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধতা করতে অস্বীকার করছেন এবং নৈতিক বলের ওপর গুরুত্ব আরোপ করছেন। শেখ আহম্মদ সরহিন্দির ঘোরাফেরা ওমরাহদের মধ্যে এবং বাদশাহের সমর্থনই তাঁর ধর্ম প্রচারের প্রধান অস্ত্র—এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। সশস্ত্র সংগ্রাম বা গণ আন্দোলনের কোনো ধারণা এই মাহদিদের চেতনায় নেই। বায়াজিদ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তৃতীয়ত—কৃচ্ছ্রসাধন বা সমাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার ভাব বায়াজিদের প্রচারে একেবারেই নেই। সেখানে সক্রিয়তার দিকে ঝোঁক অনেক বেশি। চতুর্থত—নারীদের প্রতি সমান আচরণ ও হিন্দুধর্মের কিছু কিছু প্রভাব বায়াজিদের ধর্মকে উগ্র 'কাফের' বিরোধী করে তোলেনি। এখন বায়াজিদের মাহাদ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যের উৎস কিন্তু তৎকালীন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতি জগতের সামাজিক পরিমণ্ডল।

রোশনিয়া আন্দোলনের প্রভাবের মূল ভৌগোলিক এলাকা ছিল সোয়াৎ ও বাজৌর। এর উৎস ছিল উরমার উপজাতিরা। এখন অন্যান্য উপজাতিদের

মধ্যে এই উরমাররা ছিল সামাজিক মর্যাদায় খুব নিচু ও মূলত কারিগর। এরা বিশুদ্ধ পশতু ভাষায় কথা বলত না, বরং এক ধরনের মিশ্র ভাষায় কথা বলত।[২৭] বায়াজিদ নিজে খুব দক্ষ ভাষাবিদ ছিলেন এবং পশতু, ফারসি ও হিন্দি—এই তিন ভাষাতেই প্রচার করতে পারতেন। ফলে, এদের মধ্যে তিনি খুব সাফল্য অর্জন করেন। এখন বায়াজিদ এই উরমারদের সঙ্গে আনসারিদের (মক্কা থেকে মদিনায় যাবার পথে হজরত মহম্মদের সংযাত্রীরা) যোগসূত্র স্থাপন করেন এবং এইভাবে তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা প্রদান করেন। তাঁর ধর্মে শরিয়ৎ ও সর্বপ্রকার ধর্মীয় আইন-কানুনের বিরোধিতাও এদের আকৃষ্ট করে।

বায়াজিদের অন্যতম সমর্থক ছিল আফ্রিদি উপজাতি। খাইবার গিরিপথের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এদের ওপর ছিল। ভারত ও মধ্য-এশিয়ার প্রধান বাণিজ্যপথের কাফিলাদের (Caravan) কাছ থেকে এরা শুল্ক আদায় করত। এই শুল্কের পরিবর্তে সেই কাফিলারা লুঠতরাজের হাত থেকে রেহাই পেত। কৃষিকাজের প্রসার বেশি না হওয়ায় এইভাবে জোর করে শুল্ক আদায়—এই উপজাতিদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম পথ। এরা ভ্রাম্যমাণ ছিল এবং কোনো সরকারকেই কর বা উপঢৌকন দিত না। এদের সম্পর্কে খুশহল খান খটকের বক্তব্য হচ্ছে—"আফ্রিদিরা যেকোনো ধর্মীয় বিদ্রোহীদের চাইতেও বেশি বিদ্রোহী। মৃতের জন্যে তারা আল্লার কাছে প্রার্থনাও করে না, বা তাদের কোনো পুরোহিত নেই। তারা ভিক্ষা দেয় না, বা উৎসর্গ করে না; তাদের মনে আল্লা সম্পর্কে কোনো ভীতি নেই।"[২৮]

ঘোরিয়াখেলের অন্যান্য উপজাতিরা, যেমন ঘোরি ও মুহম্মদি, উনিশ শতকের প্রথমদিকেও মূলত পশুপালক ছিল।[২৯]

এই রোশনিয়া আন্দোলনের সমর্থক ও ভাগীদার হিসেবে ইউসুফজাই উপজাতিরাও কিছুদিন ছিল। লোকবলে বা সম্পদে এরাই এই অঞ্চলের প্রধান উপজাতি। প্রথমত—বাবরের সময় থেকে এই উপজাতিরা এই অঞ্চলে অনুপ্রবেশ শুরু করে এবং এই অঞ্চলের পুরনো বাসিন্দা দিলজাক উপজাতিদের স্থানচ্যুত করে উৎকৃষ্ট জমিগুলো দখল করতে থাকে। আকবরের রাজত্বের আগে এই উপজাতিরা অন্যান্য পুরনো উপজাতিদের সরিয়ে দিয়ে এখানে বেশ ভালো করেই জাঁকিয়ে বসেছে।[৩০] এই ইউসুফজাইরা অবশ্য নিজেদের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে জমিভাগ করত এবং তাদের মধ্যে কয়েক বছর অন্তর জমিগুলো আবার হাতবদল করা হতো। জমির এই জাতীয় পুনর্বণ্টন করার ফলে সব গোষ্ঠীই কিছু সময়ের জন্যে উৎকৃষ্ট জমি চাষ করতে পারত।

ইউসুফজাইদের গালাগালি দিতে গিয়ে খুশহল খান বলেছেন—"তারা ভাগ্যপরীক্ষা করে প্রত্যেক বছর জমি নিয়ে জুয়াখেলা করে। কোনো শত্রু-সৈন্য ব্যতিরেকেই তারা নিজেদের ধ্বংস করে।" ইউসুফজাইরা ব্যবসাও

করত। খুশহল খানের ভাষায়—"এরা কেবল উৎপন্ন শস্য খায় না, রফতানিও করে।" এদের মধ্যে শক্তিশালী রাজশক্তিও সেইসময় দানা বাঁধেনি। খুশহল খান লিখেছেন—"সোয়াৎ-এর প্রত্যেকটি জায়গাই রাজার উপযোগী। কিন্তু শাসক বা মালিক না থাকার দরুন এগুলো বলদের বাসযোগ্য হয়েছে। এখানে রাজারা আনন্দ ও মজা, দুটিই উপভোগ করতেন। কিন্তু বর্তমান বাসিন্দাদের সেরকম কোনো অনুভূতিবোধই নেই।"

ইউসুফজাইরা কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ে নিয়োজিত হলেও তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পর্যায়গতভাবে জমি বণ্টনের নীতি খানিকটা উপজাতীয় সাম্যভাব বজায় রেখেছিল। খুশহল খান এদের মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাব লক্ষ্য করেছিলেন। এইসব উপজাতিদের মধ্যে মেয়েদের স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত বেশি এবং 'জিরগা' বা উপজাতীয় সমিতিই 'মালিক' বা অধিনায়ক ঠিক করে। এছাড়া কিছুদিন আগে ইউসুফজাইদের অনুপ্রবেশ এবং আকবরের সময় এই অঞ্চলে খটকদের অনুপ্রবেশ গোটা এলাকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল। এবং এলাকার মালিকানাকে কেন্দ্র করে উপজাতীয় বিরোধকেও তীব্রতর তোলে।[২৮]

এই সামাজিক পরিমণ্ডলের পটভূমিতে বায়াজিদের দর্শনের জনপ্রিয়তা ও আবেদন সহজেই অনুমান করা যায়। প্রথমত—উপজাতিদের মধ্যে আদিম সাম্যবাদ ও গোষ্ঠী চেতনার উপস্থিতি বায়াজিদের গোঁড়া ইসলামিক শরিয়ৎ ও মোল্লাতন্ত্রের বিরোধিতাকে সহজেই পরিপুষ্ট করেছিল। নারীদের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতাও বায়াজিদের দর্শনে স্থান পেয়েছিল। এই সময় উপজাতিদের সমাজে অবিরত জমি নিয়ে লড়াই চলছিল। আফ্রিদিদের কাছে লুঠতরাজই একটি উপজীবিকা ছিল। সেই টালমাটালের যুগে বায়াজিদের ধর্মে সক্রিয়তা এবং বিপক্ষীয়দের সম্পত্তি দখলের নীতি স্বভাবতই এইসব উপজাতিদের কার্যকলাপকেই সমর্থন করল। যারাই বায়াজিদের অনুচর হবে তারাই অন্যদের সম্পত্তি দখল করবে—এর পেছনে কোনো গুণাহ (অপরাধ) নেই ; এই ধারণা তৎকালীন এক বাস্তব পরিস্থিতির স্বীকৃতি মাত্র। আবার, এই ধরনের ব্যবহার সমাজের স্থিতি ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে যায়। ফলে, প্রচলিত ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বায়াজিদের ধর্মমত জঙ্গীভাব অবলম্বন করল। বিভিন্ন উপজাতিগুলির আশা ও আকাংক্ষা চরিতার্থ করার সুযোগ বায়াজিদের ধর্মে আছে।

ফলে, মুঘলরাষ্ট্র দুটি অসুবিধায় পড়ল। পেশোয়ার থেকে কাবুলের মূল যোগাযোগ পথে লুঠতরাজ, ব্যবসা ও শাসনতান্ত্রিক যোগাযোগ রক্ষার পক্ষে খুব ক্ষতিকারক। দ্বিতীয়ত—উপজাতিদের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ ও পুনর্বণ্টনের নীতি সোয়াতের উর্বর উপত্যকায় ভূমির চাষব্যবস্থাকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। খুশহল খান এই অবস্থার দিকে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছেন। ফলে, এই ধর্মমত ও উপজাতিগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা মুঘল রাষ্ট্রের পক্ষে একটি কর্তব্য হয়ে পড়ে।

বায়াজিদ আনসারির আন্দোলনকে প্রথমে কাবুলের শাসনকর্তা মির্জা মুহম্মদ হাকিম কড়া নজরে রাখলেও সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে সাহস করেন নি। পরে বায়াজিদ যখন কাবুলের রাজকোষের নামে হুণ্ডি জারি করলেন, তখন তাঁকে সাময়িকভাবে বন্দী করে ছেড়ে দেওয়া হয়। তার সঙ্গে পরে মহসিন খানের একটি সংঘর্ষ হয় এবং তিনি সম্ভবত ১৫৮১ সনে মারা যান। কিন্তু পরে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জালাল। এবং জালালের বিদ্রোহের পেছনে সরাসরি কারণ ছিল—রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ উপজাতিদের বিক্ষোভ। ১৫৮৬ সনে পেশোয়ার অঞ্চলে তৎকালীন শাসনকর্তা ছিলেন সৈয়দ হামিদ বুখারি। তিনি মুসা বলে একজন লোকের ওপর সব দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন এবং লোকের নামের সঙ্গে কাজের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই অঞ্চলে হাজার দশেক মহম্মদ ও ঘোরি উপজাতির বসতি ছিল। আবুল ফজলের ভাষায়—"অর্থগৃধ্নু লোকটি এই উপজাতির ওপর চাপ দিতে শুরু করল এবং তাদের সম্পত্তি ও সম্মানের দিকে হাত বাড়াল।" আবুল ফজল অত্যাচারের সত্যতা অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তাঁর খেদ হলো এই যে, "অদূরদর্শিতা (কুথেবিনি) ও দুষ্টবুদ্ধির (বদগাওহরি)" জন্যে এরা সম্রাটের দরবারে আবেদন না করে (বদরগাহে হুমায়ুন আরজদাশত) না করে জালালকে নেতা বলে স্বীকার করল।[২৯]

এই বিদ্রোহের ফলে সৈয়দ হামিদ মারা যান এবং একটি ধারাবাহিক বিদ্রোহ শুরু হয়—যাতে করে শেষ পর্যন্ত আফ্রিদি থেকে ইউসুফজাই, সবাই অংশগ্রহণ করে। মানসিংহ, জৈন খান প্রমুখ বাছা বাছা মনসবদাররা বারবার এই বিদ্রোহ দমনের জন্যে প্রেরিত হন। কারাপ্পা গিরিপথে আকবরের প্রিয় বিদূষক বীরবল সসৈন্যে নিহত হন। ১৫৮২ সন থেকে ১৬০২-এর মধ্যে এই অঞ্চলে প্রায় ১১ বার আফগান উপজাতিরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং তার পেছনে জালাল তারিকির হাত বড় কম ছিল না। শেষ পর্যন্ত নানা ধরনের কূটনৈতিক চাল এবং ইউসুফজাই প্রভৃতির কৃষিক্ষেত্র ও গ্রাম ধ্বংস করে এই বিদ্রোহের আগুনকে খানিকটা প্রশমিত করা হয়।

কিন্তু রোশনিয়াদের আন্দোলন চলতেই থাকে। জাহাঙ্গিরের আমলে এই প্রতিরোধের নেতৃত্ব দেন জালালের ভ্রাতুষ্পুত্র আহদাদ। জাহাঙ্গিরের আত্মজীবনীতে একে বারবার 'আফগানান পুরতারিকি'র নায়ক বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৩০] আবার ১৬১১ সনে কাবুল লুঠ এবং পরে ঘয়েরাৎ খানের সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেন আহদাদ। শেষ পর্যন্ত মুজাফফর খানের সৈন্য আহদাদকে পরাস্ত ও নিহত করে। শাহজাহানের শাসনের প্রথমেই

রোশনিয়ারা কামালউদ্দিনের নেতৃত্বে মুজাফফর খানকে পরাস্ত করে ও পরে আহদাদের পুত্র আবদুল কাদির রোশনিয়াদের নেতৃত্ব দেন। কাবুলের শাসনকর্তা সৈয়দ খান বারংবার দৌত্য করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত রোশনিয়াদের প্রধান অংশ দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করে এবং আবদুল কাদিরের শ্যালক রসিদ খান ফরাক্কাবাদে জায়গির পান এবং খান্দেশে প্রেরিত হন। বায়াজিদের অন্যতম বংশধর মির্জা আনসারি ১৬৩৩ সনে দাক্ষিণাত্যে বাদশাহের বাহিনীর হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেন।[৩১]

শেষবারের মতো প্রদীপ জ্বলে ওঠে করিমদাদের বিদ্রোহে (১৬৩৭-৩৮খ্রী.)। করিমদাদ জালালের পুত্র। 'পাদশাহনামা'র লেখক আবদুল হামিদ লাহোরির বর্ণনা অনুযায়ী—"নঘজের কাছে কিছু উপজাতি গোষ্ঠী (জমায়ে আজ উলুসানে নঘজ) সম্প্রতি অনুচর, শিষ্য ও সমর্থক সমেত পীর-ই-তারিক ওরফে পীর-ই-রুশন জালালের পুত্র অন্ধ করিমদাদকে ডেকে পাঠিয়েছে। একে কিছুদিন আগেই বাদশাহের বাছা বাছা বীররা তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং এ লোঘান আফগান উপজাতিদের সীমান্ত অঞ্চলে বাস করত। তারা সুযোগ খুঁজছিল এবং এখন সেটা পেয়ে তারা তিরাতে এসে হাজির হলো।"

রোশনিয়া ধর্মমতের কেন্দ্রভূমি তিরাতে কিন্তু অসন্তোষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল। কথিত আছে, তিরার বৃদ্ধরা আবদুল কাদিরের মুঘল সম্প্রীতিকে ভালো চোখে দেখেন নি এবং সৈয়দ খানের দৌত্যের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। যাই হোক, সরকারি ইতিহাসবিদের ভাষায়—"তিরার জনগণ (মরদুমে তিরা) বাহ্যত বাদশাহের অনুগত ছিল ও তাঁর আদেশ মানত (ফরমান পজিরি) এবং নিজেদের ধ্বংসের হাত থেকে সেইভাবে বাঁচিয়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে (দর বাতিন) তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচারী ও বিক্ষুব্ধ (আসিয়না) ছিল এবং তারা যে সেরকম, তা সুযোগমতো দেখাতে সর্বদা প্রস্তুত ছিল।"

এদেরই মধ্যে করিমদাদ বিদ্রোহের জনসমর্থন খুঁজেছিলেন। তাঁর অনুচরেরা "নঘজের ওপর নির্ভরশীল গ্রামগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং অকৃতজ্ঞ জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করেছিল।" অবশ্য এই বিদ্রোহ খুব জোর দানা বাঁধেনি। উপজাতীয় কোন্দল ও মুঘলদের ভেদনীতির ফলে করিমদাদের স্বপক্ষে শেষ পর্যন্ত মাত্র দুটি গোষ্ঠী লড়েছিল এবং মুঘল সামরিক শক্তির কাছে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[৩২]

এই উপজাতীয় আন্দোলন বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। তবে, পশতু ভাষায় লিখিত ইতিহাসের ওপর সেরকম দখল না থাকার দরুন এক্ষেত্রে আলোচনাটা আংশিক হতে বাধ্য। প্রথমত দেখা যায় যে, বায়াজিদের রোশনিয়া ধর্মমত এমন সব উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিল যে তারা

সমাজবিকাশের স্তরে পিছিয়ে থাকা, বা একটি স্তর থেকে আরেকটি স্তরে উত্তরণের পর্যায়ে যাচ্ছিল। সেইসব উপজাতির সামাজিক অবস্থাজনিত অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের এক নৈতিক ও দার্শনিক রূপ আমরা পাই রোশনিয়া আন্দোলনে। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ স্থায়ী ও দৃঢ় সংবদ্ধ কৃষি-সমাজে বায়াজিদের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেছেন, তা আগেই বলা হয়েছে। ফলে, রোশনিয়া ধর্মমত এক বিশেষ সমাজ ও ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলেই পরিপুষ্ট হয়েছিল। দ্বিতীয়ত—যে বিষয়টি লক্ষণীয় হচ্ছে, আকবরের রাজত্বের প্রথমে মির্জা মহম্মদ হাকিমের সুবাদারির সময়ে কিন্তু আফগান উপজাতিদের মধ্যে রোশনিয়া আন্দোলন সেরকম জঙ্গীভাবে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেনি। কারণ, সুবাদার সেইভাবে আফগান উপজাতিদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনি। মির্জা মহম্মদ হাকিমের বিদ্রোহ ও অপসারণের ফলে আফগান উপজাতির বিদ্রোহের তীব্রতা হঠাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এর পেছনে হয়তো সীমান্ত অঞ্চলে মুঘল কেন্দ্রীয় শাসন-কাঠামোর প্রসার কাজ করছিল। এই কেন্দ্রীয় সুশৃংখল ও কঠোর শাসনব্যবস্থার সঙ্গে উপজাতীয় সমাজ ও অর্থনীতির রূপ সহজে খাপ খায় না। ফলে, সংঘর্ষ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত—এই বিদ্রোহের পেছনে মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা সাধারণ বিক্ষোভ কাজ করেছে। রোশনিয়া নেতাদের যে একটা জনসমর্থন ছিল তা অনস্বীকার্য। মুসার বিরুদ্ধে উপজাতি-দের বিদ্রোহ তার একটা বড় প্রমাণ। তিরার জনগণ শেষ পর্যন্ত মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ছিল।

কিন্তু রোশনিয়া আন্দোলন স্থায়ী হয়নি এবং তারিকিদের নায়করা শেষ পর্যন্ত মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থার অংশীদার হয়ে পড়েন। এর পেছনে সামাজিক কারণ খুব স্পষ্ট নয়। হয়তো পশতু ভাষায় লিখিত উপাদানে আরো স্পষ্ট কারণ পাওয়া যেতে পারে। তবে, বর্তমান তথ্যের ভিত্তিতে একটি দিকে আপাতত ইঙ্গিত করা যেতে পারে। রোশনিয়া আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে অন্যতম প্রধান সমর্থক ইউসুফজাইরা কিন্তু অল্পদিন পরেই এই আন্দোলনের তীব্র বিরোধী হয়ে পড়ে এবং তারা বায়াজিদের তিন ছেলে—উমর, খয়েরুদ্দিন ও নুরুদ্দিনকে বারার যুদ্ধে সসৈন্যে ধ্বংস করেন। এই উপজাতিদের মধ্যে সুন্নি ও হানিফা মতাবলম্বী পীর বাবা সৈয়দ আলি শাহ তরমিজির শিষ্য আখুন্দ দরওয়েজ বায়াজিদের ধর্মমতের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চালিয়ে বিপুল সাফল্যলাভ করেন। এখন একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, আকবরের সময় বিদ্রোহের পরে ইউসুফজাইরা তাদের এলাকায় আবার নতুনভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা করছিল এবং মালিকদের ক্ষমতা বাড়াচ্ছিল। ঐ এলাকায় ইউসুফজাইরা কৃষির পক্ষে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জমি ভোগ করত এবং বাণিজ্য ও কৃষির জন্যে নিশ্চয় অতিরিক্ত সম্পদও জমছিল। আকবরের রাজত্বে এলাকা পুনর্বণ্টনের অল্পদিন পরেই তারা মুঘল দরবারকে বার্ষিক

১ হাজার টাকা করে পেশকাশ দিতে সমর্থ হয়।[৩৩] এলাকার ওপর স্বত্ব নির্দিষ্ট হয়ে যাবার পর লুঠতরাজের প্রয়োজনীয়তাও এদের কাছে সীমিত হয়ে পড়ে। এদের সঙ্গে অন্যান্য কারিগর বা শ্রমজীবী উপজাতির সম্পর্ক দাস ও প্রভুর মতো। 'ফকির' বলে অন্যান্য ক্ষুদে উপজাতিরা ব্যক্তিগতভাবে ইউসুফজাই মালিকদের দাসত্ব স্বীকার করছিল এবং ইউসুফজাই 'জিরগাতে' তাদের কোনো অধিকারই স্বীকার করা হতো না। এবং এই ফকিরদের উদ্বৃত্ত সম্পদ বা 'কালাঙ' বা করই এই সময় থেকে ইউসুফজাই মালিকদের সামাজিক সম্পদের ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল। এই 'কালাঙ' ভিত্তিক সমাজে বায়াজিদের মরমী ও তীব্র জঙ্গী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও লুঠতরাজের নীতি নেতৃত্বকামী গোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে খাপ খায় না। এক্ষেত্রে ইউসুফজাইদের মধ্যে গোঁড়া সুন্নি মতবাদই শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করা স্বাভাবিক।[৩৪]

ইউসুফজাইরা এক উত্তরণের স্তরে ক্ষণিকের জন্যে রোশনিয়া আন্দোলনের সমর্থক হয়েছিল। কিন্তু একটি উপজাতীয় সামন্তপ্রধান সমাজের দিকেই তাদের বিবর্তনের গতিমুখ ছিল, ফলে রোশনিয়া ধর্মমত সেই সমাজের শাসকগোষ্ঠীর আদর্শের সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। ফলে, সোয়াৎ অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী উপজাতিটি রোশনিয়া আন্দোলনের শেষ পর্যন্ত বিরোধী হয়ে পড়ে।

সবশেষে বোধহয় আরেকটি কথা বলা দরকার। এই জাতীয় 'মাহদি' আন্দোলনে পীরের প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও অপরাপর অন্যান্য উপজাতির বিরুদ্ধে এক জাতীয় জেহাদের মনোভাব শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনের মধ্যে এক ধরনের পশ্চাদ্‌মুখীনতা এনে দেয়। সৈয়দ আহম্মদ জৌনপুরি তাঁর আদেশের বিরোধী সবাই কাফের এবং যে যত বেশি পড়াশুনা করে সে তত বেশি মূর্খ হয়—এই ধরনের ফতোয়া দিয়ে গেছেন। সামান্য বিরোধিতা করার অজুহাতে বায়াজিদ ৩০০ লোককে হত্যা করেছিলেন। ফলে, এই ধরনের আনুগত্য ও বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকে অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন ও একঘরে করে রাখতে বাধ্য হয়। অবশ্য সামগ্রিকভাবে উপজাতি আন্দোলনে ইসলামের প্রতিবাদী আন্দোলনের রূপ ধর্ম ও বর্ণের সাধারণ ভূমিকার প্রসঙ্গে আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোধহয় বলা যায় যে, মুঘল আমলের শুরু থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন ছিল। আওরঙ্গজেবের বা তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে হঠাৎ কিছু ঘটেনি। প্রতিরোধ আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তার ধারাবাহিকতা অনেক আগে থেকেই ছিল। কারণ দ্বন্দ্বের বীজ সাম্রাজ্য স্থাপনের গোড়া থেকেই উপ্ত ছিল। সাম্রাজ্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার বিকাশ হয়েছে মাত্র। এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

আবার, আমরা প্রাক-আওরঙ্গজেব আমলে প্রতিরোধ আন্দোলনের কয়েকটি সুস্পষ্ট রূপ দেখলাম : ক. বিশুদ্ধ-কৃষক বিদ্রোহ, খ বিশুদ্ধ সামন্ত-বিদ্রোহ, গ. জমিদার ও কৃষক-বিদ্রোহ, ঘ. উপজাতিদের মধ্যে বিদ্রোহ—যেখানে প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলন ও জাতে-ওঠার প্রশ্নও জড়িত। এই সমস্ত বিষয়ই আওরঙ্গজেবের ও তৎপরবর্তী সময়ের প্রতিরোধ আন্দোলনে নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে।[৩৫]

২. আওরঙ্গজেব ও তৎপরবর্তী আমলের প্রতিরোধ আন্দোলন

ক. প্রথমেই আমরা গুজরাটের মাতিয়া বিদ্রোহ (১৬৮৫ খ্রী.) নিয়ে আলোচনা করতে পারি।[৩৬] এই মাতিয়ারা একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়। বলা হয় এরা পিরানা গ্রাম থেকে উদ্ভূত, কারণ ঐ অঞ্চলে এদের একটি আদি তীর্থস্থান আছে। ইমামউদ্দিন নামে একজন সাধু এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন ও ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে কুনবি কৃষকরা তাঁর ধর্মের অনুগত হয়। এদের মধ্যেও ভাগ ছিল—একদল খোজা, এবং অন্যদল মোমনা। খোজাদের বিদ্রোহই এখানে হয়েছিল। এখন ফ্রসোয়া মার্তা এদের হিন্দু (gentile) বলেছেন, যেখানে 'মিরাৎ'-এ বলা হয়েছে : "বিভিন্ন বর্ণের হিন্দুরা ইসলাম গ্রহণ করেছে।...এরা নিজেদের মুসলিম বলে...এদের ধর্ম সাধারণ মুসলিম ধর্ম থেকে আলাদা। এরা বাহ্যত হিন্দুদের মতো বর্ণ ও গোত্র অনুযায়ী বাস করে, যদিও ভেতরে সৈয়দের শিক্ষাকে অনুসরণ করে।"[৩৭] এদের একজন 'পীর' বা গুরু ছিল এবং প্রত্যেক শিষ্যের আয়ের এক-দশমাংশ তাঁর প্রাপ্য ছিল।

এদের একাংশ যেরকম কৃষক ছিল, অন্য অংশ সেরকম ব্যবসায়ী ও কারিগরের উপজীবিকাও গ্রহণ করেছিল।[৩৮] এই বোহরা খোজারা সমগ্র গুজরাটের ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত, যদিও আলি মহম্মদ খান ব্রোচ নগর অবরোধ প্রসঙ্গে ও নাগরিক জীবন সম্পর্কে এদের অনভিজ্ঞতা যেভাবে চিত্রিত করেছেন তাতে মনে হয় যে, এদের মূল বাহিনীর মধ্যে স্থায়ী নগর-বাসিন্দা ও উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত বণিক ছিল না। কারণ, তাঁর মতে এরা অশিক্ষিত, নগরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ, এবং সুযোগ পেলেই নগর ছেড়ে নিজেদের দেশের ঘরে চলে যেত।[৩৯]

এদের বিদ্রোহের আপাত কারণ—খোজাদের নেতাকে আওরঙ্গজেব রাজ-দরবারে ডেকে পাঠান এবং পথে তাঁর মৃত্যু হয়। এ নিয়ে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভের কিন্তু অন্য এক পটভূমি আছে। মার্তার ভাষায়—"গুজরাটের বিভিন্ন অংশে ও ব্রোচ অঞ্চলে এই মাতিয়ারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। শাসনকর্তা এবং অনুচরদের অত্যাচার ও অনাচারের দরুন যে দুর্দশায় তারা পতিত হয়েছে, সেটাকেই হেতু হিসেবে তারা মনে করল।"[৪০]

এই অত্যাচারের প্রকৃতি একটু বিশ্লেষণ করা দরকার। ১৬৮০ সন থেকে গুজরাটে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। ১৬৮১ সনে আহমেদাবাদ শহরে খাদ্য সংকট নিয়ে সুবাদারের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা হচ্ছে এবং ১৬৮৫-৮৬ সনে খাদ্য সংকট তীব্র হলো। জিনিসের দাম বাড়ছে। এর সঙ্গে আরো দুটি বিষয় যোগ হলো। ক. মণ্ডি বা বাজারে ব্যবসায়ীদের ওপর অতিরিক্ত কর চাপানো হলো এবং ১৬৮৫ সনে সুরাটের শাসনকর্তা সালামৎ খান ছলে-বলে সবরকম বণিকের কাছ থেকে নানা ধরনের শুল্ক আদায় করতে লাগলেন। সৌরাষ্ট্রের শাসক শাবদি খান একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন—যাতে বলা হয়, জায়গিরদাররা বণিকদের জোর করে ধান বিক্রি করছে এবং কৃষকদের কাছ থেকে আবওয়াব নিচ্ছে।[৪১] খ. রুপোর অভাব দেখা দিল এবং ফলে মুদ্রার বাজারে সাময়িক সংকট এলো। কৃষকদের যেহেতু মুদ্রায় রাজস্ব দিতে হতো, তাই রাজস্ব বাকি পড়তে লাগল এবং তা আদায়ের জন্যে রাজকর্মচারিদেরও জুলুম বাড়ল। ফলে, এই সময় ক্ষুদে ব্যবসায়ী, কারিগর ও কৃষক—কারো অবস্থাই ভালো ছিল না, এবং তাদের ওপর চাপ এসে পড়েছিল।

এটা হয়তো সম্ভব যে, আওরঙ্গজেব তাঁর রাজপুতানায় যুদ্ধ চালানোর জন্যে বোহরাদের পীরের উপর জোরজুলুম করতে চেয়েছিলেন। এই শিষ্যদের আয় থেকে সঞ্চিত বিপুল অর্থ, সোনা ও রুপো যে পীরের কাছে সঞ্চিত হতো—এই ইঙ্গিত আলি মহম্মদ দিয়েছেন। আর একটা জিনিস আমরা অন্যক্ষেত্রেও লক্ষ্য করব। এই সময়ের আগে থেকেই আওরঙ্গজেব রাহাদারি ইত্যাদি আবওয়াবের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ব্যবসায়ীদের ওপর কর স্থাপন সরকারি অধিকার। যেসব ধর্মীয় সংগঠন অনুরূপ অধিকার প্রয়োগ করত তাদের সঙ্গে কোনো-না কোনো সময় আওরঙ্গজেব মুখোমুখি সংঘর্ষে এসেছেন। এদিক থেকে মাতিয়াদের সংগঠনও ব্যতিক্রম নয়।

এখন এই সাধারণ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে মাতিয়াদের নেতার ওপর মুঘল রাষ্ট্রশক্তির জুলুম—তা ধর্মীয় বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক-না কেন—আগুনে ঘৃতাহুতি দিল। ব্রোচ শহরের অভিমুখে অভিযান শুরু হলো। আলি মহম্মদের ভাষায়: "অর্থ, সম্পত্তি বা নিজের জন্মস্থানকে নগণ্য জ্ঞান করে যুবক, ছোট ও বড়—সপরিবারে তাদের প্রিয় জীবনকে তুচ্ছ মনে করল এবং আহমেদাবাদের দিকে যাত্রা শুরু করল।"[৪২]

ফরাসি পর্যটকও এই ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার লোকবিশিষ্ট অভিযাত্রী দলকে নায়কবিহীন ও নিম্নমানের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বলে অভিহিত করেছেন। ব্রোচ শহরের ফৌজদার সপরিবারে এদের হাতে নিহত হলেও শহরের অন্যান্য অধিবাসী বা রায়তদের ওপর কোনো অত্যাচার করা হয়নি। এরা একটি প্রাকার গড়ে মুঘল সৈন্যকে প্রতিরোধ করে এবং মার্তার সাক্ষ্য অনুযায়ী—

আওরঙ্গজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে সুলতান বলে ঘোষণা করে। দ্বিতীয়ত—এই দলটি শহরেই থাকে এবং অন্যান্য অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগে সচেষ্ট হয় না। শেষ পর্যন্ত মুঘলসৈন্য শহর দখল করল এবং প্রতিরোধ ও ধর্মীয় উন্মাদনায় মাতিয়ারা তীব্র সংগ্রাম করেও পরাজিত হলো—"তাদের আধ্যাত্মিক গুরুর মৃত্যুর পরিবর্তে তারা জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত ছিল। এবং স্বর্গে তাদের মৃত্যুর পরিবর্তে উচ্চস্থান লাভে ইচ্ছুক ছিল, তাই তারা নির্ভীকভাবে জীবন নিয়ে জুয়া খেলল।"[৪৩]

এমনকি বন্দী মাতিয়ারাও স্বর্গে তাদের সহযাত্রীদের সঙ্গে মেশবার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি তাদের মেরে ফেলবার জন্যে মুঘল সৈন্যদের কাছে অনুরোধ করেছিল।

এখন এই বিদ্রোহের কয়েকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে দেখা যায়, বিদ্রোহের মধ্যে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রভাব থাকলেও বিদ্রোহের মূল কারণগুলো ছিল অর্থনৈতিক। এই বিদ্রোহে কারিগর, ছোট বণিক ও কৃষকদের একটা সমাবেশ হয়েছিল বলে আমরা মনে করতে পারি। কারণ, ১৬৮০-৮৫ সনে গুজরাটের ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ অবনতি দেখা যায়। বিক্ষোভটি সরাসরি মুঘল রাষ্ট্রশক্তির দিকেই পরিচালিত হয়। ফৌজদার ছাড়া অন্য কারো প্রতি কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়নি। মার্তাও স্থানীয় শাসনকর্তাদের অত্যাচারকেই বিদ্রোহের প্রধান কারণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। ধর্মে বিশ্বাস এদের সংগ্রাম স্পৃহাকে গঠিত করেছিল ও সংহতি এনেছিল।

আবার, এই বিদ্রোহ সুসংগঠিত ছিল না। শহর অভিমুখে অসংগঠিত উপায়ে পরিবার সমেত অভিযান এবং শহরের প্রাকার রক্ষায় দুর্বলতাই তার প্রমাণ। এরা নিজেদের যোগও করেছিল মুঘল বিদ্রোহী রাজপুত্র আকবরের বিক্ষোভের সঙ্গে, এবং মার্তা এর পেছনে মুঘল সামন্তদের হাত আছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৪৪] অর্থাৎ কোনো স্পষ্ট ভবিষ্যতের ধারণা এদের মধ্যে ছিল না। অত্যাচারী শাসকের পরিবর্তে সৎ শাসকের অবস্থিতিই এদের কাম্য ছিল। ফলে, বিশেষ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসাবেই এই আন্দোলন সংগঠিত হয়, সার্বিকভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে বলে মনে হয় না। অন্যান্য অঞ্চলের বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা কিংবা মারাঠা বা শিখদের মতো ভ্রাম্যমাণ গেরিলা যুদ্ধের (জঙ্গ-ই-কজ্জাকি) আশ্রয় না নিয়ে একটি অঞ্চলে স্থায়ী হয়ে মুঘল সৈন্যের মোকাবিলা করা—এই আন্দোলনের অচলাবস্থাকেই সূচিত করে।

ক. কোলি কৃষক-সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ :

সমগ্র মুঘল আমল জুড়ে গুজরাটের কোলি কৃষকরা সুযোগ পেলেই বারবার বিদ্রোহ করেছে। এই কোলিরা গুজরাটের জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ। প্রাচীনকালে গুজরাটের ভূখণ্ড রাজপুত ও কোলিদের অধিকারে (তসরুফে রাজপুত ওয়া কোলিয়াম) ছিল।[৪৫] মনে হয়, কোলিরা পূর্বে আদিবাসী থাকলেও পঞ্চদশ শতক থেকে এরা বর্ণ ব্যবস্থায় প্রবেশ করছিল ও জাতে ওঠার একটা চেষ্টা করছিল। গুজরাটের অন্য কৃষক সম্প্রদায় কুনবিদের মতো এরা বাণিজ্যিক উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল না। সুলতানি আমলে এই কোলিদের দমন করতে মুসলিম শাসকরা সচেষ্ট হন এবং এদের চৌকি ও পাহারার কাজে নিয়োজিত করা হয় (চৌকি ওয়া পাহারাদারে ইন মকান খবরদারি)। এদের মধ্যে ক্ষুদে ক্ষমতাশালী নায়কদের (পাটিদারদের মতো সম্পন্ন জমিদার নয়) উত্থান হয় এবং রায়তি গ্রাম থেকে 'গেরাস' ও 'ভয়দল' নামে ধার্য সংগ্রহ করতে থাকে।[৪৬]

তবে এদের মধ্যে সাধারণ কৃষক ও ক্ষেতমজুরও ছিল। এদের সর্দাররা অবশ্য রাজপুতদের সঙ্গে দীর্ঘদিন মেলামেশা করার ফলে ক্ষত্রিয় বলে দাবি করছিল, কেউ কেউ কোলি মেয়েদের বিয়ে করে। কৃষিকাজে কুনবিদের মতো দক্ষ না হওয়ায়, বা তখনো আদিবাসী থেকে বর্ণব্যবস্থায় যাওয়ার প্রক্রিয়া চলতে থাকায় লুঠতরাজে এরা মাঝে মাঝে অংশ নিত। একদিকে কৃষকদের গোরু চুরি করা ও অন্যদিকে ক্যাম্বেতে হুমায়ুনের মতো মুঘল সম্রাটের শিবির লুঠ করা—দুটোতেই এরা অংশগ্রহণ করেছিল।[৪৭]

এই জাতে ওঠার চেষ্টার সঙ্গে স্বভাবতই গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা জড়িত ছিল এবং এই কৃষক সম্প্রদায়কে বারবার বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন বলা হয়েছে। আলি মহম্মদ বলেছেন : কোলিরা সবসময় বিদ্রোহের সুযোগ খোঁজে এবং তাদের মাথায় সবসময় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে।[৪৮] সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে সুযোগ পেলেই এরা মাথা চাড়া দিয়েছে। আওরঙ্গজেবের আমলে দারাশিকোর নাম করে একজন লোক এদের মধ্যে বিক্ষোভের আগুন জ্বালায় এবং চানওয়ালের দুঁদে কোলি তার পেছনে মদত জোগায়, মহাবৎ খান সেই বিদ্রোহ ধ্বংস করেন। পরে যখন মারাঠা সর্দার ধনাজী যাদবের নেতৃত্বে গুজরাট আক্রান্ত হয়, তখন কোলিরা সুযোগ বুঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

"ফৌজদার ও থানাদারদের শাস্তিপ্রদান ও শাসনের দরুন বিদ্রোহী কোলিরা বিস্মরণ ও অবহেলার কোণে আশ্রয় নিয়েছিল। এখন আবার তারা প্রত্যেক কোণ ও দিক থেকে জেগে উঠল, তাদের পুরনো স্বভাবে ফিরে গেল এবং গোলমাল শুরু করল।"[৪৯]

চানওয়াল ও কাদি অঞ্চলে কোলিদের প্রতিরোধ চলতেই লাগল। বরোদা শহর দুদিন এদের দখলে থাকে। আলি মহম্মদের পিতা যখন অবস্থার সরেজমিন তদন্তে যান, তখন ধোলকার রায়তরা আমিন ও ফৌজদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধেই যে তাদের লড়াই,—একথা স্পষ্ট ভাষায় জানায়। আবার, মুমিন খানের পেশকাশ সংগ্রহের বিরুদ্ধে গুজরাটের সবরমতি অঞ্চলের জমিদাররা কোলিদের সংগঠিত করে দীর্ঘদিন যুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত মুবারিজ খান (১৭১০-১২ খ্রী.) কোলিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান করে তাদের গ্রাম ও বসতি ধ্বংস করেন এবং তখন তারা পিপলাদ পরগনার দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। সেখানে তাদের ঘিরে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড করা হয়।[৫০]

এখন, আমরা যদি এই বিদ্রোহ বিশ্লেষণ করি, তবে আবার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। প্রথমে কোলিরা উচ্চাবচ মালভূমি ও সমতলভূমি উভয় অঞ্চলেই ছড়িয়ে ছিল এবং এদের বিক্ষোভও বিক্ষিপ্তভাবে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল থেকে জাহান্দার শাহের রাজত্ব পর্যন্ত চলেছিল। বিক্ষোভের কতকগুলি কারণের আভাস পাওয়া যায়। একদিকে এই কোলিরা এই অঞ্চলের আদিম বাসিন্দা এবং তার ফলে তাদের সর্দাররা কখনোই তাদের পুরনো অধিকারের কথা ভুলতে পারেনি। ফলে, নানা উপায়ে এরা উদ্বৃত্ত সম্পদের ওপর এদের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করত। পাহারাদারি অধিকারের স্বত্বকে (বন্থ) প্রসারিত করে রাজস্ব আদায়ের স্বত্বে (তলপদ) রূপান্তরিত করা এবং রাজস্বকে অন্যান্য ধার্যের মধ্যে ধরে আত্মসাৎ করার কথা মিরাৎ-এই বলা হয়েছে। ফলে সংঘাত অনিবার্য ছিল। অন্যদিকে সাধারণ 'কোলি' কৃষকরা আমিন ও ফৌজদারের অত্যাচারে জর্জরিত হচ্ছিল। এর সঙ্গে জড়িত ছিল সম্প্রদায় হিসেবে বর্ণব্যবস্থায় সম্মানজনক স্থান পাবার চেষ্টা। এই প্রচেষ্টা এদের মধ্যে একটা সংহতি ও মারমুখী ভাব এনে দিয়েছিল, কারণ সামাজিক প্রতিষ্ঠার উচ্চাশা বহু সময় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে চরিতার্থ হবার একটা সম্ভাবনা দেখা যায়।

কিন্তু এই সংহতি যে খুব দানা বেঁধেছিল তা নয়। এর কারণ বলা মুশকিল। হয়তো গুজরাটের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে কোলিদের বিস্তৃতি এবং কোলিদের মধ্যে ক্ষুদে সর্দার, ক্ষুদে চাষী ও ভূমিহীন কৃষক ইত্যাদি নানা স্তরের অবস্থিতি—এই তুলনামূলক বিচ্ছিন্নতার সম্ভাব্য কারণ হলেও হতে পারে। আমরা দেখতে পাই, কোলিরা নানাভাবে নানা সময়ে রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষীদের মদত দিয়েছে। দারাশিকো নামধারী একজন ফকির এদের সাহায্য পায়। মারাঠা সর্দার ধনাজী যাদবের সাহায্যকারী হিসেবে এরাও বিদ্রোহ করে। রাজপুত জমিদারদের সঙ্গেও এদের সংযোগ ছিল। নিজেদের নেতা বা নায়ক এরা সেভাবে বেছে নেয়নি, বা শিখ অথবা মারাঠাদের মতো এক ধরনের স্বতন্ত্র আঞ্চলিক ক্ষমতা দখলেরও

চেষ্টা করেনি। ফলে, এইসব বিদ্রোহের কোনো কেন্দ্রবিন্দু ছিল না। সর্দারদের হয়তো অস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল, এইসব বিদ্রোহের মাধ্যমে কিছুটা স্থানীয় ক্ষমতা পেয়ে, অথবা প্রতিরোধী রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্থায়ী সমাজে মর্যাদা লাভ করা মাত্র। এখানেই এর দুর্বলতা নিহিত ছিল।

খ. কুর্মি কৃষক-বিদ্রোহ (১৬৭০-৮০ খ্রী.):

আওরঙ্গজেবের আমলে একটি কুর্মি কৃষক-বিদ্রোহ হয়। বিদ্রোহের সময় ১৬৭০-৮০ সনের মধ্যে। বর্তমান আমেথি অঞ্চলে জগদীশপুরের জমিদার ছিল বায়েস রাজপুতরা। তাদের কৃষক ছিল কুর্মিরা। এদের মধ্যে দাসীরাম বলে এক কুর্মি প্রচারকের উদ্ভব হয় এবং সে নিজেকে 'পীর' বলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে থাকে। এরা প্রায় ৪২টি গ্রামের কৃষককে সংগঠিত করে ও জমিদারকে খাজনা বন্ধ করে দেয় এবং প্রতিবেশী মুসলিমদের কাছেও আহ্বান জানায়। প্রথম দিকে অবশ্য মুঘল অশ্বারোহীদের সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু শেষে একজন হিন্দু ছলনা করে দাসীরামকে হত্যা করে এবং হত্যাকারী তালুকদারি সনদ লাভ করে।[৫১] মুঘলরাষ্ট্রও এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়।

এই কৃষক-বিদ্রোহ মূলত জমিদার-বিরোধী বিদ্রোহ। লক্ষণীয় যে, এই বিদ্রোহেও ধর্মের একটি ভূমিকা ছিল এবং মুঘল রাষ্ট্রশক্তি শেষের দিকে স্বধর্মাবলম্বী কৃষক-বিদ্রোহের বিরুদ্ধে যেতে দ্বিধাবোধ করেনি, এবং বিদ্রোহ দমনকারী হিন্দুকে তালুকদারি দিয়ে পুরস্কৃত করেছে।

গ. সৎনামি কৃষক-বিদ্রোহ (১৬৭২ খ্রী.):

মুঘল আমলে আর একটি ব্যাপক কৃষক-বিদ্রোহ করেছিল সৎনামিরা। এরা এমনিতে একটি প্রতিবাদী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক ছিল।[৫২] এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বীরভান বলে একজন ধর্মপ্রচারক, যিনি ১৫৪৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। মতান্তরে তাঁর জন্মতারিখ ১৬৫৭ খ্রী.। তিনি নিজেকে উধো-কা-দাস বা উধোর দাস বলে প্রচার করেন এবং এই উধোর মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের প্রকাশ দেখেন (মালিক-কা হুকুম)। এরা একেশ্বরবাদী ছিল। এদের ব্রজভাষায় লেখা ধর্মাচরণ সম্পর্কে পুঁথি আছে এবং তা প্রতি বিকেলে এদের জমায়েতে (জুমলাঘর বা চৌকি) মেয়ে-পুরুষ মা ও শিশু নির্বিশেষে শিষ্যদের সামনে পড়া হতো। খাফি খান এদের সম্পর্কে বলেছেন:

"এই হিন্দু ফকিররা সৎনামি ছিল। পরগনা মেওয়াট ও নারমুলের চারদিকে চার-পাঁচ হাজার ঘর (খানেদার) লোকের বসতি ছিল। যদিও মুণ্ডিয়ারা বৈরাগীদের মতো বেশবাস করত, তথাপি তাদের বেশির ভাগের পেশাই ছিল চাষবাস (জেরায়ৎ) এবং অল্প পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করা (তেজারতে পিশগানে কম

মাইয়ে), তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকেদের মতো জীবনযাপন করে ভালো নাম (নেক্‌নাম) অর্জন করার অভিলাষী ছিল, যার সমার্থকই হচ্ছে সৎনাম। তারা সৎ উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদ (কসব-ই-হলাল) ছাড়া অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদ (মালে হারাম) আদৌ চাইত না। তবে, কেউ যদি এদের ওপর হুকুমতের নামে অত্যাচার বা জুলুম করত, তবে এরা তা সহ্য করত না এবং এদের অনেকেই অস্ত্র ধরত।"[৫৩]

মাসির-ই-আলমগিরি-তেও এদের মুণ্ডিয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এদের মধ্যে নিচু জাতের হিন্দু ও কারিগরদের প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে। সরকারি ইতিহাসবিদ বলেছেন : "নিচু লোকদের বিদ্রোহী দল যেমন স্বর্ণকার (জরগার) ও ছুতোর (দুরুদ্‌গার), ও মেথর (কননস) ও চামার (দববাগ) এব অন্যান্য নিচু (আজলাফ) পেশার লোকেরা।"[৫৪] মাসির-উল-উমারাতে সৎনামিদের প্রভাব নিচু জাত ও কারিগরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বলা হয়েছে। ভৌগোলিকভাবে পূর্ব পাঞ্জাবের মহেন্দ্রগড় জেলায় এদের বসতি ছিল। আবুল ফজল মামুরি এদের মধ্যে ধান্য বিক্রেতা বা বক্কালদের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন।

এরা যে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নিচু জাতের লোক তা প্রকাশ পেয়েছে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ঈশ্বরদাস নাগরের ইতিহাসে। তিনি জানিয়েছেন : "অত্যন্ত নোংরা অভ্যাসের জন্যে এই সম্প্রদায় দুষ্ট, নোংরা এবং আদৌ বিশুদ্ধ নয়। ...এদের সম্প্রদায়ের নিয়ম অনুযায়ী এরা হিন্দু বা মুসলিমের মধ্যে কোনো তফাৎ করে না (তফারিকে আজ মুসলমান ওয়া হিন্দ নমিকুন্দ) এবং শুয়র (খুগ) ও অন্যান্য নিষিদ্ধ জিনিস খায়...ব্যভিচার এদের কাছে কোনো অপরাধ নয়।"[৫৫] এদের ১০টি নির্দেশের অন্যতম সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, মানুষ বা মূর্তির কাছে মাথা নিচু কোরো না।

এদের সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির সংঘাতে কোনোরকম ধর্মীয় বিদ্বেষের কোনো ভূমিকা ছিল না। কারণ ছিল একেবারে পার্থিব। খাফি খান এইভাবে বর্ণনা করেছেন : "একদিন নারনুলের নিকটে একজন সৎনামি চাষীর সঙ্গে ক্ষেত রক্ষণাবেক্ষণকারী এক পেয়াদার তীব্র বিরোধ হয়। পেয়াদা তার মোটা লাঠি দিয়ে কৃষকের মাথা ভেঙে দেয়। একদল সৎনামি জমায়েৎ হয়ে পেয়াদাকে প্রহার করে এবং তাকে মৃতের মতো ফেলে দিয়ে যায়। শিকদার এই খবর পেয়ে লোকদের গ্রেফতার করতে একদল পেয়াদা পাঠায়। সৎনামিরা জড়ো হয়, পেয়াদাদের প্রহার করে এবং কাউকে কাউকে আহত করে এবং তাদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়।"[৫৬]

এর পরেই ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু হয়। নারনুল শহরের ফৌজদার এদের হাতে নিহত হয় এবং শহর এদের দখলে চলে যায়। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন

গরিবদাস হাডা। এরা নিজেদের থানা স্থাপন করে এবং কর সংগ্রহ করতে থাকে। এদের অধিকৃত এলাকা থেকে দিল্লির দূরত্ব ছিল ১৬ থেকে ১৭ ক্রোশ। ঈশ্বরদাস নাগর এদের বিরুদ্ধে ব্যাপক লুঠতরাজের অভিযোগ আনেন। খাফি খান সে দায়িত্ব চাপান কিছু রাজপুত জমিদারদের ওপর, যারা এই গোলমালের সুযোগ নেয়। তারাও কেউ কেউ রাজস্ব দিতে অস্বীকার করে ও বিদ্রোহ করে। এদের বিরুদ্ধে বিপুল সৈন্য পাঠানো হয় ও তীব্র যুদ্ধের পরে এদের দমন করা হয়।

সৎনামিদের বিদ্রোহের তীব্রতা ও বীরত্বের কথাও সমসাময়িক ইতিহাসবিদদের সাক্ষ্যে বারবার স্বীকার করা হয়েছে। শিকদার ও ফৌজদার সসৈন্যে পরাজিত ও নিহত হয় এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র সৎনামিদের হাতে যায়। খাফি খান স্পষ্টই বলেছেন, রাজকীয় সৈন্যরা সৎনামিদের ভয়ে ভীত হয়েছিল এবং বিদ্রোহ দ্রুত প্রসারিত হয়েছিল। নিম্নশ্রেণীর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েও সৎনামিরা শেষ যুদ্ধে রাজকীয় সেনাবাহিনীর মোকাবিলা এত দুঃসাহসের সঙ্গে করেছিল যে সাকী মুস্তাইদ খান তাঁর বর্ণনায় মহাভারতের যুদ্ধের উপমা ব্যবহার করেন। ঈশ্বরদাস নাগরের হিসেব মতো গরীবদাস হাডা সমেত ২ হাজার সৎনামি ও ৪০ জন মুঘল সৈন্য মারা যায়।

যুদ্ধের তীব্রতা, সৎনামিদের সাহস ও এই নিচু জাতের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রাজশক্তির মনোভাব সরকারি ইতিহাসবিদ এইভাবে লিখেছেন: "এরা সাধারণত দুর্বল ও সহজবধ্য। আমি জানিনা কেন কী দুর্বিনীত অহংকার এদের মাথায় চাড়া দিয়ে উঠল। এদের গর্দানে মাথা থাকাটাই যেন এদের কাছে বোঝা হয়েছিল। এরা নিজেদের পথেই হত্যার জালে জড়িয়ে পড়ল। ... মেওয়াট পরগনার একদল গোলমাল পাকানো লোক হঠাৎ পাখাওয়ালা পিঁপড়ের মতো মাটি ফুঁড়ে বেরলো এবং পঙ্গপালের (মলগ) মতো আকাশ থেকে ছড়িয়ে পড়ল। এরা বিশ্বাস করত, যদি একজন মারা যায় তবে তার জায়গায় অন্যজন উঠবে।"[৫৭] রাজশক্তির কাছে কৃষক বিদ্রোহীরা চিরকালই অজ্ঞ ও অন্ধ।

এই বিদ্রোহকে এবার আমরা বিচার করতে পারি। এ কথায় সন্দেহ নেই যে, অল্প পুঁজিসম্বল ব্যবসায়ী ও গ্রামীণ কারিগরদের বিদ্রোহের বিশুদ্ধরূপ সৎনামি আন্দোলনে প্রতিফলিত হয়েছে। মুঘল অর্থনীতির সংকটে কৃষকদের সঙ্গে শিকদারের পেয়াদার সংঘর্ষই এই বিদ্রোহের জন্ম দেয়। এখানেও একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংহতি ও চেতনা কৃষকদের মধ্যে এক লড়াকু মনোভাব এনে দেয়।

এটাও লক্ষণীয় যে, এই বিদ্রোহ একেবারে রাজধানীর সন্নিহিত অঞ্চলে হয় এবং কৃষকরা নিজেদের একটা 'রাজ' স্থাপন করার মতো ক্ষীণ চেষ্টা করেছিল।

যেহেতু সৎনামিদের নিজেদের একটা সুসংগঠিত ধর্মীয় সংস্থা ছিল—তাই সেগুলোর মাধ্যমে নিজেদের এলাকায় শাসন চালানো বোধহয় একেবারে অসম্ভব ছিল না। আবার, এইসব অঞ্চলের জমিদাররাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়, যদিও নেতৃত্ব তাদের হাতে ছিল বলে মনে হয় না। তারা অবস্থার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ জানায় মাত্র।

এক পর্যায়ে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সমাজের নিচু স্তরের ও নিচু জাতের সব রকমের মানুষের মধ্যে যে বিক্ষোভ ছিল, তা সৎনামি বিদ্রোহের আকস্মিকতায় ও তীব্রতায় বোঝা যায় এবং এই তীব্রতার স্বরূপ বোঝাও তৎকালীন রাজশক্তির দাক্ষিণ্যপুষ্ট সমসাময়িক ইতিহাসবিদের চেতনার বাইরে ছিল। সৎনামিদের প্রতি তাদের ক্রোধ, ঘৃণা ও তাদের বিদ্রোহে সম্পূর্ণ বিস্ময় প্রকাশই শোষিতদের প্রতিবাদী আন্দোলনের প্রতি শোষকের শ্রেণী-মনোভাব প্রকাশ করেছে।

ঘ. জাঠ বিদ্রোহ :

বিশুদ্ধ কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের বিদ্রোহের রূপ দেখে আমরা এবার জমিদার ও কৃষকদের সম্মিলিত বিদ্রোহের দু-একটি রূপ বিশ্লেষণ করতে পারি। তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দিল্লি ও মথুরা অঞ্চলে জাঠদের প্রতিরোধ-আন্দোলন। এটা লক্ষণীয় যে, প্রাক-আওরঙ্গজেব আমলে এই অঞ্চলে কৃষকদের চিরবিদ্রোহী বলে চিত্রিত করা হয়েছে। জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের আমলে এই অঞ্চলের গ্রামবাসীরা বারবার কর দিতে অস্বীকার করে এবং এদের বিরুদ্ধে বারবার অভিযান চালানো হয়। মাসির-উল-উমারেতে বলা হয়েছে যে, এই অঞ্চলের লোকেরা সমৃদ্ধ কৃষক, গ্রামগুলিতে দুর্গ আছে এবং আগ্রা ও দিল্লির সীমান্ত অঞ্চলে তারা লুঠতরাজ করত। শাহজাহানের আমলে ফৌজদার মুর্শিদকুলি খান তুর্কমান এদের সঙ্গে লড়াই করেন ও নিহত হন।

জাঠরা মূলত কৃষিজীবী শ্রেণী এবং এদের নায়করা আঞ্চলিক জমিদার ছিল। তিলপথের জমিদার গোকলা জাঠ গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের জমায়েৎ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল—মথুরার ফৌজদার আবদুল নবীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। ১৬৬৯ সনে রেওয়ার চন্দর খান এবং সরখুদের কৃষকরা মুঘল রাজস্ব সংগ্রহকারীদের প্রতিরোধ করে। ১৬৮৬-৮৮ সনে রাজারাম জাঠ সিনসিনওয়ার কৌমকে নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন এবং কৃষকরা মুঘল ফৌজদার ও জায়গিরদারদের খাজনা দিতে অস্বীকার করে। রাজারাম নিহত হলেও চূড়ামন জাঠ-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ চলতে থাকে।

চূড়ামন জাঠের বিদ্রোহের মোটামুটি দুটো দিক আছে। একদিকে চূড়ামন জাঠ নিজে চামারদের সাহায্য নেন ও তাদের দিয়ে ভরতপুর এলাকার দুর্ভেদ্য জঙ্গল পরিষ্কার করে নিজের ক্ষমতার স্থায়ী এলাকা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

এখানে তিনি নিজে জমিদার পরিবারের ছেলে এবং তাদের ঐতিহ্যকে কাজে লাগাচ্ছেন।

অন্যদিকে তিনি গোটা অঞ্চল জুড়ে ব্যবসায়ীদের এলাকায় লুঠতরাজ করে সম্পদ সংগ্রহ এবং তাদের ওপর করধার্য করতে শুরু করলেন। ঈশ্বরদাস নাগরের ভাষায়: "আগ্রা ও দিল্লির সব পরগনা লুণ্ঠিত হলো···আত্মধ্বংসকামী লোকের হাঙ্গামায় যাত্রাপথ ও রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল।"[৫৮] পরে ফাররুখসিয়ারের রাজত্বে চূড়ামনকেই ঐ অঞ্চলের কর সংগ্রহের ভার অর্পণ করা হলো এবং জাঠ ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে মুঘল রাষ্ট্রক্ষমতা স্বীকার করে নিল।

জাঠ প্রতিরোধ আন্দোলন জোরদার করার পেছনে নিচু জাতের ভূমিকা কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ। ভরতপুর দুর্গের পরিখা রক্ষণাবেক্ষণের ভার চূড়ামন চামারদের দিয়েছিলেন। তাদেরকে তিনি অন্যান্য গ্রাম থেকে জোর করে ধরে এনেছিলেন। অন্যদিকে এই নিচু জাতদের সঙ্গে জাঠ গ্রামগুলির সম্পর্ক অন্য ধরনেরও ছিল। সৈয়দ নুরুদ্দিন হুসেন বিরচিত "সরগুজশতে নাজিবদ্দৌল্লা"-য় একটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আছে। ১৭৬৫ সনে নাজিবদ্দৌল্লা হরিয়ানার সোনেপাতের গ্রামের জাঠদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতে যান। তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে সেখানে বলা হয়েছে:

"গ্রামে গাদা বন্দুকধারী এক হাজার লোক আছে এবং বর্শা ও ছোট অস্ত্র হাতে দু-হাজার লোক আছে। গ্রামটির চারপাশে দুই মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল আছে এবং চারপাশে পরিখা কাটা আছে। ···হরিয়ানা অঞ্চলে তিনশো তুর্কি ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের প্রত্যেকের কাছে বন্দুক আছে। তারা জাতে মেথর। যদি কোনো যুদ্ধ করতে হয়, গ্রামবাসীরা সাহায্যের জন্যে তাদের ডেকে পাঠায়। পরিবর্তে উপহার হিসেবে গ্রামবাসীরা প্রত্যহ তাদের একসের আটা, ডাল ও তামাক দেয়। যুদ্ধ শেষ হবার পর ইনাম হিসেবে তারা শস্য পায়। ···হিন্দুস্থানে মেথররা সাধারণত ময়ূরপুচ্ছ মাথায় গুঁজে রাখে। এরাও এইভাবে বেশভূষা করে যাতে এদের পৃথক করে রাখা হয়। কারণ তা না হলে এদের পোশাক এতই মহার্ঘ যে এদের আলাদা করে চেনা খুব শক্ত।" নাজিবদ্দৌল্লার কাছে দরবার করতে জাঠদের প্রতিনিধি হিসেবে চামাররা এসেছিল। ব্রজভূমিতে চূড়ামনের হাতে বাধ্যতামূলকভাবে আটক চামাররা ও হরিয়ানায় ভ্রাম্যমাণ ভাড়াটে মেথর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রভেদ অনেক। তবে উভয় ক্ষেত্রেই জাঠরা তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ভিন্ন উপায়ে নিম্নবর্ণভুক্ত লোকদের ব্যবহার করেছে।[৫৯]

আখারাৎ-ই-দরবার-ই-মুয়ালায় জাঠদের সঙ্গে মুঘলদের সংঘর্ষ মুনশি কেশো রায় তার প্রভু মুঘল সেনাপতি জয়পুরের মহারাজাকে বিশদভাবে জানিয়েছে।[৬০] মথুরা থেকে জয়পুর এবং মেওয়াট থেকে চম্বল পর্যন্ত এদের লুঠতরাজের বিস্তৃতি ছিল। আবার, এই লুঠতরাজ অনেক সময় মুঘল

ফৌজদারের সঙ্গে যোগসাজসেই হতো এবং লুঠের মাল ভাগাভাগি হতো মথুরার ফৌজদার কাজিল খান এই দুর্নাম অর্জন করেছিলেন। জাঠরা ভাড়াটে সৈন্যেরও কাজ করেছে। চৌহান ও শেখাওয়াট রাজপুতদের মধ্যে জমির লড়াইতে রাজারাম প্রাণ হারান।

জাঠ সংগঠনের ভিত্তি ছিল স্থানিক কৌম। সিনসেনা গ্রামের সিনসিনওয়ার ও সাগার গ্রামের সাগার জাঠরাই ছিল জাঠ বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র। এইসব গ্রামগুলো বিশ মাইলের মধ্যেই অবস্থিত ছিল এবং আগ্রা থেকে ৪০ ক্রোশ দূরে এই গ্রামগুলোকে ঘিরেই ভরতপুর রাজ্য গড়ে ওঠে। বদন সিং ও সুরজমলও বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে বিভিন্ন জাঠ কৌমের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে আগ্রা ও মথুরা অঞ্চলে তাঁর ক্ষমতা স্থাপন করেন। এতদসত্ত্বেও ব্রজভূমি বা ব্রজমণ্ডলেই জাঠ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল, কখনো দোয়াবের উপরিভাগে বিস্তৃত হয়নি। এর আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা কৌম ও গোষ্ঠীভিত্তিক গ্রামজ ক্ষমতার ফল।

লুঠতরাজ জাঠ বিদ্রোহের এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ হলেও রাজস্ব প্রদানে গ্রামবাসীদের অনিচ্ছাও জাঠ বিদ্রোহের তীব্রতার পেছনে কারণ হিসেবে কাজ করেছে। আগ্রার কৃষকদের বিদ্রোহী মনোভাব ও রাজশক্তির রাজস্ব আদায়ের বিরোধিতার কথা মানুচ্চির রচনায় বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। তাই গোকলা জাঠের সপক্ষে তিলপথের কৃষকদের মরণপণ সংগ্রামের পেছনে নিজেদের বিক্ষোভও কাজ করেছিল।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও জাঠ বিদ্রোহে উঠতি জমিদারদের প্রাধান্যই অক্ষুন্ন ছিল। অষ্টাদশ শতকে শাহ ওয়ালিউল্লা লিখেছেন "জাঠরা যে জমিগুলো নিজেদের কর্তৃত্বে এনেছে (মুলকহয়ি কে দর তসরুফে খুদ গেরেফতে আসত) সেগুলো তাদের নিজস্ব নয় বরং অন্যের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া। এখনো সেই গ্রাম-গুলোর মালিকানরা আছে।"[৬১] অন্যান্য তথ্য দ্বারাও এই কথা সমর্থিত হয়।

আইন-ই-আকবরীতে সুবা আগ্রার মোট ১৩টি সরকার ও ২০৩টি পরগনার কথা আছে। মোট ৭টি সরকারের ১৫৫টি মহালের মধ্যে ২২টি মহালে জাঠ ও ৭২টি মহালে রাজপুত জমিদারদের উপস্থিতি দেখি। অর্থাৎ আগ্রার ৭৬ ভাগ এলাকার শতকরা ১৪ ভাগে জাঠরা এবং ৪৬ ভাগে রাজপুতদের বিভিন্ন গোষ্ঠী জমিদারি ভোগ করছে। আগ্রার কয়েকটি পরগনায় জাঠ জমিদারদের অস্তিত্ব ছিল না। যেমন সরকার নারওয়ার ও মান্দালে রাজপুত জমিদার গোষ্ঠীরই একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। অন্যদিকে সিপাহি বিদ্রোহের প্রাক্কালে এই অঞ্চলে যে তদন্ত চালানো হয় তাতে দেখা যায়, পুরনো সুবা আগ্রার পরগনায় রদবদল হলেও এলাকার জমিদারি এখন জাঠদের হাতে ৪০ থেকে ৫০ ভাগ এবং রাজপুতদের জমিদারি সেই অনুপাতে কমেছে। জাঠদের জোর জবরদস্তিরও

বিক্ষিপ্ত খবর পাওয়া যায়।[৬২] পরগনা ওলের রাজপুত জমিদারদের সুরজমল ক্ষমতাচ্যুত করেন। পরগনা সহার জায়গিরদারদের ইজারাদার হিসাবে ঠাকুর বদন সিং নিয়োজিত হয়েছিলেন। পরে জায়গিরদারদের দাবিদাওয়া নাকচ করে জাঠরা সেখানে জাঁকিয়ে বসল ও ভগবানপুরে গড় স্থাপন করল। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি মির্জা নজফ খান যখনই জাঠদের হারিয়ে দিচ্ছেন তখনই জমিদাররা সময়মতো রাজস্ব দিচ্ছে এবং যখনই নিজে হেরে যাচ্ছেন তখনই জমিদাররা বিদ্রোহ করেছে। জাঠ ক্ষমতার বৃদ্ধি বা হ্রাসের সঙ্গে জমিদার বিদ্রোহের তীব্রতার কম-বেশির সম্পর্ক অনুধাবনযোগ্য।[৬৩] আওরঙ্গজেবের আমলের কৃষক বিক্ষোভের ফল এই এলাকায় জাঠ জমিদাররাই শেষ পর্যন্ত ভোগ করে। এই জাঠ জমিদাররা বেশ সম্পদশালী ছিলেন। জহরৎ ছাড়াই জাঠ জমিদার মানকি রাম-এর গড়ে ৫০ হাজার টাকা নগদ ও প্রায় ৪০ হাজার টাকার শস্য পাওয়া গেছে। মোহনরাম নামে আরেকজন ৮০ লক্ষ টাকা নগদ অর্থের অধিকারী ছিলেন। তুলনামূলকভাবে জাঠ রাজা জবাহির সিং সৈন্যদের নিয়মিত মাইনে দিতেন এবং এজন্যে তাঁর কাছে চাকরি করার জন্যে ভাড়াটে যোদ্ধাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। এর সঙ্গে প্রাচীন রাজপুত রাজবংশ জয়পুরের ও মাড়ওয়ারের দেউলিয়া অবস্থা তুলনা করা যেতে পারে।

জাঠ বিদ্রোহের প্রথম স্তরে লুঠতরাজ, ভাড়াটে সৈন্য হয়ে কাজ করা ইত্যাদি আগ্রা ও মথুরার উঠতি জমিদারদের কাছে আয়ের উৎস ছিল। অধিকন্তু এই লুঠতরাজের মাধ্যমে তারা মুঘল কর্তৃপক্ষের পাল্টা এক কর্তৃত্ব গড়ে তুলতে পারত, কারণ লুঠতরাজের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বণিকরা নিয়মিত 'রাহাদার' ধরনের কর দিত। এই কর জাঠ কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নেবার নামান্তর। কৌম বন্ধন ও স্থানীয় ফৌজদারদের সঙ্গে যোগাযোগ এই আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে মাত্র। এই জাঠ জমিদারদের উঠে আসার পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকদের সশস্ত্র বিক্ষোভ। সামাজিকভাবে অপেক্ষাকৃত নিচু জাঠ জমিদাররা কৃষক-বিক্ষোভের সঙ্গে নিজেদের উচ্চাভিলাষ যোগ করেই ক্ষমতাদখল করতে সমর্থ হয়েছে। জাঠ বিদ্রোহে বর্ণ সংহতি, পুরনো গোষ্ঠীকে অবদমন করে নতুন গোষ্ঠার উত্থান, আঞ্চলিক কৃষক বিক্ষোভ ইত্যাদি কারণ একাকার হয়ে গেছে এবং মুঘল আমলে কৃষক-বিদ্রোহের জটিল চরিত্রের প্রতি আমাদের সচেতন করে দেয়। এই অবস্থাতেই চূড়ামনের উত্থান হয় এবং রাজপুতদের ক্ষমতাকে হ্রাস করে জাঠ জমিদাররা তাদের প্রভুত্ব স্থাপন করে।

কৃষক-বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে এইরকম এক 'আধা-ডাকাত আধা-জমিদার নেতার উদ্ভব বিচিত্র নয়। এই ঘটনা আমরা আরো দেখব ও শেষে আলোচনা করব। তবে, দাক্ষিণাত্যে এরকম আরেকজন ডাকাত সর্দারের বিশদ বিবরণ

পাওয়া যায়। তার সঙ্গে তুলনা করা বোধহয় খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না।[৬৪]

পাপ রায় নিজে ছিল মাদকদ্রব্য বিক্রেতা। ধীরে ধীরে সে ডাকাত-সর্দারে রূপান্তরিত হয়। সে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করে এবং আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ওয়ারাঙ্গল লুণ্ঠন করে। তার ধনসম্পদ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং বাহাদুর শাহের পক্ষাবলম্বন করার জন্যে পাপ রায় সম্মানিত হয়। কিন্তু স্থানীয় কাজির পরিবারকে অপহরণ এবং হিন্দু ও মুসলিম বণিক নির্বিচারে ব্যাপক লুঠতরাজ করার ফলে শেষ পর্যন্ত পাপ রায়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয় ও তাকে হত্যা করা হয়। এবং এটাও লক্ষণীয়, পাপ রায়ও তার নিজের দুর্গের এলাকায় গরিব লোকদের বাসয়ে বসতি স্থাপন করাচ্ছিল, অন্যান্য জমিদারদের জমি দখল করছিল এবং মুসলিম শাসকদের কাছে স্বীকৃতি লাভেও আগ্রহী ছিল।

এখন চূড়ামনের নেতৃত্বে জাঠ বিদ্রোহ ও পাপ রায়ের উত্থানের এক জায়গায় মিল আছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মুহূর্তে কৃষিসমাজ থেকে উদ্ভূত একশ্রেণীর লোক লুঠতরাজের মাধ্যমে আঞ্চলিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। মুঘল রাষ্ট্রশক্তি তাদের একাংকে দমনের চেষ্টা করে, আবার না পারলে তাদের ক্ষমতাকে স্বীকৃতি প্রদান করে ও মুঘল রাষ্ট্র-কাঠামোয় স্থানও দেয়। আঞ্চলিক ক্ষমতার সঙ্গে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার টানাপোড়েন এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এই ভারসাম্য মাঝে মাঝে কৃষিসমাজ থেকে ক্ষমতা দখলের জন্যে নতুন দাবিদারের উৎপত্তিতে বিপর্যস্ত হলেও শেষ পর্যন্ত উভয়েই এক ধরনের বোঝাপড়ায় পৌঁছায়। কারণ, কায়েমি ব্যবস্থাকে কোনো-না কোনোভাবে রক্ষা করায় উভয়েরই স্বার্থ আছে।

আবার, আরেক জায়গায় অমিল আছে। গোকলা বা চূড়ামন জমিদার, পাপ রায় সেখানে তাড়ি-বিক্রেতা। এবং গোকলা বা চূড়ামনের পেছনে জাঠ কৃষকদের একটা বর্ণগত সমর্থন আছে। তারা ঐ অঞ্চলের কৃষকদের রাজস্ব না দেবার মনোভাবকে, অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতাকে কাজে লাগিয়েছিল। পাপ রায় সেখানে একক এবং যতদূর জানা যায় যে, তার পেছনে ঐভাবে কোনো বর্ণের সমর্থন ছিল না। বরং তাড়-বিক্রেতারাই পাপ রায়কে ধরিয়ে দেয়। ফলে, চূড়ামন জাঠ সমাজের মূল শক্তির সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছিল, এবং কৃষক অসন্তোষের সঙ্গে নিজের উচ্চাভিলাষকে কাজে লাগিয়ে ছিল। বর্ণগত সংহতিও তাদের সহায় হয়েছিল। সেখানে পাপ রায় বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ, নিজের সেরকম কোনো সামাজিক ভিত্তিও ছিল না। তাই সে ধ্বংস হয় এবং জাঠ জমিদার ও কৃষকরা গড়ে তোলে ভরতপুর রাজত্ব।

ঙ কোচ বিদ্রোহ (১৬৬২ খ্রী.) :

মীরজুমলা যখন কুচবিহারে পুনরায় মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠা করে আসাম অভিযানে যান, তখন তাঁর সৈন্যবাহিনীর পেছনে কোচ রায়তরা আবার বিদ্রোহ করে,—যদিও সরকারি ইতিহাসবিদরা বিজিতদের প্রতি মীরজুমলার নরম মনোভাবের প্রচুর প্রশংসা করে গেছেন। এই বিদ্রোহও কেন্দ্রীয় মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভজাত। কুচবিহার জয় করার পর মুৎসুদ্দিরা অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই প্রত্যেক মহলের রাজস্ব সংগ্রহের জন্যে ঠিকমতো 'জমাবন্দী' বা হিসাবনিকাশ করতে শুরু করল, যাতে করে রায়তরা নিজেদের ইচ্ছামতো খাজনা না দিতে পারে। অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিধি ও শৃংখলা আনার চেষ্টা হলো। শাসনতন্ত্রের কাঠামোর শিথিলতার জন্যে রায়তরা যে সুবিধা পাচ্ছিল, তা মিলিয়ে গেল। ফলে, কৃষকরা পালিয়ে গিয়ে পূর্বতন পলাতক রাজার চারপাশে জড়ো হলো। শিহাবুদ্দিন তালিশের ভাষায়—"সাধারণ রাজস্ব সংগ্রহের জন্যে যে আইনকানুন বাদশাহের মুলুকে চালু হলো, তা জমিদার শাসিত এলাকায় বলবৎ ছিল না।"

তখন পলাতক রাজা পাহাড়ের পাদদেশে নেমে এলেন এবং লোকেরা (জমায়ে মরদুম) তার পেছনে যোগ দিল। স্থানীয় ফৌজদার মহম্মদ সালিহ মারা গেলেন। কোচবিহারের শাসনকর্তা ইসফানদিয়ারের জন্যেও প্রজারা গেরিলা কায়দায় অপেক্ষা করছিল। এক্ষেত্রে সামন্ত নৃপতি ভীমনারায়ণ তাঁর প্রজাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এক গোপন বোঝাপড়ায় এলেন ও মুঘল শাসনকর্তাকে সব পরিকল্পনা বলে দিলেন।[৬৫]

চ. শোভা সিংহের বিদ্রোহ :

বাংলা দেশে সমতুল্য আরেকটি জমিদার ও কৃষক-বিদ্রোহের নিদর্শন হলো শোভা সিংহের বিদ্রোহ। আবার, এই বিদ্রোহেরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যান্য বিদ্রোহের তুলনায় এই বিদ্রোহের উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের জানা তথ্য অপেক্ষাকৃত কম।[৬৬]

শোভা সিংহ বরোদা ও চেতুয়ার জমিদার ছিলেন। মেদিনীপুরের ঘাটালে দাশপুর অঞ্চলে তাঁর জমিদারির এলাকা ছিল। কেউ কেউ তাঁকে বাগদি ও বহিরাগত ক্ষত্রি বলে দাবি করেছেন। যাহোক, এই স্থান বাগদি প্রধান। বাগদিরা নিজেদের বর্ণক্ষত্রিয় বলে প্রচার করে থাকে এবং বাগদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপে সিংহদের বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। শোভা সিংহ কর্তৃক আয়োজিত বিশালাক্ষী দেবীর উৎসবে বাগদি ক্রিয়াকলাপের ছাপ সুস্পষ্ট। আবার কথিত আছে, শিবায়ন কাব্য-রচয়িতা কবি রামেশ্বরের পরিবারের সঙ্গে শোভা সিংহের

বিরোধের কারণ—তাঁর আয়োজিত পূজায় রামেশ্বরের বংশপুরুষ অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন।

ঐ অঞ্চলে প্রচুর মন্দির ও জলাশয় পাওয়া গেছে যা শোভা সিংহ তৈরি করেন। শোভা সিংহ প্রচুর উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছেন এবং রাঢ়ীয় শ্রেণীর ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণকে তিনি সভাপণ্ডিত ও বটব্যাল ব্রাহ্মণকে তিনি দেবতার পূজক নিয়োজিত করেন। তাদের প্রচুর ভূমিদানও করা হয়। দাশপুর থানার রাধাকান্তপুর গ্রামে মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে সামাজিক কার্য সম্পাদনের জন্যে মজুরের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে জনানন্দ দাশের সঙ্গে শোভা সিংহের বিরোধ হয় এবং তাঁর অলৌকিক কার্যে মুগ্ধ হয়ে শোভা সিংহ ঐ পরিবারকে প্রচুর নিষ্কর ভূমি দেন।[৬৭]

এই সমস্ত তথ্য একদিক থেকে ইঙ্গিতবহ। শোভা সিংহ তাঁর এলাকায় বাগদি প্রজাদের ওপর ভিত্তি করে বর্ণসমাজে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করেছেন। একদিকে তিনি নানা ধরনের জনহিতকর কাজ ও মন্দির তৈরি করে প্রতিপত্তি বাড়াচ্ছেন, অন্যদিকে ব্রাহ্মণদের ভয় বা প্রলোভন দেখিয়ে নিজের আয়োজিত সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করিয়ে সমাজে একটা প্রতিষ্ঠা-লাভে প্রয়াসী হয়েছেন। দ্বিজ হরিরাম তাঁর 'অদ্রিজামঙ্গল' শোভা সিংহের আনুকূল্যে রচনা করেন এবং এও দেখা যায় যে, স্থানীয় শক্তিশালী জমিদারদের সঙ্গে আত্মীয়তা বন্ধনে যেতেও শোভা সিংহ কিরকম উৎসুক। শোভা সিংহ বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারে কন্যার বিবাহ প্রদান করেন। লক্ষণীয়, বিষ্ণুপুর নিম্নবর্ণের জমিদার। তাঁরাও অনুরূপ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ও বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে আগেই সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।[৬৮] সুতরাং সেদিক থেকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা অভিলাষী শোভা সিংহের সঙ্গে তাদের বৈবাহিক বন্ধন কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।

আবার, শোভা সিংহের ক্ষমতাবৃদ্ধি যে এক ধরনের সামাজিক সংঘাতের সৃষ্টি করেছিল তার আভাস পাওয়া যায়। রামেশ্বরের কবিতায়, মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে এবং শোভা সিংহের মৃত্যু ও নারী-লোলুপতা সম্পর্কে উচ্চবর্ণের কথা-কাহিনীতে শোভা সিংহ একভাবে চিত্রিত হয়েছেন। অন্যদিকে, স্থানীয় বাগদি সমাজে নানা ধরনের ক্রিয়াকলাপে, স্থানীয় নামকরণে এবং নানা ধরনের প্রশস্তিমূলক ছড়ায় শোভা সিংহকে প্রজাপালক শাসক হিসেবেই দেখানো হয়। তাই শোভা সিংহের শক্তি সঞ্চয়ের সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠা-লাভের চেষ্টা লক্ষণীয় এবং তার পেছনে শক্তিশালী বাগদি কৃষক সম্প্রদায়েরও সমর্থন ছিল।

১৬৯৫ সনে শোভা সিংহের বিদ্রোহ হয়। রিয়াজ-উস-সালাতিন'এর বর্ণনায় দুটো বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত—লেখক শোভা সিংহের বিদ্রোহের বর্ণনায় আগে

সামগ্রিকভাবে গোটা সাম্রাজ্যে বিদ্রোহের বর্ণনা দিয়েছেন ও শোভা সিংহকে সেই বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে বসিয়েছেন। অর্থাৎ পরবর্তীকালে ইতিহাসবিদের চোখে শোভা সিংহের বিদ্রোহ সাম্রাজ্যব্যাপী সংকট থেকেই জাত।

আবার, শোভা সিংহের সঙ্গে বর্ধমানের জমিদার কৃষ্ণরামের প্রথম সংঘর্ষ হয়। গোলাম হোসেন স্পষ্ট বলেছেন, বর্ধমান-রাজের সঙ্গে শোভা সিংহের বিরোধ আগে থেকেই ছিল।[৬৯] মূল ফারসি গ্রন্থে কারণ খুব স্পষ্ট নয়। কৃষ্ণরাম রায় ১৬৮৯ সনে বর্ধমানের চৌধুরি হন এবং রাজস্ব সংগ্রহে মুঘলদের সাহায্য করেন। তিনি এই কাজে প্রচুর অর্থও সংগ্রহ করেন। ফরাসিরা ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে এঁকে মুখ্য ইজারাদার বলেছে। শোভা সিংহ কৃষ্ণরাম রায়ের কোষাগার থেকে ৩৯ লক্ষ টাকা লুঠ করেন। ফলে, রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে বর্ধমানের কানুনগোর সঙ্গে স্থানীয় জমিদারদের বিরোধ বাধা সম্ভবপর এবং তিনি সেজন্যে আঞ্চলিক বিদ্রোহের প্রথম আক্রমণের ধাক্কার শিকার হন।

এই বিদ্রোহের প্রাথমিক পর্যায়ে মুঘল সুবাদারের দুর্বলতা ও নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে শোভা সিংহ হুগলি পর্যন্ত দখল করেন। তিনি হুগলিকে কেন্দ্র করে গঙ্গার তীর ধরে বিস্তীর্ণ এলাকায় নৌ-বাণিজ্যের চুক্তি ও শুল্ক আদায় করতে লাগলেন এবং তার বিনিময়ে বিদেশি কোম্পানিদের নিয়মিত বাণিজ্যের অনুমতি দিলেন। তাঁকে হুণ্ডি সরবরাহ করতে জগৎশেঠ বংশের পূর্বপুরুষ মহাজন গোকুলচাঁদও সহায়তা করলেন।[৭০] এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শোভা সিংহ একটা বিস্তীর্ণ এলাকায় স্থায়ী ক্ষমতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং গুজব ছিল যে তাঁকেই বর্ধমানের জমিদারি দেওয়া হবে।

শোভা সিংহের সৈন্যবাহিনীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুঘলরাজ-বিরোধী কৃষকরা যোগ দেয় এবং তাদের হাঙ্গামার কথা স্থানীয় ইতিহাসে বলা হয়েছে। ইংরেজ ফ্যাক্টরি রেকর্ডেও একথা সমর্থিত হয়েছে।[৭১] এই আন্দোলনে বর্ণব্যবস্থার ভূমিকা থাকার জন্যে একটা সীমাবদ্ধতাও ছিল। এছাড়া, কৃষক-বিদ্রোহে সম্পদশালীদের প্রতি কৃষকদের তীব্র আক্রোশ থাকা কিছু বিচিত্র নয়।

কিন্তু শোভা সিংহের বিদ্রোহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এর সঙ্গে পাঠান সৈন্যের বিদ্রোহ যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু ঠিক কোন পর্যায়ে পাঠান সৈন্য শোভা সিংহের সঙ্গে যোগ দেয়—তা নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিরোধ আছে। উড়িষ্যার রহিম খান তার পাঠান সৈন্য নিয়ে এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। ১৬৯৭ সনে উচ্চস্থান থেকে পদস্খলনের ফলে শোভা সিংহের মৃত্যু হওয়ায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব পাঠানদের হাতে চলে যায় এবং গোটা বিদ্রোহে ক্ষমতা কায়েমের চাইতে লুঠতরাজের দিকটাই বড় হয়ে পড়ে। কাশিমবাজার ইত্যাদি বাণিজ্য-কেন্দ্র বারংবার লুণ্ঠিত হলো এবং বিদেশি কোম্পানি ও বণিকরা শঙ্কিত হয়ে উঠল। পাঠান নেতৃত্ব ও এই ধরনের লুঠতরাজ বিদ্রোহের জনসমর্থনকে নষ্ট

কয়ল এবং শেষ পর্যন্ত আজিমুশসানের সুবাদারি আমলে এই বিদ্রোহকে ধ্বংস করা হয়।[৭২]

এই বিদ্রোহেও কয়েকটি জিনিস পরিষ্কার। জাতে-ওঠার মানসিকতা ও লুঠতরাজের প্রবণতা এখানে একটি ধারা। অন্যদিকে, কৃষিব্যবস্থা জনিত সংকট ও মধ্যবর্তী স্তরের রাজস্ব সংগ্রহকারী জমিদারদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জমিদার ও কৃষকদের বিক্ষোভেরও অন্য এক ধারা ছিল। এখানে একটি স্থায়ী শক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং একটা পর্যায়ে বণিকরা অন্তত কিছুটা সেই কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল। কিন্তু বিদ্রোহী সৈন্যদের এরকম কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তারা লুঠতরাজেই অনেক বেশি মগ্ন। ফলে, আন্দোলন সমাজের অন্যান্য শক্তির প্রাথমিক সমর্থন হারাতে শুরু করে। উৎসের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়। কারণ ঐতিহ্যবাহী কৃষিসমাজে পুরনো উৎপাদন ব্যবস্থা অটুট থাকে। ফলে, সেখানে তাকে নিয়ন্ত্রণের জন্যে স্থায়ী নেতৃত্ব চাই—নিছক লুঠতরাজ সেখানে কিছু করতে পারে না। তাই, এই জমিদার ও কৃষকের যৌথ বিদ্রোহ প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করা সত্বেও ব্যর্থ হলো।

প্রসংগত এখানে বলে রাখা দরকার যে, সপ্তদশ শতকের শেষে ও অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত বাংলা দেশে অন্যান্য অঞ্চলের মতো ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন দেখা যায়নি। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ ছিল সীতারাম রায়ের। এরকম অবস্থার নানারকম কারণ থাকতে পারে। রাজস্ব ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জমিদারদের ভূমিকা একটি কারণ হতে পারে। বাংলা দেশে নসক রাজস্ব-ব্যবস্থা বা জমি জরিপ না করে কিছু স্থায়ী থোক টাকা রাজস্ব হিসেবে সংগ্রহ করাই প্রচলিত রীতি ছিল। এই স্থায়ী হারের নাম ছিল 'তুমার-জমা'। সাধারণ ভাবে প্রজাদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ এই তুমার-জমার চাইতে বেশি ছিল এবং সেদিক থেকে 'জাবত' ব্যবস্থার আওতায় অবস্থিত জমিদারদের চেয়ে বাংলার জমিদারদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে সচ্ছল অবস্থায় ছিল। ফলে, জমিদারদের বিক্ষোভ সেভাবে দানা বাঁধেনি। আবার, তুলনামূলকভাবে হয়তো মুঘল আমলে বাংলাদেশে করভার সেভাবে জমিদারদের ওপর বাড়েনি। একটি হিসাব অনুযায়ী আকবর থেকে মুর্শিদকুলি খাঁ পর্যন্ত বাংলা দেশে গড়পড়তা বার্ষিক রাজস্ব বৃদ্ধির হার ছিল ০·২%, যেখানে নবাবি আমলে বৃদ্ধির হার ছিল ০·৮%, ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকে ছিল ৩%।[৭৩]

লৌকিক ধর্মের ভূমিকাও কৃষকদের মানসিকতাকে হয়তো সেভাবে বিদ্রোহ-মুখীন করেনি। কিন্তু এ অবস্থা স্থায়ী হয়নি। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই জমিদার ও কৃষক-বিক্ষোভের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রামপ্রসাদের রচনায় কৃষিসমাজে সংকটের আভাস আছে। এছাড়া ধনীদের প্রতি বঞ্চনা-

জনিত চাপা ক্ষোভও দেখা যায় এই সময়কার রচনায়। যেমন—

"কে বলে তোমাকে তারা দীন দয়াময়ী।
কারে দিলে ধনজন মা, হয় হস্তী রথী জয়ী,
আর কারো ভাগ্যে মজুর খাটা শাকে অন্ন মেলে কই।
কেহ থাকে অট্টালিকায়, আমার ইচ্ছা তেমনি রই॥
... ...
ওমা তারা কি তোর বাপের ঠাকুর আমি কি কেউ নই।
কারো অঙ্গে শাল দোশালা, ভাতে চিনি দই।
আবার, কারো ভাগে শাকে বালি ধান ভরা খই॥
... ...
মাগো, আমি কি তোর পাকা ধানে দিয়েছি মই।"

আবার—

"কেহ সারাদিন পায়না খেতে, কেহ সুখে খায় সাদা চিনি।
কেহ শুয়ে তেতলাতে, পালঙ্কে মশারি টানি॥
আমরা মরি শুড়শুড়িয়ে, ভাঙ্গা ঘরে নাইকো ছানি।
অনুভবে বুঝি তারা তেলা মাথায় তেল ঢালানি॥"

মুকুন্দরামের কাব্যে বা গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'-এ বলা হয়েছে সবকিছু প্রজার পাপের ফলে হয়। রামপ্রসাদের সুর কিছুটা ভিন্ন। ভাগ্যকে প্রশ্ন করা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে কেন্দ্র করে কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করা বাংলা দেশের কৃষিসমাজে ধর্মের ভূমিকা, তথা বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনের সংকেতবাহী। তাই, স্থানভেদে বিভিন্ন অঞ্চলে ও কালভেদে একই অঞ্চলে কৃষিসমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির সম্পর্ক পালটাতে পারে। একথা বোধহয় আর একবার মনে রাখা দরকার।[৭৪]

ছ. আফগান উপজাতি আন্দোলন :

আওরঙ্গজেবের আমলের প্রধান উপজাতি আন্দোলন হচ্ছে খটক উপজাতির বিদ্রোহ (১৬৭০-৮০খ্রী.)। এটা মনে রাখতে হবে যে, খটক উপজাতি আকবরের সময় থেকে মুঘল রাষ্ট্রের মিত্রশক্তি ও বিদ্রোহের নেতা খুশহল খান একসময় মুঘল মনসবদার ছিলেন। এই জাতীয় সেবার পরিবর্তে আটক অঞ্চলে বণিকদের কাফিলা থেকে শুল্ক ধার্যের অধিকার এদের দেওয়া হয়। মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যপথের মূলকেন্দ্র এটা। তার পরিবর্তে কাফিলারা লুণ্ঠনের বিনা আশংকায় এই পথে যেতে পারত।

এই খটক উপজাতিরা আকবরের সময় এই অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে এবং রোশনিয়া আন্দোলন দমনে মুঘল রাষ্ট্রশক্তির প্রধান সহযোগী হয়। মালিক

আকরম বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে নানা ধরনের কর বসান এবং রোশনিয়া বিদ্রোহের সুযোগে খটক উপজাতির জন্যে বেশকিছু জমিজায়গা দখল করে নেন। তাঁর পুত্র শাহবাজ খান ইউসুফজাইদের এক ব্যাপক এলাকা বার্ষিক ৭২ হাজার টাকা ধার্যের বিনিময়ে ইজারা নেন। ১৬৫০ সনে খুশহল খান নিজে ইউসুফজাইদের ঠাণ্ডা করার দায়িত্ব নেন। ফলে পিতার মনসব ও ইজারাদারি দুটোই তিনি লাভ করেন।

এটাও মনে রাখা দরকার যে, আফগান ইতিহাসে মালিক আকরম ধর্মীয় ভাবে অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। খুশহলের কবিতাতেই এই ধর্মীয় গোঁড়ামির আভাস পাওয়া যায়। "আখন্দ দরওয়েজের পথানুসরণ করে আমি সৎপথ ও ঈশ্বরানুগত্যকে অঙ্কিত করি। কিন্তু রক্তমাংসের চাহিদা আমাকে পীর-ই-রুশনের মতো অধর্ম ও অসৎপথে নিয়ে যায়।"[৭৫] যাহোক, মুঘলরাষ্ট্রকে সেবা করার পরিবর্তে খটকরা শাহজাহানের আমল পর্যন্ত নানা সুবিধা পেত। রোশনিয়া আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাবার পরে আওরঙ্গজেব স্বভাবতই খটকদের সেভাবে তোষণ করলেন না। ১৬৬৪ সনে সময়মতো পেশকশ না দেওয়ায় আওরঙ্গজেব তাঁকে বন্দী করেন এবং ১৬৬৭ সনে তিনি আবার মুঘলদের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত হন। তার কিছু পরেই তিনি আবার বিদ্রোহী হন।

দ্বিতীয়ত—ইউসুফজাই প্রভৃতি অন্যান্য উপজাতিদের শায়েস্তা করা ও তাদের হাত থেকে বাণিজ্যপথ রক্ষা করার দায়িত্বও এদের ছিল। ফলে, এই নিয়ে আন্ত-উপজাতীয় বিরোধেরও একটি পটভূমি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রচিত হয়। তৃতীয়ত—অনুর্বর অঞ্চলে শুল্ক আদায় উপজাতিদের জীবিকার পক্ষে তুলনামূলক ভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[৭৬]

আওরঙ্গজেব এই জাতীয় কর সংগ্রহকে বাতিল করে দেন। স্বভাবতই পাল্টা কোনো ক্ষমতা আলাদাভাবে শুল্ক ধার্য করবে—এটা আওরঙ্গজেবের কেন্দ্রীয় শক্তির ধারণার সঙ্গে খাপ খায়নি। দ্বিতীয়ত—ইউসুফজাইদের সঙ্গে আওরঙ্গজেবের এইসময় সম্পর্কের উন্নতি হয় এবং সেদিক থেকে খটকদের বিশেষ সুবিধাদানের সার্থকতাও ফুরিয়ে যায়। ফলে, খটকরা এই ধরনের ব্যবহারকে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করল এবং আফ্রিদিদের সহযোগিতায় লাণ্ডি কোটাল, খপোক, খাইবার ইত্যাদি অঞ্চলে হাঙ্গামা শুরু করল। এ বিদ্রোহও ব্যর্থ হয় প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত—মুঘল কূটনীতি খটকদের মধ্যে ভাঙন ধরায় এবং খুশহল খানের পুত্র নিজে আওরঙ্গজেবের সহায়তা করে। দ্বিতীয়ত—খটকদের বিদ্রোহ ইউসুফজাইরা সমর্থন করে না, কারণ তাদের ওপরে এতদিন ধরে খটকরা মুঘলদের বন্ধু হয়েই আক্রমণ করেছে। এই উপজাতীয় বিরোধ আওরঙ্গজেব সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছিলেন।

এই বিদ্রোহের পেছনে আরো কারণ ছিল। একটা স্তরে নিশ্চয় সামন্ততান্ত্রিক

সুবিধা নিয়ে আহরিত সম্পদ ভোগের জন্যে তীব্র বিরোধ ছিল। শের মহম্মদ নামে একজন আফগান তারি বোলাকের কাছে খুশহল খানের এলাকাকে অনেক বেশি টাকায় ইজারা নিতে চেয়েছিল এবং মুঘলরা তাতে সম্মতি দিয়েছিল। ফলে, খুশহল খান মুঘলদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। খুশহল খানের একটি কবিতায় এই বিক্ষোভ এবং হারানো সামন্ততান্ত্রিক অধিকার ফিরে পাবার তাগিদ খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। "এবং তাদের রাজদরবারে পথের ডাকাতরা হলো বিশ্বাসভাজন এবং জঘন্য দাসরা তাদের মালিকের ওপর কর্তৃত্ব পেলো। দাস-রমণীরা গৃহকর্ত্রীদের চাইতে অনেক বেশি সম্মান পাচ্ছে। ওহে খুশহল, আলমগিরের পুরনো গৃহভৃত্যরা [এখানে রাজমিত্র অর্থে প্রযুক্ত] সবাই দুর্দশাগ্রস্ত ও ঘৃণ্যলোক।"

পুরনো দিনের আক্ষেপে খুশহল খান বলেন: "পৃথিবীর ঘটনা সম্পূর্ণ উলট-পালট হয়ে গেছে। আমি আগে যে পথগুলো দেখেছিলাম, সেগুলো এখন নেই·· আগে রাজার সম্মতি ও বিশ্বাসভাজনরা এখন সামান্য চোরে রূপান্তরিত হয়েছে।"[৭৭]

আবার, এর পাশাপাশি মুঘল রাজস্ব-কাঠামোয় উপজাতিদের স্থান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপজাতি অর্থনীতির ওপর চাপ বাড়ছিল। খুশহল খান তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন—"সুবা কাবুলে শাহজাহান বাদশাহের রাজত্বের সময় পশতুদের ওপর স্বৈরাচার করা হতো এবং তাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো। ফলে. তারা বিদ্রোহের জন্যে সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকত।"[৭৮]

বায়াজিদের বংশধর মির্জা আনসারি এই সময় একটি কবিতায় উল্লেখ করেছেন—"সেই দেশ কখনোই ধ্বংস ও বিভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচতে পারে না, যেখানে রাজকীয় সৈন্য এইরকম লোভাতুর ও জঘন্য স্বৈরাচারে লিপ্ত।"[৭৯]

মানুচ্চি স্পষ্টই লিখেছেন যে—"তিনি (শাসনকর্তা মহম্মদ আমিন খান) পাঠানদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে লাগলেন এবং অন্যান্য সুবাদারের মতো চুপ করে সন্তুষ্ট রইলেন না। যেই তিনি এসে পৌছালেন, অমনি পাঠানদের খবর পাঠালেন যে, তাদের কর দিতে হবে। তা না হলে তিনি যুদ্ধ করবেন।"[৮০] ফুতুহাৎ-ই-আলমগিরিতেই ১৬৭২ সনে আফ্রিদিদের উত্থানের পেছনে জালালাবাদের ফৌজদার আলি বেগের জবরদস্ত নীতিকেই কারণ বলা হয়েছে।[৮১] উপজাতীয় এলাকায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধ ছাড়াও ইউসুফজাই ও খটকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পার্থক্যও আছে।

এই বিদ্রোহের কয়েকটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। প্রথমত—উদ্বৃত্ত সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উপজাতি ও মুঘল রাষ্ট্রশক্তির বিরোধই এর প্রধান কারণ। খুশহল খান খটক আওরঙ্গজেবকে 'বেদজিলা' (বিশ্বাসঘাতক) বলে আখ্যা দিয়ে কবিতা লিখেছেন এবং তাঁর কাছে

জাহাঙ্গিরের রাজত্ব স্বর্ণযুগ। আওরঙ্গজেব অধিকারভঙ্গ বা চুক্তিভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত, ইসলাম ধর্মদ্রোহী, কারণ তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের দ্বারা দেয় ও খটকের স্ব-উপার্জিত অধিকার কেড়ে নিয়েছেন। ফলে, এখানে সরাসরি মুঘল রাষ্ট্র-কাঠামোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নেই। বরং একসময় রাষ্ট্র-কাঠামোয় অর্জিত অধিকারকে ফিরে পাবার জন্যে লড়াই আছে। লুপ্ত অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্যে উপজাতির লড়াই এবং সেই অধিকার মুঘল রাষ্ট্র-কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখেই পাওয়া যায়। বাহাদুর শাহ পরবর্তীকালে খুশহল খানের পুত্র আফজল খানকে অধিকার ফিরিয়ে দেন। বস্তুত এর আগে থেকেই ঐ অধিকার খটকরা ফিরে পেতে থাকে। অবশ্য মধ্যে একটা পর্যায়ে উপজাতিরা সামগ্রিকভাবে বিদ্রোহই করেছিল, কারণ এর সঙ্গে তাদের বাঁচার প্রশ্নও জড়িত ছিল। বাণিজ্যপথের পাহারা দেওয়া এদের উপজীবিকা এবং তার পরিবর্তে উপজাতির লোকেরা শুল্কের অংশ পেত।

কিন্তু এই পুরনো অধিকার ফিরে পাবার লড়াইয়ের সঙ্গে খুশহল খানের কবিতায় আরেকটি চেতনারও উন্মেষ দেখা যায়—পশতু ভাষায় যাকে বলা যায় 'নাঙে' বা সম্মানে বিশ্বাস। অর্থাৎ উপজাতির সম্মান এবং সেই সম্মান রক্ষার্থে একত্রে লড়াই করবার আহ্বান। আফ্রিদি নেতা আয়মল ও দরিয়া তাঁর সঙ্গে এক হয়ে লড়াই করেন, তাই তাঁর কবিতায় বারবার তাঁরা উল্লিখিত হন পাখতুনদের সম্মান ও গৌরবের প্রতীক হিসেবে। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সোয়াৎ ও সামার ইউসুফজাইদের তিনি একত্র করতে ব্যর্থ হন। তাই তাঁর কবিতায় বিক্ষোভ ধ্বনিত হয়: "আমি একাই আমার জাতির সম্মানের জন্যে লড়ছি। ইউসুফজাইরা আরামে আছে, চাষবাস করছে।"

এই দুটি উদ্দেশ্যের মধ্যে স্ব-বিরোধিতা আছে। মুঘলদের কাছে চুঙ্গিকর আদায়ের অধিকার ফিরে পাওয়া ও মুঘল রাষ্ট্র-কাঠামোর অংশীদার হওয়া মানে ঐ এলাকায় ইউসুফজাইদের অধিকার খর্ব করা। খুশহল খানের পূর্বপুরুষরা মুঘল রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যের বিনিময়ে রোশনিয়া আন্দোলনকারীদের দমন করে ও ইউসুফজাইদের জমিও দখল করে। ফলে, একদিকে শুল্ক পাবার জন্যে লড়াই করা এবং অন্যদিকে সমস্ত পাঠান উপজাতিদের একত্র করা তখনকার ঐতিহাসিক মুহূর্তে সম্ভব ছিল না। ফলে এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

এই সামগ্রিক আবর্তের দ্বন্দ্বে পড়ে খুশহল খানের হতাশা ও আর্তনাদই এই জাতীয় আন্দোলনের দুর্বলতাকে তুলে ধরে: "বন্যপশুরা মানুষের চেয়ে অনেক ভালো···তাই, নগর পরিত্যাগ করো ও অরণ্যে আশ্রয় নাও। আমার পরিবার পাহাড়ে গেছে ও দুঃসহতম কষ্ট সয়েছে। আমার সব প্রিয়জনেরা অভাবের কান্না শুনেছে। ···আমার মহান জনসাধারণ অত্যাচারিত ও নিপীড়িত

হয়েছে।...তবুও যতই খুঁজুক না কেন, খটকেরা আর খুশহলকে খুঁজে পায় না।"

আকবর ও জাহাঙ্গিরের আমলের আফগান উপজাতির বিদ্রোহের সঙ্গে আওরঙ্গজেবের আমলের উপজাতি বিদ্রোহের বেশকিছু তফাৎ আছে। রোশনিয়া আন্দোলনে প্রতিবাদী ধর্মীয় উন্মাদনা ও উপজাতিদের মধ্যে অনগ্রসর ও নিচুতলার লোকেদের প্রাধান্য অনেক বেশি। ঐ আন্দোলনে ইউসুফজাইরা মুঘলদের অন্যতম প্রতিপক্ষ এবং খটকরা মিত্র। আওরঙ্গজেবের আমলে খটকরা শত্রু ও ইউসুফজাইরা মিত্র। আফ্রিদিরা বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করলেও তাঁর সময়ের উপজাতি আন্দোলনে প্রতিবাদী ধর্মের কোনো ভূমিকা নেই। বিদ্রোহের নেতা অত্যন্ত গোড়া এবং তাঁর ধ্যানধারণা সমস্তই এক সামন্তের হারানো অধিকার ফিরে পাওয়া নিয়ে গড়ে উঠেছে। তিনি বিভিন্ন উপজাতিদের 'নাঙ' বা সম্মানের শ্লোগানে একত্র হবার যে আহ্বান দিয়েছেন, তা ধর্মীয় বন্ধনের জায়গায় অন্য এক ধরনের রাজনৈতিক বন্ধনের কাজ করছিল। এবং এই নাঙকে বন্ধন হিসেবে ব্যবহার করার প্রচেষ্টার জন্যেই খুশহলকে 'আফগান জাতীয়তার' প্রবক্তা হিসেবে কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মনে করেছেন। কিন্তু তার পেছনেও কাজ করছিল সামন্তবাদের ধারণা। যেমন—"মুঘলদের চেয়ে পাঠানদের কীর্তি অনেক মহৎ। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো একতা নেই এবং এটা খুব দুঃখের কথা। বহলুল ও শেরশাহের গৌরব-গাথা আজও আমার কানে ভাসে। এই আফগান সম্রাটরা কী দক্ষতার সঙ্গেই না তাঁদের রাজদণ্ড পরিচালনা করেছেন।"

একদিকে, আফগান উপজাতি গোষ্ঠীচেতনা ছাড়িয়ে সামগ্রিকভাবে উপজাতিদের 'নাঙওয়ালিতে' রূপান্তরিত করার চেষ্টা খটক বিদ্রোহে এক ধরনের তীব্রতা এনে দেয় এবং উপজাতিদের মধ্যে একাংশের সাধারণ সমর্থন পায়। অন্যদিকে, আদর্শ হচ্ছে মুঘল রাষ্ট্রের জায়গায় শেরশাহের আফগান সাম্রাজ্য এবং খুশহল খান নিজেকে ঐ সাম্রাজ্যের ভাগীদার হিসেবে দেখতেই অভ্যস্ত। ফলে, গোটা আন্দোলনে বিভিন্ন উপজাতিদের সাধারণ সদস্যদের ক্ষোভ ও আশা অনেক স্তিমিত হয়ে পড়ে, এবং আন্দোলনের জোর ও ধার সেখানে অনেক কমে যায়।

জ. মঙ্গাচা বিদ্রোহ :

অবশ্যই খটক বিদ্রোহই আওরঙ্গজেবের আমলে একমাত্র উপজাতি বিদ্রোহ নয়। ১৫৭৫-৭৬ সনে সিন্ধু প্রদেশে ভাক্করের শাসনকর্তা সৈয়দ মহম্মদ মীর আদিল পরগনা কাকরির কৃষকদের ওপর মুঘল শাসন (দস্তুর-উল-আমল) সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। কানকুথ বন্দোবস্ত করে তিনি বিঘাপ্রতি পাঁচ মণ কর

সমহারে সবার ওপর ধার্য করলেন। এবং এর জন্যে সংগ্রাহকরা প্রত্যেকটি কৃষি-ক্ষেত্রে মোতায়েন রইল (সাহেবে এহতমান বর মুজক্কয়াৎ তায়িন নামুদ)। এই লোকেরা কৃষকদের ওপর প্রচুর জোরজুলুম করতে লাগল। ফলে হতভাগ্য মঙ্গাচার লোকেরা সংগ্রাহকদের ওপর হাঙ্গামা করল।

এই বিদ্রোহের ফলে মঙ্গাচা উপজাতিদের পরাজিত করা হলো এবং নিজেদের জায়গা থেকে বিতাড়িত করা হলো (জল্লা ওয়াতন শুদে।)। একেত্রেও আমরা একটি উপজাতি এলাকায় মুঘল রাজস্ব-ব্যবস্থার একীকরণ ও তারপ অনুযায়ী রাজস্ব-ব্যবস্থা কায়েমের প্রচেষ্টা দেখি। সেই রাজস্ব-ব্যবস্থার কর্মচারিদের বিরুদ্ধে উপজাতি সমাজের বিক্ষোভও একই ভাবে ফেটে পড়ে।[৮২]

ঝ. মারাঠা আন্দোলন :

মারাঠা আন্দোলনেরও বোধহয় দুটো স্বর আছে। একটা হচ্ছে জমিদারি নেতৃত্ব, আর একটি হচ্ছে কৃষক-বিদ্রোহ। লক্ষণীয় এই যে, শিবাজীর অভ্যুত্থান স্থানীয় শক্তিশালী জমিদারদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছে এবং তিনি তাদের এলাকার বিনিময়ে নিজের ক্ষমতার এলাকা বাড়িয়েছেন। 'সভাসদ বখরে'র সাক্ষ্য অনুযায়ী, শিবাজী ও দাদাজী কোণ্ডদেব ১২টি মহল দখল করেছিলেন ও স্থানীয় মাওলি দেশমুখদের বন্দী ও হত্যা করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে শিবাজীর ক্ষমতাবৃদ্ধির সবচেয়ে দৃঢ় সোপানই হলো তাঁর অঞ্চলের ক্ষমতাশালী জমিদার পরিবার জাওলির মোরে ওয়াতনদারকে কৌশলে হত্যা ও তার জমিদারি দখল।[৮৩]

১৭১৬ সনে অভিজ্ঞ রাজকর্মচারি রামচন্দ্র পন্থ অমাত্য তাঁর লেখা আজ্ঞাপত্রে নিম্বলকার, ঘাটকে, দালভি প্রমুখ প্রাচীন মারাঠা সর্দারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই যে শিবাজীকে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়েছিল, তা স্পষ্ট কথায় বলে গেছেন। আবার, শিবাজী যেভাবে রামদাসকে সমেত মহারাষ্ট্রের অন্যান্য সাধু-সন্তকে ভূমিদান করেছেন তাতে তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের অভিলাষই সূচিত হয়।

আগ্রা থেকে পলায়নের পর শিবাজী আদৌ মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়েন নি, বরং সরাসরি মুঘলদের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। তিনি তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই ব্যাঙ্কোজির কাছ থেকে নিজের পৈতৃক জমিদারি উদ্ধার করতে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। এছাড়া ভোঁসলেদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা তৎকালীন সমাজে ঠিক ততটা স্বীকৃত হয়নি। চন্দ্ররাও মোরে বা যাদব রাও শাহজীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে যেতে অস্বীকৃত হন, কারণ তিনি বর্ণব্যবস্থায় নিচু স্থান অধিকার করেছিলেন। শিবাজী ও তাঁর শ্বশুর গাইকোয়াড়রা মারাঠা ছিলেন এবং প্রভূত ক্ষমতা সঞ্চয় করা সত্ত্বেও তাঁরা মহারাষ্ট্রের দেশীয় ব্রাহ্মণদের কাছে

শূদ্র বলেই বিবেচিত হতেন। শিবাজীর অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা বালাজি আভাজীকে এই ব্রাহ্মণরা সমাজচ্যুত করেছিলেন। আগ্রায় সভাসদদের কাছে শিবাজী একজন সাধারণ 'ভূমিয়া' বা ক্ষুদে জমিদার হিসেবেই বর্ণিত হয়েছিলেন।[৮৪]

সুতরাং শিবাজীর অভ্যুত্থানের সঙ্গে জাতে ওঠা এবং স্থানীয় নতুন জমিদার শক্তির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন জড়িত ছিল। 'সভাসদ বখর' এবং 'আজ্ঞাপত্রের সাক্ষ্য' অনুযায়ী শিবাজী পুরনো ওয়াতনদারদের দমনে সচেষ্ট ছিলেন। কারণ তারা সময়মতো খাজনা দিত না, বা অধিকাংশ রাজস্ব নিজেরা আত্মসাৎ করত। তিনি কৃষকদের ও ওয়াতনদারদের দেয় ধার্য ঠিক করে দিয়েছিলেন, ছোট ছোট দুর্গ ভেঙে দিয়েছিলেন এবং বংশানুক্রমিক জায়গির বা 'মোকাসা' বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আবার তিনি নিজের অনুগতদের যে ইনাম হিসেবে ওয়াতন দিতেন তারও প্রমাণ আছে। অর্থাৎ পুরনো ক্ষমতাশালী ভূমিজ শ্রেণীর শক্তিকে কিছুটা খর্ব করে নিজের লোকদের প্রতিষ্ঠিত করে ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি করা শিবাজীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।[৮৫] পেশকশি জমিদারদের 'খিরাজি' বা 'মাল ওয়াজিব' জমিদারে রূপান্তরিত করা এবং মিরাসিদার বা খুদকশথ রায়তদের অতিরিক্ত অধিকার খর্ব করে নিজের রাজস্ব ও ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা মহারাষ্ট্রের কৃষি-সমাজের ভারসাম্যকে বিচলিত করেছিল। এই রাজনৈতিক ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিবাজীকে সমাজ থেকে সম্মতি আদায় করতে হয়। তাই, গর্গ ভট্টকে ২ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে নিজের বংশপঞ্জীর সঙ্গে উদয়পুরের মহারাণার বংশধরদের যোগ স্থাপন করতে হয়। ভোঁসলেরা এমনিতে সাধারণ কৃষক এবং তাদের বর্ণব্যবস্থায় স্থান সুনির্ধারিত হয়নি। তাই ক্ষত্রিয় হবার প্রয়োজনীয়তা শিবাজী উপলব্ধি করেন।

এই মারাঠা-শক্তির অভ্যুদয়ের পেছনে যে নতুন সামাজিক শক্তির জমিদারি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের ইচ্ছা ছিল, তা পেশবাদের সমসাময়িক একজন মুসলিম ইতিহাসবিদ লিখেছেন: "মারাঠারা এবং বিশেষত দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণরা অন্যান্য লোকদের তাদের বেঁচে থাকার (মায়েশ) উৎস থেকে বঞ্চিত (বন্দ কারদে) করতে চায় এবং সবকিছু নিজেরা আত্মসাৎ (বতরফে খুদ মিকশান্দ) করতে চায়। তারা রাজাদের জমিদারি তো বটেই, এমন কি গ্রামের মুকদ্দম ও পাটোয়ারির মতো ক্ষুদে লোকদের জমিদারিকেও রেহাই দেয় না। তারা পুরনো (কাদিম) অভিজাতদের বংশধরকে উচ্ছেদ করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।"[৮৬]

এই সময়ে আবার মহারাষ্ট্রে ভক্তি-আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দুসমাজের বর্ণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের প্রতিও আক্রমণের প্রচেষ্টা চলছিল। তার সঙ্গে নতুন জমিদারদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক সম্পদের প্রতি লোলুপতা এক

হয়ে গিয়েছিল। মারাঠা ওয়াতনদারদের ধর্ম সম্পর্কে মধ্যযুগীয় মারাঠা নীতি-শাস্ত্র বলেছে: "ভালো বা মন্দ সবরকম উপায়েই সে (ওয়াতনদার) জমি ও সম্পদের ওপর কর্তৃত্বের ভাগীদার হবে।" অন্যদিকে মহারাষ্ট্রে ধর্ম নিয়ে প্রচার ও মারাঠাদের এক হবার ডাক মারাঠা জাতিকে তার নিচু জাতের বাধা কাটিয়ে উঠতে খানিকটা সাহায্য করেছিল।[৮৭]

অন্যদিকে এটা মনে রাখতে হবে যে, জমিদারদের মধ্যে নানা স্তর ছিল এবং মারাঠা আন্দোলনে তারা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেছে এবং তার ফলে মারাঠাদের প্রতিরোধের ক্ষমতা ও চরিত্র সময়ানুযায়ী বদলেছে। এনায়েৎ জঙ্গ-সংগ্রহের ফারসি দলিলাদি সাম্প্রতিককালে বিশ্লেষণ করে এই জাতীয় পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়।[৮৮] আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে এসেই জমিদারদের সনদ দিয়ে স্বীকৃত হলেন এবং কাউকে কাউকে ওয়াতন জায়গিরও দেবেন বললেন। ফলে, এক পর্যায়ে মধ্যবর্তী জমিদাররা লাভের আশায় মুঘলদের দিকে চলে গেল। তাদের মধ্যে পুরনো ওয়াতনদারদের সঙ্গে শিবাজীর খুব ভাব ছিল না। অন্যদিকে, প্রাথমিক স্তরের জমিদাররা এতে খুব লাভবান হয়নি এবং মুঘল রাষ্ট্রশক্তির প্রসাদে মধ্যবর্তী জমিদারদের ক্ষমতাবৃদ্ধি তাদের আশংকার কারণ হয়। ফলে, মারাঠাদের প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। আবার, বাহাদুর শাহের রাজত্বকাল উভয় স্তরের জমিদারদের সাহায্য করার আশ্বাস বহন করে। ফলে, তখন মুঘলরা ব্যাপক সমর্থন পায় এবং মারাঠারা প্রায় সর্বত্র পরাজিত হয়। কিন্তু বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে 'বে-জায়গিরি' বা জায়গিরের অভাব চরম অবস্থায় পৌঁছয় এবং সকলকে সন্তুষ্ট করা আর মুঘল রাষ্ট্র-কাঠামোয় সম্ভব হয় না। মুঘল শাসনকর্তারা জিলাদারি ইত্যাদি নতুন ধরনের কর দক্ষিণের গ্রামবাসীদের ওপর চাপাতে থাকেন। ফলে, উভয় স্তরের জমিদাররা মুঘলদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং পেশবাদের নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির পুনরুত্থান হয়।

একথা মনে রাখা দরকার যে, শিবাজীর মারাঠা রাষ্ট্র ও পেশবাদের মারাঠা রাষ্ট্রের চরিত্র ও প্রতিরোধ আন্দোলন আবার এক নয়। মারাঠা গৃহযুদ্ধের সুযোগে ওয়াতনদাররা তাদের ক্ষমতাকে এলাকা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং সে ক্ষমতা ছেড়ে দেবার পাত্র তারা নয়। বালাজী বিশ্বনাথ নিজে কোঙ্কনে ওয়াতনদার এবং তাঁর পেশবার পদের বিনিময়ে ১৭১০-১১ সনে তিনি ১৬টি মহল এবং প্রচুর অর্থ পান। পরশুরাম ত্রিম্বক, কাহ্নোজী আংগ্রে সবাই শাহুর কাছে মৌখিক আনুগত্যের বিনিময়ে নিজেদের সরনজামের এলাকা বাড়িয়ে নেন এবং সেগুলো বংশানুক্রামিক হয়ে পড়ে। একদল বংশানুক্রমিক জায়গিরদারদের যৌথ রাষ্ট্রে পেশবাদের মারাঠা রাজ্য রূপান্তরিত হয়। এর সঙ্গে মুঘল শক্তিরও আপোষ হয়। তাই, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মিত্র হিসেবে বালাজী বিশ্বনাথ

ফাররুখশিয়ারের অপসারণের সময় দিল্লিতে উপস্থিত থাকেন। বাজীরাও সুযোগ পেয়েও মুঘল সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করেন নি এবং সবশেষে বিদ্রোহী গুলাম কাদিরের হাত থেকে সম্রাট শাহ আলমকে উদ্ধার করে মাহাদজী সিন্ধিয়া তাঁরই উজির-উল-মুলক পদে বৃত হন। এইভাবে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় সবাই অংশীদার হন, যদিও কাঠামোর তখন কিছু-কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

পেশবাদের আমলে মহারাষ্ট্রে জাতের লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও অদলবদল ঘটেছে। রাষ্ট্রক্ষমতায় চিৎপাবন ব্রাহ্মণরা এসেছে। এরা অল্পখ্যাত ভাট। ফলে, এদের কর্তৃত্বকে বজায় রাখার জন্যে অজস্র আখ্যানকাব্য লেখা হলো এবং এদের পরশুরামের অংশ বলে বর্ণনা হলো। পেশবা মাধব রাওয়ের সময় লিখিত বল্লভের 'পরশুরাম চরিতে' ভার্গবের ক্ষত্রিয় বিরোধী কাহিনীগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে, ক্ষত্রিয় রাজবংশ কলিযুগের অনাচার ধ্বংস করতে ব্যর্থ হলে পরশুরাম ভার্গবের বংশধর রূপেই পেশবারা আসছে। শিবাজীর বংশাবলী সম্পর্কে আখ্যানকাব্যটি নীরব, যেখানে বখরগুলো শিবাজীকে সূর্যবংশীয় বলে চিহ্নিত করত। পেশবাদের ক্রমাগত মারাঠা, ক্ষত্রিয়, ভোঁসলে, গাইকোয়াড় প্রমুখ রাজবংশের সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলতে হতো। ফলে, সামাজিক আচার-বিচারে তাঁদের অনেক কঠোরভাবে ব্রাহ্মণ আধিপত্য বজায় রাখতে হতো। পুনা শহরে বেদচর্চা ও পাঠে অধিকার সম্পদশালী বণিক সম্প্রদায়ের প্রভুদের ছিল না। ১৭৪৯ সনে হিন্দু পেশবাদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে মারাঠি প্রভুরা অযোধ্যার নবাব সফদরজঙ্গ ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর নওল রায়ের আশ্রয়ভিক্ষা করেছিল। বিঠোভা মন্দিরের সন্নিকটে অবস্থিত নিচু জাতের উপাস্য দেবতার কাছে অন্ত্যজদের যাওয়া নিয়ে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়। কোঙ্কনের মহাররা ব্রাহ্মণ পূজারীর মাধ্যমে বিবাহের অনুষ্ঠান করার দাবি জানায়। তখন জুনারে আওরঙ্গজেবের আমলের একটি নজির তুলে ঐ দাবিকে নাকচ করা হয়। মাধব রাওয়ের আমলে উৎসবের দিনে নিরস্ত্র জাতিল গোঁসাইদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা হয়, কারণ তারা গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আবার, ব্রাহ্মণ্য পেশবাদের কর্তৃত্বকে বাতিল করার জন্যে মারাঠা জানোজী ভোঁসলে ১৭৬৩ সনে নিজামের সৈন্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুনার মন্দির ধ্বংস করেন। অর্থাৎ, শিবাজী পরবর্তী মারাঠা-রাষ্ট্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মর্যাদাভিলাষী মারাঠা ওয়াতনদারদের পারস্পরিক সংঘর্ষ ও সমঝোতার ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। ১৭৪৩ সনে পেশবার আদেশে প্রভুদের ধর্মাচরণের ওপর নানারকম বিধিনিষেধ জারি করা হলো। পৈঠানের ব্রাহ্মণসভার অনুমতি থাকা সত্ত্বেও নরহরি রামালেকরকে পেশবা ও পুনার ব্রাহ্মণরা হিন্দুসমাজে ফিরিয়ে আনতে দেননি। সুবিচারের জন্যে খ্যাতনামা ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী ধর্মচ্যুতির জন্যে যে নিয়ম চালু করেছিলেন তা ভয়াবহ।

আবার, এই পর্যায়ে মুঘল রাষ্ট্রের প্রতি মনোভাবও পরিবর্তিত হয়। সরস্বতী গঙ্গাধরের 'গুরুচরিত' বা রামদাসের 'দশোবধ' গ্রন্থে মুসলিমদের সরাসরিভাবে হিন্দুদের আওতায় মধ্যে দেখানো হয়নি। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে রচিত বখরে শিবের আশীর্বাদ পুষ্ট রূপেই মুঘল সম্রাটদের দেখানো হয়েছে। 'পরশুরাম চরিত' গ্রন্থেও আওরঙ্গজেবের আগে পর্যন্ত মুসলিম সম্রাটদের ন্যায়-পরায়ণতার কথা বলা হয়েছে এবং পেশবাদের শাসনকালকে সেই ন্যায় রাজত্বের চরম উৎকর্ষ বলে দেখানো হয়েছে। মলহর রাও চিৎনিসের শাহু বখরে শাহুকে পাদশাহের প্রকৃত নাতি বলে ধরা হয়েছে এবং তাঁর সনদকে স্বীকার করে রাজত্ব করার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। পরবর্তীকালে মহারাষ্ট্র রাজকীয় পরিবার নিজেদের মধ্যে চিঠিপত্র মুঘল রাজকীয় ভাষা ফারসিতে লিখেছে। ১৭৩৭ সনে বাজিরাও তাঁর ভাই চিমনজী আপ্পাকে সরাসরি লিখলেন —"দিল্লি মহাস্থল, পাদশাহ বরখাৎ জালিয়াৎ ফয়দা নেহি।" (দিল্লি মহানস্থান, পাদশাহকে সরিয়ে কোনো লাভ নেই।) অষ্টাদশ শতকে মারাঠা ও মুঘল সম্পর্কের বাস্তব পরিবর্তনের ভিত্তিতে মারাঠার শাসকশ্রেণীর আদর্শে এরকম পরিবর্তন কিছু বিচিত্র নয়।[৮৯]

তাই, একদিক থেকে মারাঠা প্রতিরোধ আন্দোলনে একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া আমরা দেখতে পাই। একটি নতুন জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব আগের উদ্বৃত্ত সম্পদ বণ্টনের ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করেছিল। মুঘলরা প্রথমে তা স্বীকার করেনি। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে দাক্ষিণাত্যের ৬টি সুবায় মারাঠাদের চৌথ ও সরদেশমুখী দিয়ে দেবার সঙ্গে সেই শক্তি ঐ মুঘল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর শোষণযন্ত্রের সামিল হলো। তার রাষ্ট্রেও মূল পার্থক্য কিছু থাকল না। রাজস্থানের রাজারা এখন মুঘলদের পরিবর্তে মারাঠাদের পেশকশ দিতে লাগল এবং শাহু থেকে মাহাদজী সিন্ধিয়া পর্যন্ত চেষ্টা করতে লাগলেন মুঘল রাজশক্তির আশীর্বাদ পেতে—যাতে করে বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্বৃত্ত সম্পদ আহরণে তাদের অধিকার অন্যান্য প্রদেশের জমিদার ও কৃষকদের কাছে আরো গ্রহণীয় হয়।

মারাঠা আন্দোলনের আরেকটি স্তরের কথা এবার আলোচনা করা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে কৃষক-বিদ্রোহের ভূমিকার কথা। এটা মনে রাখতে হবে যে, শাহজাহানের সময় থেকেই দাক্ষিণাত্যের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর চাপ ছিল। আওরঙ্গজেবের চিঠিপত্র থেকে জানা যায়, জমা অনুযায়ী হাসিল হতো না। জমার পরিমাণ হাসিলের চেয়ে প্রায় চারগুণ বেড়ে গিয়েছে। মুর্শিদকুলি খানের মতো ক্ষমতা সম্পন্ন জায়গিরদারও জায়গির থেকে পরিমাণ মতো অর্থ পেতেন না এবং অধিকাংশ মনসবদারই তাদের আয় থেকে নির্ধারিত সওয়ার পুষতে পারত না।[৯০]

তার ফলে বিদ্রোহীদের পেছনে জনসমর্থন ছিল। আওরঙ্গজেব গোড়া

থেকেই শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে—"সাম্রাজ্যের পরগনার রায়ত, দেশমুখ ও প্যাটেলরা" শিবাজীর পক্ষে যোগ দিয়েছে ও তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে এবং এরকম বিদ্রোহীদের কোনো দয়া প্রদর্শন না করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত।[৯১] পরবর্তীকালে ভীমসেন বুরহানপুরি সংকট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মারাঠাদের সঙ্গে কৃষকদের যোগসাজস ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—"আরজি পৌঁছলো যে সাম্রাজ্যের কৃষকের সঙ্গে মারাঠাদের মৈত্রী সম্পর্ক আছে। আদেশ হলো প্রত্যেক মৌজাতে ঘোড়া বা অস্ত্র যা পাওয়া যাবে বাজেয়াপ্ত করা হোক। তখন অনেক মৌজাতে এরকম হলো যে কৃষকেরা সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে মারাঠাদের সঙ্গে একত্র হলো।"[৯২]

পরবর্তীকালের ইতিহাসবিদরাও মারাঠা সৈন্যদের মধ্যে নিচুজাতের লোকেদের প্রাধান্য দেখতে পেয়েছেন। মারাঠা ও মুঘলদের সৈন্যদের তুলনামূলক আলোচনা করে আজাদ বিলগ্রামি লিখেছেন: "মারাঠাদের সৈন্যবাহিনী অধিকাংশই নীচ কুলোদ্ভব (আরাজিল)—যথা কৃষক, রাখাল, ছুতোর, চর্মকার—যেখানে মুসলিমদের সৈন্যবাহিনী (ফৌজে ইসলামান) উচ্চবংশ সম্ভূত ও ভদ্রলোক (শরাফান)।"[৯৩]

এক্ষেত্রে দুটো কথা মনে রাখা দরকার। মারাঠা সর্দাররা যে শোষিত কৃষকদের খুব বন্ধু ছিল, একথা মনে করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। রাজস্ব আদায়ে মারাঠা রাষ্ট্রক্ষমতা নির্দয়তায় মুঘলদের চেয়ে কিছু কম ছিল না। খাফি খান স্পষ্ট লিখেছেন: "সবচেয়ে অত্যাচারী ফৌজদারের চেয়ে তারা (মারাঠা কর-গ্রাহকরা) দুই বা তিনগুণ বেশি আদায় করত।"[৯৪] শিবাজীও তাঁর অভিযানে কৃষকদের রেহাই দেননি। দ্বিতীয়ত—মারাঠা রাজ্যেরও দুটো অঞ্চল ছিল। একটা স্ব-রাজ্য—মারাঠারা সেখানে নিজেদের শাসনব্যবস্থা চালু করেছিল ও নিয়মিত রাজস্ব নিত। অন্যটা মুলকগিরি—একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল—যেখানে মারাঠা সর্দাররা এলাকা ভাগাভাগি করেছিল এবং বার্ষিক লুঠতরাজ করত। এখন রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রচণ্ড চাপে নিপীড়িত কৃষকদের কাছে এই লুঠতরাজের সুযোগ জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে দেখা দেয় এবং মারাঠাদের ঘিরে এইভাবে পিণ্ডারি দস্যুদলের উদ্ভব হয়। লুঠতরাজ চলতে থাকে, কৃষক গৃহহারা হয় ও কৃষিব্যবস্থার সংকটের সঙ্গে সঙ্গে উপজীবিকার তাড়নায় দস্যুদলেরও বৃদ্ধি হয়—যারা আবার মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এরই মধ্যে আওরঙ্গজেবের আর্তনাদ শোনা যায়: "কাফেররা হাঙ্গামা করছে না এমন কোনো সুবা বা পরগনা নেই, এবং তাদের শায়েস্তা করাও যাচ্ছে না। অধিকাংশ অঞ্চল জনশূন্য এবং যদি কোনো অঞ্চলে লোক থাকে, সেখানকার কৃষকরা মারাঠা দস্যুদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় এসেছে।"[৯৫]

ট. শিখ বিদ্রোহ :

শিখ বিদ্রোহের ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা বলা যেতে পারে যে, শিখ বিদ্রোহ এমন একটি আন্দোলন যাতে কৃষক-বিদ্রোহের নানা স্তর বর্তমান। বিভিন্ন পর্যায়ে শিখ-বিদ্রোহ বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। এলাকা অনুযায়ী এর চরিত্রও বদলেছে।[৯০]

প্রথমে মনে রাখা দরকার যে, পাঞ্জাবকে ভৌগোলিকভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। বিপাশা ও রাভির মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হয় 'মাঝহা'। বিপাশা ও শতদ্রুর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হয় 'দোয়াব'। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হয় 'মালওয়া'।

শিখধর্মের মধ্যেও নানা গোষ্ঠী আছে। প্রত্যেক গুরুর উত্তরাধিকার নিয়ে তীব্র বিরোধ হতো এবং তা নিয়ে নানা দলভাগ হয়েছে। এই দলভাগের সঙ্গে ধর্মের ব্যাখ্যা নিয়েও বিরোধ হয়েছে। কতকগুলো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। নানকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর বড় ছেলে শ্রীচাঁদ ব্যক্তিগত বৈরাগ্য অবলম্বনকেই মুক্তির পথ বলে মনে করলেন এবং সেই মতানুসারে উদাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৫৮১ সনে গুরু রামদাসের মৃত্যুর পর অর্জুন আসেন এবং বড়ভাই পৃথ্বীচাঁদের দাবি অস্বীকৃত হয়। অর্জুন শিখপন্থকে সংগঠনে রূপান্তরিত করতে চান, যেখানে পৃথ্বীচাঁদের নেতৃত্বে এরা অনেক বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মের পথ অনুসরণ করতে চায়। মীনাদের এইভাবে জন্ম হলো। আবার, হর রায়ের মৃত্যুর পর হরকিষণ ও রাম রায়ের মধ্যে বিরোধ হয় এবং রামরাইয়াদির উদ্ভব হয়। মীনারা শিখদের মধ্যে অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং রামরাইয়াদের বিরুদ্ধে বান্দা অভিযান করেন। আবার, নিরঞ্জনী শিখরা খালসা শিখদের চরম শত্রু ছিল। গুরুগোবিন্দ শিখকে একটি সামরিক সংগঠনে রূপান্তরিত করলেন। কিন্তু সকল শিখ এই চেষ্টাকে সমর্থন করেনি। আজও সহজধারী শিখরা 'খালসা' ধর্মে দীক্ষিত নয়,—সেখানে অমৃতধারীরা দীক্ষিত। লাহোরের বিখ্যাত ক্ষত্রি চিকিৎসক বস্তিরাম খালসায় যোগ দেননি, এবং তাঁর নাতি খালসায় যোগ দিলে পারিবারিক বিরোধ হয়। সানাদ পরিবারের ভারমলও পহুল নেন নি, যদিও তিনি গুরুগোবিন্দের বিশেষ অনুগামী ছিলেন। সুতরাং শিখধর্মের মধ্যে এই ভাগগুলো মনে রাখা দরকার।

শিখধর্মের শান্তরূপ থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপান্তরের কথা সবার জানা। এর পেছনে কিন্তু একটি ঐতিহাসিক সামাজিক প্রক্রিয়া কাজ করেছিল। তা হলো শিখধর্মের প্রথম সমর্থক ছিল ক্ষত্রিরা। এরা মূলত ব্যবসায়ী। শেষ পর্যায়ে প্রধান হলো জাঠরা। এরা সবাই কৃষক। কৃষিব্যবস্থার সংকটের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর চাপ বাড়ল এবং তারা অস্ত্র হাতে নিল। শিখধর্মেরও রূপান্তর ঘটল। ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে এই মূল বিষয়টি এবার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। গুরু হরগোবিন্দের সমসাময়িক ভাই গুরুদাস রচিত 'জনমশাখী' অনুযায়ী

আমরা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শিখদের নাম ও বর্ণ পাই। এদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য ও নেতৃত্বে আছে ক্ষাত্ররা। সব গুরুই ক্ষাত্র এবং সোধি বা বেদি গোত্রের অন্তর্গত, এবং তারা নিজের বর্ণের বাইরে কোনো সময় কোনোরকম বিবাহের আয়োজন করেন নি। ব্যবসায়ী ক্ষত্রিদের প্রভাবের আর একটি প্রমাণ হাজির করা যায়। বংৎ মলের 'খালসানামা'র সাক্ষ্য অনুযায়ী, মাখন শাহ নামে অত্যন্ত ধনশালী এক ক্ষত্রি ব্যবসায়ীই বিভিন্ন গুরু-পদপ্রার্থীদের মধ্যে তেগবাহাদুরকে সঠিক গুরু বলে নির্বাচিত করেন।

কিন্তু জাঠদের ক্ষমতা শিখপন্থের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। গুপ্তযুগে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এদের ভ্রাম্যমাণ উপজাতি বলে বর্ণনা করেছেন। এরা পশুপালক, অনেকটা সমবণ্টনের নীতিতে বিশ্বাসী এবং অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয়। পরে মুঘল আমলে জলচাকির ব্যাপক প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গোটা অঞ্চলে কৃষিকাজের ব্যাপক প্রসার হয় এবং এই উপজাতিরা কৃষিজীবী সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হয়। হিন্দুধর্মের কাছে এরা সহজে গৃহীত না হলেও শিখ-ধর্মের এরা পৃষ্ঠপোষক হয়।[৯৭] ইরফান হাবিব তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, একাদশ শতক থেকেই সিন্ধু প্রদেশের জাঠরা দক্ষিণ পাঞ্জাবে অনুপ্রবেশ করে বসতি স্থাপন করে। এই সময়েই তারা পশুপালক থেকে কৃষকে রূপান্তরিত হয় এবং তাদেরই প্রচেষ্টায় মোঙ্গল আক্রমণে বিধ্বস্ত পাঞ্জাব কৃষিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই জাঠরাই পরবর্তীকালে শিখধর্মের সামরিক রূপের জন্যে দায়ী এবং মাংস খাওয়া বা 'খালসা'র উৎপত্তি এই জাঠদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রয়োজনকে সিদ্ধ করে।

আমাদের সময়সীমায় শিখদের মধ্যে জাঠদের উত্তরোত্তর প্রাধান্য বৃদ্ধির কথা সুস্পষ্ট। আনুমানিক ১৬৫৫ সনে লিখিত দবস্তান-ই-মজাহিব এ বলা হয়েছে : "তারা ক্ষত্রিদের জাঠের দাসে (অর্থাৎ জাঠ) রূপান্তরিত করেছে। জাঠরা বৈশ্য শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে নিচু। গুরুর সবচেয়ে বিখ্যাত মসন্দরা সবাই জাঠ।[৯৮] খাফি খান লিখেছেন : "এই ধর্মের অধিকাংশ অনুগামী হলো পাঞ্জাবের জাঠ ও ক্ষত্রি কৌম। কাফেরদের অন্যান্য নিম্নবর্ণও এদের মধ্যে আছে।"[৯৯] গুরু তেগ-বাহাদুরের আমলে (গুরুগোবিন্দের সময়) শিখধর্মে ব্যাপক হারে জাঠ ও নিচু জাতের লোকদের প্রবেশের কথা ১৭৮৪ সনের "হকিকতে বিনা ওয়া উরুজে ফিরকে শিখানে" বলা হয়েছে। "হিন্দুদের মধ্যে যে কেউ (হরশখস্ আজ কৌমে হিন্দু) গুরু তেগবাহাদুরের কাছে আসত তাকেই নতুন ধর্মে দীক্ষিত করা হতো। সে হিন্দুদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ক্ষত্রিও হতে পারত, বা এই অঞ্চলে অগুনতি জাঠদের মধ্যে একজাত হতে পারত। ছুতোর (নাজার), কামার (আহনগার), কৃষক (মুজারিয়ন), ধান্য বিক্রেতা (বককাল) নানাধরনের কারিগর ও হস্তশিল্পীদের এইভাবে দলভুক্ত করা হলো।"[১০০]

গুরু অর্জুনের সময় থেকেই মাঝহা এলাকায় জাঠদের মধ্যে প্রচার শুরু হয়। তরতারান, শ্রীহরগোবিন্দপুর, কর্তারপুর ইত্যাদি গ্রামগুলি শিখধর্মের কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং এগুলো সমস্ত জাঠ কৃষক-এলাকায় স্থাপিত। জাঠ ও ক্ষত্রিদের মধ্যে মতবিরোধ বা পার্থক্যের আভাসও পাওয়া যায়। দবিস্তানে বর্ণিত প্রতাপ মল নামে এক ক্ষত্রিভক্ত জাঠ ভক্তদের পা ধোয়াতে অস্বীকার করে, কারণ ক্ষত্রিরা চিরকাল জাঠদের সেবা নিয়েছে। আবার, সে অধুনা জাঠ ভক্তদের ভাঁড় বলে বর্ণনা করেছে।[১০১] গুরুশোভার সাক্ষ্য অনুযায়ী, ক্ষত্রি ও ব্রাহ্মণ শিষ্যরা গুরুগোবিন্দের 'খালসা' স্থাপনকে ততটা সমর্থন করেনি। মূল সমর্থন জাঠ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এসেছিল। খালসা আসলে একটি অনুষ্ঠান, যেখানে গুরু ও শিষ্যরা পরস্পর পরস্পরকে দীক্ষিত করল।

গণেশ দাস পরবর্তীকালে চহর-বাগ-ই পাঞ্জাবে একটি প্রাসঙ্গিক বিবরণ দিয়েছেন। "তখন গুরুগোবিন্দ সিংহ শিখদের 'পহুল' দিয়েছেন এবং তাদেরকে খালসায় রূপান্তরিত করেছেন। প্রথমে তিনি ক্ষত্রিদের অস্ত্র ধরতে ডাকলেন। ...প্রত্যুত্তরে তারা বলল যে, তারা খুবই দুর্বল, এবং শাসকের ক্রোধকে জাগরিত করতে ভরসা পায় না। তাদের একলা ছেড়ে দিতে তারা অনুরোধ জানালো। গুরু রাগে বললেন যে তারা ক্ষত্রি নয়, বরং খাৎরি (ভীতু)। ভয়ই তাদের ভাগ্য। পরে গুরু জাঠ কৃষকদের কাছে আবেদন করলেন এবং তারা গুরুর আদেশ মেনে নিল।[১০২]

ফলে, গুরুর ক্ষমতা গোটা 'শিখ খালসা' সম্প্রদায়ে অর্পিত হলো এবং কতক-গুলি সামাজিক আচরণ ও চিহ্ন ধারণের মাধ্যমে শিখরা সশস্ত্র প্রতিরোধকে ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করল। এই আচরণবিধির অনেকগুলোই আবার জাঠ সমাজের পূর্ব প্রচলিত রীতির অনুসারী। প্রাচীন জনমশাখীর সাক্ষ্য অনুযায়ী, নানকের সময় শিখরা চুল কাটত। কিন্তু বেণী রাখা হিন্দু, মুসলিম ও শিখ ধর্মানুসারী নির্বিশেষে জাঠরা অনুসরণ করত এবং পরবর্তীকালে বাহাদুর শাহ শিখদের সঙ্গে অন্যান্য হিন্দুদের পৃথকীকরণ করার জন্যে বেণী ও চুল কাটতে নির্দেশ দেন। অস্ত্রবহন করার রীতিও জাঠ সম্প্রদায়ের সামাজিক বিধির আওতায় পড়ে।[১০৩] স্বভাবতই জাঠ সম্প্রদায় গোড়া থেকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা-কামী সম্প্রদায় ছিল। এদের সঙ্গে মূলত শহরকেন্দ্রিক ব্যবসায়ী ক্ষত্রিদের মনোভাবে পার্থক্য ছিল এবং তারা খালসার এই রূপান্তরকে মানেনি।[১০৪] আবার, গুরুপদের অবসান ও সমস্ত 'খালসা'কে ক্ষমতা অর্পণ করার অর্থ জাঠ সম্প্রদায়ের সমতার দাবিকে স্বীকার করা ও ক্ষত্রিদের প্রাধান্য হ্রাস পাওয়া। কারণ তারা এতদিন ধরে গুরুপদকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। এদিক থেকে গুরু নানক এবং গুরুগোবিন্দের শিখধর্মের পার্থক্য আসলে ব্যবসায়ী ক্ষত্রিদের হাত থেকে আস্তে আস্তে কৃষিজীবী জাঠদের হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়া।

শিখধর্মের সংগঠন ও আর্থিক ভিত্তির কথাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এই গুরুদ্বারগুলো ছিল সংগঠন। একদিকে তা 'গ্রন্থসাহেব' ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিখদের মধ্যে গোষ্ঠীচেতনাকে জাগিয়ে রাখত। অন্যদিকে ক্ষত্রিদের সঙ্গে স্থানীয় বাজারের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া ও মাল কেনাবেচার কাজে সহায়তা, এই গুরুদ্বারগুলোই করত। তেগবাহাদুর পাটনায় কাপড়ের ব্যবসা করে সম্পদ অর্জন করেছিলেন এবং অন্যান্য গুরুরাও গুরুদ্বারের মাধ্যমে ব্যবসায়ে উৎসাহ দিতেন। এর জন্যে কিছু দক্ষিণা দিতে হতো।

প্রত্যেকটি গুরুদ্বারে 'মসন্দ' বা শিখ ধর্মগুরুদের প্রতিনিধি থাকত এবং তারা ভক্তদের আয়ের এক-দশমাংশ বা দশওয়ান্দ নিত। খাফি খান লিখেছেন "পুরনো সময় থেকেই তিনি শহরে ও বসতিপূর্ণ জায়গায় মন্দির তৈরি করেছিলেন এবং প্রত্যেক জায়গায় তাঁর অনুগামীদের প্রতিনিধি করে মন্দিরের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। যখনই কোনো দল গুরুর জন্যে মন্দিরে উপহার বা নজর নিয়ে আসত, প্রতিনিধি সেটা সংগ্রহ করত এবং নিজের খাই-খরচার জন্যে প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে বাকিটা বিশ্বস্ততার সঙ্গে গুরুর কাছে পাঠাত।[১০৫] দবিস্তানে লেখা হয়েছে : শিখদের মধ্যে কেউ ব্যবসা করত, কেউবা চাষবাস ও চাকরি করত, এবং প্রত্যেকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী মসন্দকে প্রত্যেক বছর নজর পাঠাত।[১০৬]

অর্থাৎ শিখধর্মের প্রসারের সঙ্গে যে পাল্টা কর্তৃত্বের সংগঠন গড়ে উঠেছিল তা সুস্পষ্ট। হয়তো প্রথমদিকে এই সংগঠন ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হতো, কিন্তু অবস্থার চাপে তাকে রাজনৈতিক সংগঠনে রূপান্তরিত করা, বা ঐ জাতীয় সংগঠনের পক্ষে শাসক শ্রেণীর মনে বিরুদ্ধ আশংকার উদ্রেক করা—আদৌ অসম্ভব নয়। এছাড়া শিখ গুরুদের উপাধি গ্রহণ যে রাজনৈতিক কাঠামো থেকেই ধার করা—এটা কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাসবিদ স্পষ্টভাবে বলে গেছেন। দবিস্তানে বলা হয়েছে। "একথা জানা উচিত যে, আফগান সুলতানদের আমলে (দর আহদে সালাতিনে আফগানান) লেখাতে ওমরাহদের মসনদ-ই-আলি বা উচ্চ স্থলাভিষিক্ত বলে সম্বোধন করা হতো। বহুল ব্যবহারে ভারতীয়রা এই শব্দকে মসন্দে পরিণত করেছে। এবং যেহেতু শিখরা তাদের গুরুদের সৎ বাদশা বা প্রকৃত রাজা বলে মনে করে, তার প্রতিনিধিদেরও তারা মসন্দ বলে। পঞ্চম মহালের (গুরু) আগে পর্যন্ত শিখদের কাছ থেকে কোনো ভেট নেওয়া হতো না। তাঁর সময়ে অর্জুনমল প্রত্যেক শহরের শিখদের কাছে একজন করে লোক পাঠালেন যাতে করে তাদের কাছ থেকে তিনি ভেট ও নজর সংগ্রহ করতে পারেন। প্রধান মসন্দরা আবার তাদের অধীনস্থ লোকদের নিযুক্ত করত যাতে করে প্রত্যেক জায়গায় বা মহালে লোকেরা প্রথমে মসন্দদের মেলিতে (গোষ্ঠী?) পরিণত হয়। মসন্দদের প্রতিনিধির মাধ্যমে তারা গুরুর শিখে

রূপান্তরিত হবে।[১০৭] এই বিবরণীতে গোটা শিখ সংগঠনের ছবি পাওয়া যায়। গুরু, মসন্দ ও মসন্দদের প্রতিনিধির মাধ্যমে ধাপে ধাপে আনুগত্য ও সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। নজর বা ভেট দেওয়ার বন্দোবস্তও চালু করা হয়েছে এবং অভাবি মসন্দরাও তাদের প্রয়োজনমতো নজরের অংশ ভোগ করত। এই জাতীয় সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো একদিক থেকে নিশ্চয় শিখদের জোরদার সংগঠনের আওতায় এনেছিল এবং পরবর্তীকালের বিদ্রোহে নিশ্চয় সহায়ক শক্তি হিসেবেই কাজ করে। অন্যদিকে গুরুর পাল্টা কর্তৃত্ব, জোরদার সংগঠন ও পাঞ্জাবের ক্ষত্রি ও জাঠদের মধ্যে তাদের প্রভাব স্বভাবতই মুঘল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র কাঠামোর পরিপন্থী হিসাবে কাজ করবার সম্ভাব্য শর্ত হিসাবে কাজ করেছিল। এর অর্থ এই নয় যে সব গুরুরাই সচেতনভাবে মুঘলরাষ্ট্র বিরোধী ছিলেন, বরং অনেকেই বিভিন্ন পর্যায়ে মুঘল রাজশক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু শিখ সংগঠনের চরিত্রে মুঘল শাসনতান্ত্রিক সংগঠনের সঙ্গে বিরোধের বীজ লুক্কায়িত ছিল।

এই মসন্দদের ক্ষমতা এবং গুরুদ্বারগুলোর সম্পদের কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধ কিন্তু প্রত্যেকটি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদের একটি অঙ্গ হিসেবে শিখ ধর্মসাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছে। হরগোবিন্দ, হর রায়, তেগবাহাদুর এবং গুরুগোবিন্দ—প্রত্যেকের সময় এই মসন্দের ক্ষমতা এবং তাদের অর্থলোলুপতার কথা বলা হয়েছে। এই পদগুলোও ক্রমশ বংশানুক্রমিক হয়। অর্থাৎ শিখধর্মের একটি পাল্টা সংগঠন এবং তার আর্থিক ভিত্তির জন্যে পাল্টা শক্তিশালী কর ব্যবস্থা ছিল। শিখদের সঙ্গে আওরঙ্গজেবের বিরোধের বীজ এখানেই উপ্ত ছিল।

একথা মনে রাখা দরকার যে, আওরঙ্গজেবের কাছে আবেদন করা সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব গুরু হর রায়ের মৃত্যুর পর শিখদের গুরু-পদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধে হস্তক্ষেপ করতে নারাজ হন। তিনি বরং বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতা রাম রায়ের ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্যে তাকে দেরাদুনে ৭টি গ্রাম প্রদান করেন। ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খান ঢাকায় গুরুদ্বার তৈরি করার জন্যে তেগবাহাদুরকে প্রচুর জমি দেন ও তেগবাহাদুর মুঘল সৈন্যের সঙ্গে আসাম অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। সুতরাং আওরঙ্গজেবের সঙ্গে শিখধর্মের বিরোধ নিছক ধর্মীয় ছিল না।

এখন খাফি খান আভাস দিলেন যে, পাল্টা সংগঠন ও পাল্টা কর সংগ্রহ আওরঙ্গজেবের আক্রমণের কারণ হয়েছিল এবং নজর ও কর সংগ্রাহককে মসন্দদের শহর থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন। সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিন-এ বলা হয়েছে যে, হাফিজ আদিম নামে একজন পীরের সঙ্গে সহযোগিতা করে তেগ বাহাদুর পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে লুঠতরাজ করছিলেন। ১৮১২ সনে সোহন-লাল উমদাৎ-উৎ-তওয়ারিখ লেখেন এবং তাঁর রচনার পেছনে ব্রিটিশ রাজ-কর্মচারির আনুকূল্য ছিল না। তাঁর ভাষায়—"সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাজার সৈন্য

ও ঘোড়সওয়ার তাঁর দলে যোগ দিল। আমিল, জমিদার, ইজারাদার, দেওয়ান ও রাজকর্মচারিদের প্রতি যারা বিদ্রোহী তারা তাঁর (তেগবাহাদুর) কাছে আশ্রয় নিল। দুষ্ট চরিত্রের কিছু লোকেরা বাদশাহ আলমগিরের কাছে খবর পাঠাল যে মালওয়া অঞ্চলে ঘোড়সওয়ার ও লোক নিয়ে গুরু তেগবাহাদুর বাস করছেন। তারা সাবধান করে দিল, যদি গুরুর দিকে নজর না দেওয়া হয় তবে বিদ্রোহকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে।"[১০৮] তাই, একদিকে কৃষক হাঙ্গামা ও অন্য দিকে সাম্রাজ্যের অনুমতি ব্যতীত কর সংগ্রহের চেষ্টা আওরঙ্গজেবের কেন্দ্রীয় রাজশক্তির ধারণার বিরুদ্ধে ছিল। এবং সেদিক থেকে তেগবাহাদুরের ওপর তাঁর আক্রমণ মুঘলশক্তিকে তুচ্ছ করার শাস্তি হিসেবেই প্রযুক্ত হয়েছিল বলে মনে হয়।[১০৯]

শিখ বিদ্রোহের আরেকটি পর্যায় শুরু হয় গুরুগোবিন্দের আমলে। এর মধ্যেও কতকগুলো ভাগ আছে। আনুমানিক ১৬৯২ সন পর্যন্ত গুরুগোবিন্দ হিমাচল প্রদেশের পার্বত্য রাজাদের সহযোগী হয়ে মুঘলদের সঙ্গে লড়েছেন। আনুমানিক ১৬৯৬ থেকে ১৭০৪ সন পর্যন্ত পার্বত্য রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ, এবং ১৭০৪ থেকে ১৭০৮ সন পর্যন্ত মুঘলশক্তির মিত্র হিসেবে আমরা গুরুগোবিন্দকে দেখতে পাই।

এখন মনে রাখতে হবে যে, গুরুগোবিন্দের কাজের মূলকেন্দ্র ছিল হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাবের সমতলভূমি নয়। নগরকোট, কাংড়া, কাহলুর ইত্যাদি অঞ্চল রাজপুত পেশকশি জমিদারদের এলাকা এবং এদেরই মধ্যে আনন্দপুরে গোবিন্দ আস্তানা গাড়েন। গুরুগোবিন্দ এদেরই হয়ে মুঘলদের সঙ্গে লড়াই করেন এবং সেই যুদ্ধগুলো মূলত আওরঙ্গজেবকে নিয়মিত পেশকশ না দেবার ফলে পার্বত্য রাজাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত মুঘল সৈন্যদের অভিযানকে প্রতিরোধ করার জন্যে অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য রাজাদের শাস্তি দিলেও বিজয়ী মুঘলসৈন্য গুরুগোবিন্দকে কিছু বলে না। গুরুগোবিন্দের আত্মজীবনী বাচিত্রা নাটক ও গুরুবিলাসের সাক্ষ্য এর প্রমাণ। হয়তো, মুঘলরা গুরুগোবিন্দকে বিদ্রোহের মূল নায়ক হিসেবে দেখেনি।

এর পরে গুরুগোবিন্দের সঙ্গে হিন্দু ও শক্তি উপাসক পার্বত্য রাজাদের সংঘর্ষ হয়। শিখ সাহিত্যে এর কারণ খুব স্পষ্ট। গুরুগোবিন্দ আনন্দপুরে স্থায়ী আস্তানা গাড়তে চান এবং আশেপাশের গ্রামের রাজস্বের ওপরে নিজের অধিকার স্থাপন করতে চান। আহমদ শাহ বাটালা রচিত 'তারিখ-ই-হিন্দ'-এর সাক্ষ্য অনুযায়ী গুরুগোবিন্দ আনন্দপুরের চারিধারে প্রায় ১০০ মাইল বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে নিজের ও তাঁর অনুচরদের জন্যে স্বতন্ত্র এলাকা স্থাপনে অভিলাষী ছিলেন। গুরুগোবিন্দ রাজকীয় পরিবেশে দরবার করতেন এবং তাঁর কাকা কৃপাল সিং সমস্ত পার্বত্য রাজাদের দরবারে নজর পাঠাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। রাজ-

সম্মানসূচক ঢাক বাজানো তিনিই চালু করেন। এই নিয়েই কাহলুর প্রমুখ পার্বত্য রাজাদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ শুরু হয়। আলস্থন, কালমোট ইত্যাদি গ্রাম থেকে গুরু তাঁর ধার্য আদায় করতে আরম্ভ করলে সেখানকার রায়তরা গুরুকে আক্রমণ করে এবং পার্বত্য রাজারা উদ্বৃত্ত সামাজিক সম্পদের এই নতুন ভাগী-দারকে সুনজরে দেখেনি। তারা মুঘলসৈন্যকে আহ্বান জানায়। স্বভাবতই পেশকশি জমিদারদের কায়েমি স্বার্থের পক্ষে মুঘলসৈন্যরা রীতি অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করে এবং গুরু আনন্দপুর থেকে বিতাড়িত হন।

'জাফরনামা' বলে একটি চিঠিতে গুরুগোবিন্দ আওরঙ্গজেবের কাছে একটি আবেদন পাঠান। তাঁর মতে আনন্দপুর তাঁর 'ওয়াতন' বা বংশানুক্রমিক স্বত্বে প্রাপ্ত জমিদারি, এবং তিনি পার্বত্যরাজ ভীমচাঁদকে কর দিতে বাধ্য নন। মুঘল সম্রাটের উচিত ওয়াতনদার হিসাবে তাঁর দাবি মেনে নেওয়া বা তদন্ত করা। তা না করে শুধুমাত্র পার্বত্য রাজাদের কথা শুনে তাঁর বিরুদ্ধে মুঘলসৈন্য পাঠানো নীতিসম্মত নয়। আওরঙ্গজেব গুরুগোবিন্দকে তাঁর আরজি নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। দাক্ষিণাত্যে যেতে যেতেই আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয় ও পরে বাহাদুর শাহ গুরুগোবিন্দের দাবি স্বীকার করে নেন।[১১০]

একটি চক্রান্তের ফলে গুরুগোবিন্দের মৃত্যু হয়। শিখ বিদ্রোহের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়। এর প্রধান এলাকা কিন্তু হিমাচল প্রদেশ নয়, তা হলো মাঝহা ও দোয়াব অঞ্চল। এবারকার নেতা বান্দা। বান্দা নিজে ক্ষত্রি ও প্রথম জীবনে ভ্রাম্যমাণ বৈরাগী ছিলেন। বান্দার মূল বাহিনীর সঙ্গে নানা ধরনের নিম্নবর্ণের লোক ও কৃষক যোগ দেয়। কেউ কেউ অবশ্য বান্দাকে সাধারণ রাজপুত চাষী বলে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালের শিখনেতারা সব এই সময়কার আন্দো-লনের নায়ক, অথবা এই বিদ্রোহের পটভূমিতে তাদের উত্থান হয়। রামগড়িয়া মিসলের প্রতিষ্ঠাতা জাসা সিংহ একজন 'তারখন' বা গ্রামীণ ছুতোর। আহলু-ওয়ালিয়া মিসলের প্রতিষ্ঠাতা জাসা সিংহ একজন 'কল্লাল' বা মদচোলাইকারী। ভাঙ্গি মিসলের প্রতিষ্ঠাতা চহজা সিং ভাঙ্গি (মেথর বা ভাঙসেবক)। অষ্টাদশ শতকে গুলাম আলি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—"শিখদের সর্দাররা অধিকাংশই নীচবংশ সম্ভূত ছুতোর, মুচি ও জাঠ।"[১১১]

খালসার আদি সদস্যদের মধ্যে ছিল মুখমচাঁদ ধোপা, সাহিবচাঁদ নাপিত, দয়াল সিং মেথর। রুক্কাৎ-ই-আমিন-উদ্দৌলার ৩নং চিঠিতে বলা হয়েছে যে, হিন্দু ও মুসলিম নির্বিশেষে সাধারণ লোক বান্দার সমর্থক হয়েছে। ভীলওয়ালের যুদ্ধে সম্পন্ন হিন্দু ক্ষত্রিরা ও মুসলিম সামন্তরা একযোগে বান্দাকে বাধা দিয়েছিল। ইরাদৎ খানের 'তজকিরা' অনুযায়ী মালওয়া এলাকায় কর্নালের রাজপুত জমিদারদের বাধার জন্যেই বান্দা যমুনার দিকে অগ্রসর হতে পারেন নি। চূড়ামন জাঠ, ছত্রশাল বুন্দেলা ও অন্যান্য হিন্দু জমিদাররা বাহাদুর শাহের

পক্ষে লোহাগড়ে বান্দার প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ভাঙতে মুঘলসৈন্যকে সবচেয়ে বেশি মদত দেয়।

অন্যদিকে সরহিন্দের সুবাদার ওয়াজির খানের হিন্দু রাজস্ব কর্মচারি সুচানন্দ ব্রাহ্মণ শিখদের আক্রোশের প্রধান শিকার হয়েছিল। কারণ, রাজস্ব কর্মচারি হিসেবে তার অত্যাচারের সীমা ছিল না। হিন্দু বলে শিখরা তাকে রেহাই দেয়নি। ইবরৎনামায় মহম্মদ কাশিম লিখেছেন—"এই চরম দিনের জন্যেই বোধহয় সুচানন্দের হাভেলি তৈরি করা হয় ও সম্পদ জড়ো করা হয়। ...আশপাশের লোকেদের কাছে আমি শুনেছি যে, মৃত ওয়াজির খানের রাজত্বের সময় এমন কোনো অত্যাচার নেই যা সে করেনি। যে ফল সে এখন ভোগ করছে, তার বীজ সে নিজেই বুনেছিল।"[১১২]

আবার, বান্দা সাধারণ লোক দিয়ে তাঁর শাসনব্যবস্থা চালাতে চাইলেন এবং তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য মুসলিম রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদাররাও ছিল। খাফি খানের বর্ণনা অনুযায়ী: অনেক গ্রামে সে রাজস্ব (মাল) সংগ্রহের জন্যে নিজের তহশিলদার ও থানাদার বসিয়েছিল এবং ব্যাপার এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছল যে···তাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করার জন্যে এবং পদত্যাগ করার জন্যে সে সরকারি কর্মচারি ও জায়গিরদারদের অনুচরদের অনুজ্ঞাপত্র লিখল···অনেক হিংস্রুটে নিম্নবর্ণের হিন্দু তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে এবং এই সমস্ত বদ মনোভাব সম্পন্ন লোকেদের হাতে তাদের জীবন সমর্পণ করে এবং এইসব বিষয়ে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে নিজেরা লাভবান হচ্ছে এবং অন্যান্য বর্ণের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করছে ও মারছে।[১১৩]

ওয়ারিদ সরহিন্দে বান্দার রাজ্যপাটের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। "ওয়াজির খানকে হত্যার পরে সে এই আইন জারি করল যে, হিন্দু ও মুসলিমদের যেই শিখ হবে সেই সবার সঙ্গে একসাথে খাবে। এবং সম্মানিত ও নিচুদের মধ্যে সব ভেদাভেদের অবসানের ফলে সবাই এক হলো। নিম্নজাত মেথর ও উচ্চবংশ সম্ভূত রাজা একই সঙ্গে পানীয় ও আহার গ্রহণ করার ফলে একে অপরের প্রতি কোনো বিদ্বেষ পোষণ করত না। ·· হিন্দুস্তানের সবচেয়ে নোংরা জাত ঘৃণ্য চামার ও মেথর অভিশপ্ত লোকের (বান্দার) কাছে নিজে উপস্থিত হয় এবং তার নিজের শহরে তার (বান্দার) দ্বারা নিযুক্ত হয়। যখন সে নিয়োগপত্র সমেত তার এলাকা, শহর বা গ্রামে পৌছায় তখন সমস্ত প্রধান ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাকে স্বাগত জানাতে যায় এবং সে নামবার পর তার সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়ায়।"[১১৪]

এর একটা নির্দিষ্ট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সরহিন্দের শাসনভার হয়বৎপুর পাট্টির নিম্নবর্ণের বীরসিংহকে অর্পণ করা হয়। বান্দার বিদ্রোহে

মুসলমানরা সামিল হয়েছিল। ২৮ এপ্রিল ১৭১১ সনের আখবারাতের একটি উদ্ধৃতি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

"ভগবতীদাস হরকরা হিদায়েৎউল্লার মাধ্যমে বাদশাহের কাছে এই সংবাদ পাঠাচ্ছে। ১৯ তারিখে সেই হতভাগা নানক পূজারী কালানৌর শহরে ছিল। এই সময়ে সে প্রতিজ্ঞা করে ও ঘোষণা করে যে, মুসলমানদের ওপর আমি অত্যাচার করব না। (মরতুমে মুসলমান আজার নেদেহাম।) ফলে, তার কাছে যে মুসলমানই আসত তাকে সে নির্দিষ্ট ভাতা ও মাইনে দিত এবং তার দেখাশুনা করত। সে তাদের খুৎবা ও নমাজ পড়বার অনুমতি দিয়েছিল। (ইজারত দাদে কে খুৎবে ওয়া নমাজ মিখওয়ানদে বশান্দ।) ফলে, তার চার পাশে ৫ হাজার মুসলমান জমায়েৎ হয়েছিল। তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হবার পর সেনাবাহিনীর মধ্যে তারা বাঙ্গ বাজাত ও নমাজ পড়তে পারত।"

বারবার আখবারাতে বলা হয়েছে যে, হিন্দু বা মুসলিমকে তার দলে নিতে বান্দা বাদবিচার করতেন না। ২০ মে ১৭১১ সনে আখবারাতে বাটালাতে বান্দার কাজকর্ম সম্পর্কে বলা হচ্ছে "হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে কেউ তার কাছে চাকরি চায় তাকেই দেখাশোনা করা হয়, খাবার দেওয়া হয় এবং লুণ্ঠনে তাদের অধিকার স্বীকার করা হয়।"[১১৫]

সহি-উল্-আখবারের বক্তব্য অনুযায়ী, বান্দা সরকার ও জমিদারদের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে জমিদারি ব্যবস্থা বিলোপ করে দেন। খাফি খানের বর্ণনায় মনে হয় যে, মধ্যবর্তী জমিদাররা অর্থাৎ খিদমৎ-গুজারি জমিদাররা বান্দার আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। কারণ তারা রাজস্ব সংগ্রহে সরকারকে সাহায্য করত এবং বান্দা সেই জায়গায় জাঠ সম্প্রদায় থেকে নিজেদের লোকদের নিযুক্ত করেছিলেন। ফলে, স্থানীয় রাজপুত জমিদার ও মুসলিম কর্মচারিদের সঙ্গে বিরোধ অপরিহার্য ছিল। কারণ উদ্বৃত্ত সামাজিক সম্পদের ওপর তাদের প্রাধান্য এতে খর্ব হয় এবং রাজস্ব-ব্যবস্থার এরকম আঘাত তলার দিকের হিন্দু ও মুসলিম নির্বিশেষে গ্রামীণ সমাজের নানা উপজীবিকার লোককে সহজেই আকৃষ্ট করবে, একথা বলাই বাহুল্য। শিখ বিদ্রোহের সঙ্গে রাজস্ব-ব্যবস্থার চাপ ও সরকারি অত্যাচারের সরাসরি যোগসূত্র মুঘলানি বেগমের আমলে সিয়ার-এ সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। গুলাম হোসেন তবাতবাই লিখেছেন: "যখনই কোনো গ্রামে অত্যাচার (তয়াদি) হতো সেখানকার লোকেরা (আহলে অনখনে) তাদের চুল ও দাড়ি গজাতে দিত, 'আকাল আকাল' বলে উঠত ও গুরুগোবিন্দের ধর্ম নিত।"[১১৬] হকিকতে বিনাতে বলা হয়েছে—"খালিসা শরিফা থেকে ফৌজদাররা প্রায়ই শিখদের চলে যেতে বলত এবং শিখরা জবাব দিত যে তারা নিজেরাই খালসা।"

ফলে, দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকরা নিপীড়িত হতে লাগল এবং শিখধর্ম

ছিল তাদের একমাত্র আশ্রয়। রাজস্ব-ব্যবস্থার সংকটের ফলে কৃষকদের ওপর অত্যাচার বৃদ্ধি পেলো। সেই অনুপাতে শিখদের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। আহমদ শাহ বাটালা বলেছেন যে জাকেরিয়া খানের সময় কানুনগোর অত্যাচার বহু কৃষককে শিখদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল এবং কৃষকদের সহানুভূতি স্বভাবতই এই শিখদের পক্ষে ছিল। বান্দার সময় থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং আহমদ শাহ আবদালির আক্রমণের সময় তা চরমে পৌঁছায়।

সাম্প্রতিক একটি গবেষণা বান্দার প্রতিপক্ষদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে। বান্দার পেছনে মালগুজারি জমিদারদের একটি সমর্থন ছিল। বারি দোয়াবেই এদের প্রাধান্য ছিল এবং এরা বান্দার ব্যাপক সহায়তা করেছিল। ফাররুখ-সিয়ারের সময় গুরুদাসপুর গড়ে অবস্থিত বান্দাকে খাদ্য সরবরাহ এই অঞ্চল থেকেই করা হতো। ফলে, আফগান ও রাজপুত জমিদার—যাদের মধ্যে অনেকেই মধ্যবর্তী স্তরের জমিদার এবং রাজদরবারের সঙ্গে যুক্ত, জাঠদের এই উত্থানে ভীত হয়ে পড়ে ও মুঘলদের সহায়তা করে। বান্দার সমর্থক জমিদাররা মূলত মৌজা বা দেহাতের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং বিরোধী জমিদাররা মূলত মধ্যবর্তী জমিদার হিসাবেই চিহ্নিত হয়েছে। তাই, বান্দার আন্দোলন একটি স্তরে প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী জমিদারদের দ্বন্দ্বের ফল।

বান্দার আন্দোলনে ক্ষাত্ররাও খুশি হয়নি। প্রথমত—বান্দা শহর ও বাজার লুঠতরাজ করেন এবং তারা রেহাই পায়নি। মহম্মদ কাসিম আওরঙ্গবাদী সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন: "সিরহিন্দ ও পাঞ্জাবের সাহুকাররা লক্ষ-লক্ষ টাকার অধিকারী ছিল এবং তারা হাজারে হাজারে নিজেদের পেশায় নিযুক্ত ছিল। সুবার সম্পদে ভাগীদার হয়ে বণিকরাও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সেইসব দুষ্টভাগ্য মন্দমতিরা তাদেরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল এবং থাকবার জন্যে একটুও কিছু রেখে দেয়নি।"

অন্যদিকে এ-সময় ইজারাদারি ব্যবস্থার প্রচলন হচ্ছিল এবং ক্ষাত্ররা অনেকেই ইজারাদার ছিল। তবে, বান্দা রাজস্ব সংগ্রহের এখতিয়ার নিজের লোকেদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। গণেশ দাসের ভাষায়: "শিখরা নিজেদের খালসা বলে মনে করে এবং অন্যদের মনে করে চাকর ও রায়ৎ। এবং তারা নিজেদের অধিকৃত এলাকায় নিজেদের আমিলের মাধ্যমে অ-শিখদের কাছ থেকে কর ও নজর আদায় করে।"

ফলে, ক্ষত্রিদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলো। ক্ষুণ্ণ হলো মদৎ-ই-মায়েশ ভোক্তা ও অন্যান্য মধ্যবর্তী জমিদারদের অধিকার। কারণ, রাজস্ব সংগ্রহের এই পাল্টা সংগঠনে তাদের কোনো ভূমিকাই নেই। ১৭১০ সনে রাহনে শিখরা ঐ অঞ্চলের মুঘল চৌধুরি ও কানুনগো জমিদারদের একদিক থেকে ঢালাওভাবে আত্মসমর্পণ করতে

বজে। ফলে, হিন্দু ও মুসলিম সম্পন্ন ব্যক্তিরা বান্দার বিরুদ্ধে একজোট্টা হয়। লাহোরের সম্পন্ন ক্ষত্রিরা সৈয়দদের পাশে দাঁড়ায় বান্দাকে প্রতিরোধ করার জন্যে। পাঞ্জাবের লাক্কি নামে খ্যাত কাপড়ের বণিকরা মুঘল সৈন্যের সমরায়োজনে প্রচুর অর্থ সাহায্য করে। আম্বালা ও কর্নালের জমিদাররা শিখদের দমনে তৎপর হয়ে ওঠে। বান্দা এই পর্যায়ে একটি 'ধর্মযুদ্ধের' ডাক দেন। কিন্তু তাঁর সেই ডাকে কোনো হিন্দুই সাড়া দেয়নি, বরং বান্দার নিজের দলেই বিভেদ দেখা যায়। তদ্ খালসা কাহন সিং ও মিরি সিং-এর নেতৃত্বে বেরিয়ে যায়।[১১৭]

বাহাদুর শাহ ও ফাররুখসিয়ারের আমলে সামনাদ খান ও জাকেরিয়া খানের প্রচেষ্টায় শিখ বিদ্রোহকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা হয় এবং বান্দাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। এখানেও কৃষক সৈন্যবাহিনী তীব্র বিক্রম দেখায়। বহুদিন পর্যন্ত মুঘলসৈন্য বান্দার গেরিলা যুদ্ধের কায়দার সঙ্গে পেরে ওঠেনি। গুরুদাসপুর গড়ে ৮ মাস অবরোধের সময়েও সাহস ও আত্মত্যাগের তুলনা মেলা ভার। খাদ্যের অভাবে শিখসৈন্য হাড় ও পাতা গুঁড়ো করে খেত। মুঘল ইতিহাসবিদ খাফি খান আগেই লিখেছিলেন : "এই ভিখারি সৈন্যবাহিনী তাদের বন্য ও দুঃসাহসিক আক্রমণ দ্বারা মুঘল সৈন্যদের মধ্যে যে আতঙ্ক ও ভয়ের সঞ্চার করত তা বর্ণনাতীত।" গুরুদাসপুর গড় অবরোধের সময় কামওয়ার খান লিখেছেন : "এসব সত্ত্বেও নারকীয় শিখগুরু ও তাঁর অনুচররা সালাতানাৎ-ই-মুঘলিয়ার সমবেত শক্তিকে ৮ মাস ধরে প্রতিরোধ করেছিল।"[১১৮]

আহমদশাহ আবদালি, মারাঠা অভিযান ও মুঘলানি বেগমের আমলে ১৭৭০ সন নাগাদ পাঞ্জাবে আবার শিখ শক্তির অভ্যুত্থান হয়। এটাকে আমরা বলতে পারি 'মিসল'দের যুগ।

এই 'মিসল'গুলো জাঠ 'খপ' বা 'জাথা'র অনুযায়ী তৈরি হয়। এগুলো সর্দারভিত্তিক। যদিও সব শিখ মিসলের ওপর দল খালসা' এবং তাদের সম্প্রদায়গত যৌথ মত বা গুরুমতের সীমিত কর্তৃত্ব থাকত, মিসলরা ছিল মোটা-মুটি স্বাধীন এবং এলাকার অধিকার নিয়ে পরস্পরের মধ্যে অনন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো। প্রকৃতপক্ষে, বান্দার মৃত্যুর পর শিখ শক্তির কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ভেঙে যায়। ফলে, অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি শিখ শক্তির পুনরুত্থানের যুগে স্থানীয় নেতৃত্বই প্রাধান্য পায়। এছাড়া, জাঠ সম্প্রদায়ের কৌমগত বিভেদ থেকেই যায়। মিসলগুলো শুধুমাত্র গুরুতর বিপদের সময় একত্র হতো বা আলোচনা করত। অন্যথায় প্রত্যেকটি মিসলের নেতা বা মিসলের অন্তর্গত সর্দাররা দৈনন্দিন কাজে নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করত এবং মিসল পরিবর্তনও সর্দারদের মধ্যে হামেশাই হতো। ক্রমশ মিসলদের পদ বংশানুক্রমিক হয় এবং একেকটি এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় ক্ষমতা গড়ে ওঠে, যেগুলো পুরোপুরি পুরনো জমিদারি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুরূপ।[১১৯] 'রেখ' ব্যবস্থার মাধ্যমে শিখ সর্দাররা এক

অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে কর নিত ও তার বদলে লুঠতরাজের হাত থেকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিত। এই ব্যবস্থার প্রচলন একটি মিসলের আঞ্চলিক ক্ষমতা-ভাগকে ত্বরান্বিত করে।

লক্ষণীয় যে, এই মিসল যুগে বহু জাঠ 'চৌধুরি' পদাবলম্বী জমিদাররা শিখধর্মে যোগ দেয়। তার একটা কারণ ছিল পেশকশি রাজপুত জমিদারদের কর্তৃত্ব বাতিল করা। মুকুন্দপুরের কুলদীপ সিং-এর পরিবাররা মুঘল চৌধুরিই ছিল। গঙ্গারাম ও চহজুমলের আমলে তারা স্থানীয় অপেক্ষাকৃত প্রভাবশালী ঝুঝনিয়া রাজপুতদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সুবিধের জন্যে শিখধর্ম গ্রহণ কার। থেথরের চের সিংহ ১৭৪০ সন পর্যন্ত মুঘলদের বশংবদ চৌধুরি ছিল এবং পরে শিখ 'মিসলে' যোগ দেয়। এরকম অজস্র উদাহরণ আছে।[১২]

রাজপুত জমিদারদের স্থানে জাঠ জমিদার ও সর্দারদের আবির্ভাব অষ্টাদশ শতকের পাঞ্জাবের মিসল-পর্বের সামাজিক প্রক্রিয়াজাত। আইন-ই-আকবরীর সাক্ষ্য অনুযায়ী আমরা দেখি যে, আকবরের আমলে জালন্ধর দোয়াবে রাজপুত জমিদাররা ৪৩টি মহল, ৫৫ ভাগ জায়গা ও ৪৬ ভাগ রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ করত। ব্রিটিশ ভূমি সংস্কার নীতির প্রাক্কালের হিসাব অনুযায়ী রাজপুতরা ১৫টি মহল, ১৭ ভাগ এলাকা ও ১৫ ভাগ রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ করছিল—যেখানে জাঠ জমিদাররা ৫১টি মহল, ৪৮ ভাগ এলাকা ও ৫৬ ভাগ রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ করত।[১২১]

কিন্তু বান্দার আমলের কৃষক বিদ্রোহ আস্তে আস্তে শিখ মিসলদার বা সমস্ত নেতাদের জন্ম দিল। আজাদ বিলগ্রাম লিখলেন: "শিখেরা তাদের নিজেদের মধ্য থেকে জাসা সিংহ নামধারী একজনকে বাদশাহিতে বসালো এবং তার নামে সিক্কা রুপেয়াকে কালো করে দিল।"[১২২]

জাসা সিংহের নামে লাহোর থেকে মুদ্রা চালু হলো। এবং শিখ বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সামন্ত শক্তির উদ্ভব সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়ে গেছেন ১৭৭৬ সনে সুইস সেনানায়ক পালিয়ের: "শিখ রাষ্ট্র বহু মস্তিষ্ক বিশিষ্ট সর্প। এখন আটক থেকে হিসার ও দিল্লির দ্বারদেশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি জমিদার তার দাড়ি রাখে ও গুরুজীর জয় বলে ··· ঘোড়ার পিঠে নিদেনপক্ষে ১০ জন অনুচরকে নেতৃত্ব দেয়, তখনই সে নিজেকে শিখ সর্দার বলে। তার ক্ষমতা অনুযায়ী সে তার দুর্বল প্রতিবেশীর বিনিময়ে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। প্রতিবেশী হিন্দু বা মুসলিম হলেই তো ভালো। তা না হলে সে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যেই তার ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তার করে।···এই শিখ সর্দাররা কিছুদিন আগে পর্যন্ত জাঠদের জমিদার ছিল এবং সেই সম্প্রদায়ভুক্ত।[১২৩] সামন্তশক্তির এই অভ্যুদয়ের চরম বিকাশ দেখা দিল রঞ্জিৎ সিংহের উত্থানে। এই উত্থান মুঘল আমলের কৃষক বিদ্রোহের বৃত্তাকারে আবর্তনকে সম্পূর্ণ করে।

শিখ বিদ্রোহের বিভিন্ন পর্যায়কে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে একেকটি পর্যায়ে

আন্দোলনের চরিত্র ভিন্ন ছিল। তেগবাহাদুরের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের শিখদের প্রতি অবিমিশ্র শত্রুতার মনোভাব নেন নি। বরং তাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধে হস্তক্ষেপে অনীহা ও তাদের ধর্মের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনের আভাসই আছে। মনে হয়, পাণ্টা করগ্রহণের প্রতি আওরঙ্গজেবের দৃঢ় মনোভাব, পাঞ্জাবে শান্তি ও শৃংখলার প্রশ্ন এবং তেগবাহাদুরের বিরুদ্ধে মুঘল দরবারে তার বিরোধী দলগুলির ষড়যন্ত্রই তেগবাহাদুরের মৃত্যুর কারণ। গুরুগোবিন্দের সমর্থক যে পাঞ্জাবের সমতলভূমিতে কম ছিল, তা তাঁর হিমাচল প্রদেশের পাহাড়ি এলাকায় আশ্রয় নেওয়া থেকে বোঝা যায়। আবার, প্রথম পর্যায়ে গুরুগোবিন্দ হিমাচল প্রদেশের হিন্দু 'পেশকশি' রাজাদের মিত্র মাত্র। তাঁর প্রতিরোধ সেখানে মুঘল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একক শিখ বিদ্রোহ নয়। সুতরাং সেইজন্যে বোধহয় বিদ্রোহী পেশকশি জমিদারদের দমন করে মুঘলসৈন্যরা ক্ষান্ত হয়—গুরুগোবিন্দের ওপর হামলা করার কোনো রাজনৈতিক প্রয়োজন বোধ করে না।

পরবর্তীকালে গুরুগোবিন্দের সময় আন্দোলনের সূচীমুখ ছিল হিমাচল প্রদেশের রাজাদের বিরুদ্ধে। তিনি সেখানে নিজের ওয়াতন জমিদারি স্থাপনের প্রচেষ্টায় সচেষ্ট ছিলেন। এখন স্থায়ী ও পেশকশি জমিদারের পক্ষে আসতে মুঘল রাজশক্তি বাধ্য। তাই গুরুগোবিন্দের পেছনে উত্থিত সামাজিক শক্তিকে মুঘলরা স্বীকার করেনি। পরে কিন্তু আওরঙ্গজেব গোবিন্দের আরজিতে কর্ণপাত করেছিলেন এবং বাহাদুর শাহ গোবিন্দের অধিকার মেনে নেন। জমিদারি, মনসব ও ওয়াতন দেওয়ার মাধ্যমে নতুন শক্তিকে রাষ্ট্র-কাঠামোয় স্থান দেওয়া মুঘলদের বরাবরের নীতি। খটকরা বা চূড়ামন জাঠ এভাবেই একই সময় রাষ্ট্র-কাঠামোর স্থান পেয়েছিল। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, অবিচারের প্রতিকারের জন্যে গুরুগোবিন্দ মুঘল রাজশক্তির কাছে আবেদন জানাল। এতে মুঘল রাজশক্তির সার্বভৌমত্বকে গুরুগোবিন্দ একভাবে স্বীকার করেছেন। তিনি এখানে মুঘল রাষ্ট্র-কাঠামোকে আদৌ অস্বীকার করেন নি। বরং একটি স্থানীয় শক্তির বিরুদ্ধে নতুন শক্তি হিসেবে তিনি মুঘল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আবেদন করেছেন এবং সেই ন্যায়সংগত অধিকার পাবার জন্যেই তিনি নিতান্ত বাধ্য হয়ে অস্ত্র নিয়েছিলেন। তাঁর লেখায় এটা খুব স্পষ্ট। ফলে, গুরুগোবিন্দকে শেষ পর্যায়ে মুঘল রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে মেনে নিতে খুব অসুবিধে হয়নি।

ফারসি ও শিখসাহিত্যে গুরুগোবিন্দের আন্দোলন একটি গোষ্ঠির স্থায়ী এলাকায় ক্ষমতার গড়ার প্রক্রিয়াকে দেখানো হয়েছে। ফলে এইসব অঞ্চলে কৃষকদের গ্রামে গুরুর সৈন্যরা মাঝে মাঝে লুঠতরাজ করত। চূড়ামনের সঙ্গে গুরুগোবিন্দের সাদৃশ্য এই পর্যায়ে খুঁজে পাওয়া যায়। এই ধরনের ক্ষমতা

নিয়ে সংঘর্ষের সূচনা অবশ্য গুরু হরগোবিন্দের সময়ই শুরু হয়। শিখ-সাহিত্য অনুযায়ী গুরু যখন হরগোবিন্দপুর স্থাপন করতে চান তখন তাঁর প্রতিষ্ঠায় আশঙ্কিত হয়ে চৌধুরি ভগবানদাস বাধা দেয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে শিখদের সংঘর্ষ হয় এবং চৌধুরি মারা যায়। উঠতি জাঠদের সঙ্গে হিন্দু ও ব্রাহ্মণদের গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি নিয়ে বিরোধের সুস্পষ্ট নিদর্শন হলো এই ধরনের সংঘর্ষ।[১২৪]

বান্দার সময় আন্দোলনের ক্ষেত্র কিন্তু হিমাচল প্রদেশ নয়, মাঝহা ও দোয়াব এলাকা। এই অঞ্চল জাঠ কৃষক অধ্যুষিত। এই সময় গুরু-পদও বিলুপ্ত করা হয়েছে, খালসা স্থাপিত হয়েছে অর্থাৎ ক্ষত্রিদের জায়গায় জাঠদের প্রাধান্য স্থাপন হয়েছে। অবশ্য বান্দা নিজেকে গুরু বললেও এবং 'ওয়া-গুরুজী ওয়া-খালিসা' ধ্বনির পরিবর্তে ফতে-ই-দর্শন বলে অভিবাদন ধ্বনি চালু করলেও তা স্বীকৃত হয়নি। বান্দার সময় নিঃসন্দেহে সাধারণ নিম্নবর্ণের কৃষক ও গ্রামীণ কারিগরদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষত্রিদের প্রাধান্য কমে যায়। পাঞ্জাব জুড়ে এসময় কৃষিব্যবস্থায় সংকট নেমে আসে। ফলে শিখ-বিদ্রোহ আর গুরুগোবিন্দের সীমিত লক্ষ্যে আবদ্ধ থাকে না। নতুন ওয়াতনের সুযোগ-সুবিধা অর্জন আর এই বিদ্রোহের উদ্দেশ্য থাকে না। গোটা মুঘল রাজস্ব-কাঠামোর ওপরে আঘাত নেমে আসে। ধর্মের বাধা অতিক্রম করেও শ্রেণীগত বিরোধ স্পষ্ট হয়। এই আন্দোলনে বান্দার পক্ষে থাকে হিন্দু ও মুসলিম নির্বিশেষে নিম্নবর্ণের কারিগর ও কৃষকরা, যেখানে বান্দার বিপক্ষে থাকে হিন্দু ও মুসলিম নির্বিশেষে উচ্চ সম্প্রদায়ের বণিকরা, হিন্দু ও মুসলিম অভিজাত জমিদাররা। বান্দা যে নিম্নবর্ণের লোকদের নিয়ে পাল্টা রাজস্ব কাঠামো তৈরি করতে চেয়েছিলেন এবং মুঘল সরকারি কর্মচারি ও তার সহায়ক মধ্যবর্তী।খদমৎ-গুজারি জমিদারদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, এ ধারণাও স্পষ্ট। এই পর্যায়ে শিখবিদ্রোহ বিশুদ্ধ অর্থেই শোষিত কৃষক ও গ্রামীণ কারিগরদের সশস্ত্র আন্দোলনে রূপ নেয়।

কিন্তু এর মধ্যেই সামন্তশক্তির উদ্ভবের বীজ লুকিয়ে ছিল। সেই অর্থে এসময় কোনো নতুন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ হয়নি। ফলে বান্দা নিজে কিছু মুদ্রা চালু করেন এবং গুরুদ্বারের ওপর নিজের অধিকার নিয়ে অন্যান্য শিখ নেতাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়। বান্দাই-শিখ ও তদ্-খালসা নামে দুটি দলেরই উদ্ভব হয়। পরবর্তীকালে মিসলের যুগে যখন শিখরা বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধ চালায়, তখন এলাকাভিত্তিক ক্ষুদ্র সামন্ত নায়করা ক্ষমতা অধিকার করে এবং নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা জাহির করে। বলা যেতে পারে যে, আদি গুরুদের সাচ্চা বাদশাহ উপাধির মধ্যেই এজাতীয় ক্ষমতা দখলের অভিলাষের বীজ লুকিয়েছিল। নতুন ধরনের চেতনা বা উৎপাদিকা শক্তি না থাকলে কৃষকসমাজে বিদ্রোহে উপজাত রাষ্ট্র-কাঠামো আগেকার রাষ্ট্রব্যবস্থার

প্রতিচ্ছায়ায় গঠিত হবে—এটাই স্বাভাবিক। কারণ তাদের নতুন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি করার বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই বা সামাজিক শর্তগুলোও উপস্থিত থাকে না। এটাও লক্ষণীয় যে, রঞ্জিৎ সিংহ তাঁর মুদ্রায় বান্দা ও পরবর্তীকালে মিসলদারদের মুদ্রার ভাষা ও কায়দা ব্যবহার করেছেন এবং এভাবে বান্দার বিদ্রোহের ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজের সামন্ততান্ত্রিক শিখ-রাষ্ট্রের ধারণাকে যুক্ত করেছেন।

বান্দার নেতৃত্বে কিছু প্রাথমিক জমিদার, কৃষক ও কারিগরদের প্রতিরোধ আন্দোলন কিন্তু শিখদের রাজনৈতিক উত্থানের একমাত্র ইতিহাস নয়। বান্দা রামরাইয়াদের রেহাই দেন নি এবং তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছেন। নিরঞ্জনশাখী শিখরা এই আন্দোলনের অংশীদার ছিল না। তবে সবচেয়ে বড় ব্যতিক্রম হচ্ছে মালওয়া অঞ্চলের শিখরা। এখানে আলা সিং নামে এক জাঠ-জমিদার রাষ্ট্র-কাঠামোর সঙ্গে নানারকম সমঝোতা করে তাঁর এলাকাকে বিস্তৃত করেন এবং ফুলকিয়া মিসলের নেতৃত্বে পাতিয়ালা রাজত্ব স্থাপন করেছেন। ১৭২৩ সনে তাঁর অধীনে ছিল ৩০টি গ্রাম; ১৭৬১ সনে তিনি ৭২৬টি গ্রামের অধিকারী হন। তিনি প্রয়োজন বুঝলে মারাঠা, মুঘল ও আফগানদের সাহায্য করেছেন, আবার লুঠতরাজও করেছেন। ১৭৬২ সনে তিনি ঘল্লুঘুরার যুদ্ধে আফগানদের বিরুদ্ধে শিখদের সম্মিলিত প্রতিরোধে দায়সারাভাবে উপস্থিত ছিলেন ও পরে আহমদ শাহ আবদালির ফরমান নিয়েই পাতিয়ালার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

আলা সিংকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জঙ্গনামাতে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জঙ্গনামার ভাষায় "সরহিন্দে একজন নায়ক বা সৈন্যবাহিনীর সর্দার আছে (সরদারি লশকরি)। সে (একাধারে) ঐ অঞ্চলের জমিদার, শাসক (হাকিম), প্রাদেশিক প্রতিনিধি এবং আমিন··· গোটা পাঞ্জাব লাহোর ও সরহিন্দে তার মতো সম্পদশালী কেউ নেই।··· সে সবসময় শিখদের বিরুদ্ধে। (কে শিখ? হমিশে বরুয়ে খেলাফ।) সে বিভিন্ন সময়ে শিখদের সঙ্গে লড়েছে। তবে এই যুদ্ধগুলোর কারণ পার্থিব, ধর্মীয় নয়। (কে অন জঙ্গে দুনিয়াসত।) তার অধীনে মুসলমানরা কাজ করে।"[১২৫] আলা সিং একই সঙ্গে বিভিন্ন পদ ভোগ করতেন। কোথাও বা তিনি আমিন বা রাজস্ব সংগ্রাহক, কোথাও বা তিনি নিছক জমিদার, মিলকিয়াৎ-এর অধিকারী। আবার ১৭৪৫ সন পর্যন্ত তিনি যে মুঘল শাসনের অধীনে ছিলেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে; কারণ রাজস্ব অনাদায় হেতু মুঘল ফৌজদার তাকে বন্দী করেছে।

আলা সিংহের ক্ষমতা বিস্তৃতির ক্ষেত্রে 'রেখ ব্যবস্থা' কাজ করে। নিয়মিত অর্থের বিনিময়ে একটি এলাকাকে সামরিক প্রতিরক্ষার আওতায় এনে লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার আশ্রয় দেওয়া হতো। এই থানাদারি ব্যবস্থার রূপান্তর করে আলা সিং আশ্রিত গ্রামগুলিকে নিজের সরাসরি শাসনের আওতায় আনতেন

এবং থোক টাকা সংগ্রহের বিনিময়ে নিজের তহশিলদার ও থানাদারদের নিযুক্ত করতেন। থানাদাররা তখন অন্য কোনো নতুন এলাকায় আলা সিংহের কাছ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হতো। আলা সিং অবশ্য তাঁর এলাকাতে পুরনো স্থানীয় ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীর সব ক্ষমতাকে স্বীকার করতেন এবং মুঘল প্রদত্ত অধিকারে কোনো হস্তক্ষেপ করতেন না। চৌথ ও সরদেশমুখির বিনিময়ে লুণ্ঠন থেকে অব্যাহতি ও ধীরে ধীরে মুলকগিরির এলাকাকে স্বরাজ্যে রূপান্তর, কামবিশদার বলে রাজস্ব কর্মচারির উদ্ভব—এ সবই অষ্টাদশ শতকে মারাঠা শক্তির ক্ষমতা বিস্তারের প্রক্রিয়ার নানা বিন্দু মাত্র। আলা সিংহের অভ্যুত্থানের পেছনেও আমরা একই প্রক্রিয়া দেখি।[১২৬]

এই জাতীয় শিখ ক্ষমতা স্থাপনের সঙ্গে বান্দার বিদ্রোহের প্রভাব অনেক। এখানে ধর্ম বা শোষিত সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ ও সংগ্রামের বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। জলন্ধর দোয়াবের শাসনকর্তা মুসলিম শাসক আদিনা বেগ খানের সুযোগসন্ধানী নীতির সঙ্গে শিখসর্দার আলা সিংহের নীতির কোনো পার্থক্য নেই। এখানে বিশুদ্ধ সামন্ততান্ত্রিক কায়েমি স্বার্থের আওতায় শিখরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। মিসলের সময় এই ধরনের সর্দারদের উদ্ভবই হলো শিখ আন্দোলনের মূল দিক এবং বান্দার আমলের কৃষক-বিদ্রোহের চরিত্র ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হলো। শিখ-বিদ্রোহ শুরু হয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠাকামী সম্প্রদায়ের নেতার মুঘল রাষ্ট্র-কাঠামোর কাছ থেকে কিছু সুবিধা আদায়ের আন্দোলন হিসেবে। এবং তা রূপান্তরিত হয় কৃষক-বিদ্রোহ ও সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রামে। সেখান থেকে উঠে আসে সামন্ততান্ত্রিক সর্দারদের নেতৃত্বে পরিচালিত 'মিসল' ও দলগুলো। এভাবে বৃত্ত আবর্তিত হয়। কিন্তু এই আবর্তনের ফলে পাঞ্জাব থেকে নিশ্চিহ্ন হয় মুঘল রাষ্ট্রমহিমা ও আফগানশক্তি।

৩. কয়েকটি সাধারণ কথা : বর্ণ ও ধর্মের ভূমিকা

এখন আমরা কয়েকটি সাধারণ কথা বলতে পারি। অবশ্যই এইসব কথাগুলির ঐতিহাসিক যথার্থতা আরো গবেষণা সাপেক্ষ এবং ভবিষ্যতে নতুন তথ্যের ভিত্তিতে পরিবর্তন সাপেক্ষ। এখন এই কৃষক আন্দোলনে বর্ণ বা ধর্মের ভূমিকা কি, তা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। এ বিষয়ে প্রমাণ আছে যে, জাঠ-কৃষক আন্দোলনে 'খপ' বা জাতি পঞ্চায়েৎ বিভিন্ন সময়ে সমবেত হয়ে জাঠ-কৃষকদের মুঘল জায়গিরদারদের বিরুদ্ধে সমবেত হতে সাহায্য করে।[১২৭] শোভা সিংহের বিদ্রোহে বাগদি বা কোলদের বিদ্রোহেও বর্ণের ভূমিকার আভাস পাওয়া যায়। একথা বোধহয় বলা যায় যে, জমিদাররা অনেক সময় বর্ণব্যবস্থার সংযোগে একই বর্ণভুক্ত রায়তদের সমর্থন প্রত্যাশা করতে পারতেন। গোটা মধ্যযুগ ধরে সামাজিক সম্পর্কের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে

জাতে-ওঠার নিদর্শন পাওয়া যায়। এখন বর্ণব্যবস্থার কাঠামোই এরকম যে, এ ধরনের জাতে-ওঠা সম্ভব এবং তা সমাজকে খুব একটা বদলায় না। শুধু বর্ণব্যবস্থার পর্যায়ে কতকগুলি পরিবর্তন আসে। নতুন জাত সৃষ্টি হয়, বা কিছু জাত তার আগেকার অপেক্ষাকৃত নিম্নক্রমের বদলে আর একটু উঁচুক্রম পায়। ফলে মূল ভারসাম্য ঠিকই থাকে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠা কামনার আশা মধ্যযুগে অপেক্ষাকৃত বিরল ছিল। অন্যান্য ধরনের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ বা ধর্মীয় আন্দোলনই তার জন্যে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু জাতিগত ঐক্য নিঃসন্দেহে এক ধরনের সংহতি এনে দিয়েছিল। বিশেষত যেহেতু গ্রামের বসতি স্থাপন এবং কৃষকদের অধিকার রক্ষার সঙ্গে বর্ণের সম্পর্ক ছিল এবং আইন-ই-আকবরী অনুসারে প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলে জমিদারি অধিকারের বিস্তৃতির সঙ্গেই তাদের বর্ণের কথাও বলা হয়েছে—সেহেতু কৃষিজগতে বর্ণের সামাজিক ভূমিকা অনস্বীকার্য। এবং নতুন গোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার বা বিস্তৃতির লড়াই একদিক দিয়ে সামাজিক সম্পদের ওপর তার কর্তৃত্বের লড়াই। এ লড়াইয়ের সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা পাবার প্রশ্নও জড়িত। সুতরাং এইসব আন্দোলনে জয়লাভ মানে বর্ণব্যবস্থায় উচ্চক্রম লাভ করার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। আমরা দেখেছি, শিবাজী বা জাঠ-সর্দার ঠাকুর বদনসিং এই সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

এবার বোধহয় আর একদিকে আঙুল দেখানো যায়। বর্ণের ভূমিকা সেখানেই এবং সেই সময়েই জোরদার—যেখানে ও যখন অপেক্ষাকৃত সম্পদশালী শ্রেণী বা জমিদারদের ভূমির আন্দোলন প্রকট হয়েছে। কারণ, একেবারে তলার কৃষকদের পক্ষে হঠাৎ সামাজিক সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা শক্ত। তাদের লড়াই জীবনের ন্যূনতম মান বজায় রাখার জন্যে হয়েছে। সৎনামি, মাত্তিয়া বা বান্দার লড়াইতে আমরা বর্ণকে ব্যবহার করার পরিবর্তে বর্ণব্যবস্থায় জাত আইনগুলোকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখি। প্রকৃতপক্ষে বর্ণব্যবস্থা-ভিত্তিক আন্দোলন মধ্যযুগের কৃষক আন্দোলনকে অনেকটা সমঝোতামূলক ও স্তিমিত করেছে। কারণ, প্রথমত—এ জাতীয় আন্দোলন স্বভাবতই অন্যান্য বর্ণের লোকদের যোগ দিতে বাধা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত—এইসব আন্দোলনের পক্ষে আপোষমূলক হয়ে পড়বার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কারণ, যে মুহূর্তে আন্দোলনের এক গোষ্ঠী জাতে-ওঠার কথা ভাবে, অমনি কায়েমি ব্যবস্থার মধ্যেই সে স্থান খোঁজে, উৎপাদন-ব্যবস্থা বা সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের চেতনা সে আন্দোলনে আর থাকে না: গোটা আন্দোলন একান্ত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। তাই, চূড়ামন জাঠ বা ছত্রশাল বুন্দেলা বিপুল আগ্রহে শিখ-বিদ্রোহ দমন করতে যায়। মারাঠা নেতা সদাশিব রাও ভাও ও আহমদশাহ আবদালির মধ্যে

পাঞ্জাবের কৃষকরা কোনো পার্থক্য খুঁজে পায় না। তাই, বর্ণ এক পর্যায়ে কৃষক-আন্দোলনে সংহতি আনে। কিন্তু আবার এই ব্যবস্থার জন্তে উচ্চতর একটি শোষকশ্রেণীর নেতৃত্ব আন্দোলনে তুলনামূলকভাবে অনেক তাড়াতাড়ি কায়েম হয়; আন্দোলনের আপোষমুখী হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে এবং অন্ত বর্ণ বা জাতিভুক্ত কৃষকদের সহানুভূতি ও সমর্থন তাই এ জাতীয় আন্দোলন পায় না।

ক. কৃষক বিদ্রোহে ধর্ম

ধর্মের ভূমিকা এখানে খানিকটা পৃথক। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা দরকার। আওরঙ্গজেবের গোঁড়া ধর্মান্ধ নীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবেই আলোচিত বিদ্রোহগুলিকে সাধারণত দেখানো হয়ে থাকে। বিদ্রোহগুলির কারণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, এগুলির পেছনে গভীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ ছিল এবং মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপনের গোড়া থেকেই এই ধরনের বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। সমসাময়িক ইতিহাসবিদদের সাক্ষ্যে বা দলিলেও ঐসব বিদ্রোহগুলির ধর্মীয় দিক ততটা গুরুত্ব পায়নি। সৎনামি বিদ্রোহকে হিন্দু নাগর ব্রাহ্মণ ঈশ্বরদাস কিছু কম গালাগালি করেন নি, বা হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে দাসিরামের কৃষক-বিদ্রোহকে মুসলিম আওরঙ্গজেব কঠোর হাতে দমন করেছিলেন।

আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। প্রসংগত এই কয়েকটি কথা আপাতত মনে রাখলে চলবে যে, প্রথমত—সারা ভারত জুড়ে বহু হিন্দু ধর্মমন্দির আওরঙ্গজেবের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। দ্বিতীয়ত—আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের সময় ৫০ বছর। এর মধ্যে অনেক নীতির বিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে। একটি পর্যায়ের নীতিকে বিচার করে তাকে সারা রাজ্যকালের নীতি বলে স্থির করা অযৌক্তিক। তৃতীয়ত—আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত ধর্মমত এবং সম্রাট হিসেবে তাঁর ধর্মনীতির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। চতুর্থত—আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ পর্যায় থেকে হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতির কঠোরতা কমে আসছিল এবং বাহাদুর শাহের সময় থেকেই সেগুলো একেবারে নাকচ হয়ে যায়। তাতে কিন্তু প্রতিরোধ আন্দোলনের তীব্রতা কমে না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এর মানে অবশ্য এই নয় যে, আওরঙ্গজেব ধর্মীয় অনুদার নীতি কখনো অনুসরণ করেন নি, বা তা সাম্রাজ্যের মধ্যে কোনোরকম বিদ্বেষের সঞ্চার করেনি। আসলে একটিমাত্র কারণকে দায়ী না করে অন্যান্য কারণ খোঁজা এবং বহু কারণের মধ্যে সম্পর্ক অনুযায়ী গুরুত্ব নিরূপণ করা একজন সৎ ইতিহাসজ্ঞের কাজ।

আবার, মধ্যযুগের বাতাবরণে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। চিন্তা ও চেতনায়

জগতে সাধারণ মানুষ ও ধর্মের নামেই চিন্তা করত, যদিও ধর্ম সম্পর্কে তার ধারণার সঙ্গে ধনীদের ধারণার পার্থক্য থাকতেই পারে। তাই, ধর্মের দুটো দিক আমরা সমাজে দেখতে পাই। একটি সরকারি ধর্মমত, যা সমাজব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখতে চায় এবং অপরটি প্রতিবাদী ধর্মমত। এখন ভারতের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতক থেকে সুফি ও ভক্তিবাদ বিশিষ্ট ধর্ম প্রচারিত হয়। এইসব মরমিয়া ধর্মমতের সমর্থক ও অনুগতরা ছিল বিভিন্ন নিম্নজাতিভুক্ত কারিগর, ক্ষুদে ব্যবসাদার ও কৃষক। ধর্মের বাহ্যিক আচার এবং সামাজিক বহু রীতি-নীতির বিরুদ্ধে এইসব ধর্মগুলির প্রতিবাদ ছিল। রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে এইসব প্রচারকেরা অবশ্য সরাসরি কোনো মত প্রকাশ করেন নি, বরং দাদূ প্রমুখরা রাষ্ট্রক্ষমতার অপরিসীম শক্তিকে স্বীকারই করেছিলেন। কিন্তু এইসব ধর্মের মধ্যে নানা সামাজিক কারণে কোথাও কোথাও পরিবর্তন দেখা যায়। শিখধর্মের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন লক্ষণীয়। গুরুগোবিন্দ রাষ্ট্রক্ষমতার কাছে আবেদন-নিবেদনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করলেও প্রয়োজনমতো অস্ত্র নেওয়া যে যথার্থ, তা মুঘল সম্রাটকে জানিয়েছিলেন।

"চুন্ কার আজ হমে হিলাৎ-ই দর গুজশ্ত।
হালাল আস্ত বুরদান বে শামসিরে দাসত॥"

(অর্থাৎ "অন্যান্য উপায় যখন ব্যর্থ হয় তখন হাতে তরবারি ধরা ন্যায়-সংগত।")

সৎনামিরা এমনিতে নিরীহ হলেও কারো আজ্ঞাবহ ছিল না। তাদের ধর্মীয় নির্দেশেই এ ধরনের অনুজ্ঞা ছিল। অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সংস্কারমূলক ধর্ম রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে পারে। হবার সম্ভাবনাও থাকে, কিন্তু হবেই তার কোনো মানে নেই। কোন সময় ও কোন অঞ্চলে সংস্কারবাদী ধর্মীয় আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়—তা বিশেষ সামাজিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সেইসব আন্দোলনে ধর্ম কৃষকদের সংগ্রামে একটি বিশেষ চেতনা বা আদর্শের সঞ্চার করে। সৎনামি, মাতিয়া বা বান্দার নেতৃত্বে শিখ-বিদ্রোহে প্রতিরোধ আন্দোলনের যে তীব্রতা দেখা যায় বা বিদ্রোহী নেতাদের যে ধরনের যাদুবিদ্যায় অধিকারী বলে মনে করা হতো—তা যেকোনো প্রতিবাদী ধর্ম ভিত্তিক কৃষক-আন্দোলনের লক্ষণ। এখানে কৃষকরা কোনো উচ্চতর গোষ্ঠীর জাতে-ওঠার উচ্চাশাকে রূপায়িত করার জন্যে বা নিজের বাঁচার তাগিদে শুধু লড়ছে না। তার সামনে একটি আদর্শের উন্মাদনা আছে, যে আদর্শ অস্ফুট বা আজকের চোখে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতিতে অবাস্তব হতে পারে—কিন্তু সেটা অন্য কথা। ফলে সৎনামি, মাতিয়া বা বান্দার শিখ-বিদ্রোহে আত্মদান বা মরণপণ যুদ্ধের কাহিনী তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এইসব প্রতিবাদী ধর্মগুলিতে

বর্ণের ভূমিকা কম, বা ধর্মগুলি বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। ধর্মই এখানে সংহতি সাধন করে, বা ধর্মীয় সংগঠনগুলো আন্দোলনের পাল্টা সংগঠনের রূপ নিতে পারে। আবার, বর্ণব্যবস্থার প্রভাব শিথিল বলে নিম্নবর্ণের লোকেদের প্রাধান্য তুলনামূলকভাবে এখানে একটা পর্যায়ে স্থায়ী হয়।

আবার, এই ধর্মীয় চেতনার মধ্যেই কতকগুলো মূল্যবোধ জড়িয়ে থাকে। কৃষক-বিদ্রোহগুলো সেই মূল্যবোধকে স্বীকার করে। সামাজিক কারণে মুঘল আমলে ভারতীয় কৃষকের মূল্যবোধে মহাজন তার বন্ধু। ফলে, মহাজন-বিরোধী আন্দোলন আমরা মধ্যযুগে পাই না। পাপ রায় বা কিছু কিছু মারাঠা সর্দার নিন্দিত হন ও সামাজিকভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি হয়। কারণ তাঁরা ভ্রাম্যমাণ গোষ্ঠীবদ্ধ ব্যবসায়ীশ্রেণী বনজারাদের লুঠ করে, বা তাদের ওপর অত্যাচার করে। মনে রাখতে হবে যে, এরা যুদ্ধবিগ্রহের অঞ্চলে উভয় পক্ষের সৈন্যকেই ধান বিক্রি করত এবং মধ্যযুগের নিয়মানুযায়ী এদের ওপর আক্রমণ করা অনুচিত। সুতরাং বিদ্রোহের লক্ষ্য ইত্যাদি বিচারে কৃষকদের মানসিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধের ভূমিকাও অপরিসীম।

ধর্মীয় উৎসব বা সংগঠন সামাজিক সত্তারও বহিঃপ্রকাশ। আনন্দ, উন্মাদনা সব সমাজেই প্রয়োজনীয়, কৃষক সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা সেই সামাজিক সত্তায় হস্তক্ষেপ করে, সমাজের যোগাযোগের গ্রন্থিকে ব্যাহত করে। মুঘল রাষ্ট্রের ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিক্ষোভগুলিকে এই পটভূমিতে দেখলে, অনেক বেশি অর্থবহ হয়।

সবশেষে মনে রাখা দরকার যে, ধর্মীয় আন্দোলনের উন্মাদনা সব সময়েই আন্দোলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত—বান্দাও খালসা শিখদের হয়ে রামরাইয়া শিখদের ধ্বংস করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। আবার, বান্দার আন্দোলনের উন্মাদনা মুসলিম নিম্নবর্ণের কয়েকটি জায়গায় শিখদের পক্ষে এনেছে, কিন্তু প্রতিপক্ষও কয়েকটি জায়গায় বান্দার আন্দোলনের ধর্মীয় দিককে ব্যবহার করে ধর্মের জিগির তুলে নিম্নবর্ণের মুসলিমদের ইসলামের নামে সমবেত করতে পেরেছিল। সুলতানপুরে সামস খান 'বাফিন্দা' বা নিম্নবর্ণের জোলাদের এককাট্টা করে শিখসৈন্যকে প্রতিরোধ করেছিলেন।[১২৮] এখানে ধর্মের প্রভাব শিখ-বিদ্রোহের শ্রেণীচরিত্রকে ছাপিয়ে উঠেছিল। তাই, ধর্মের নানাধরনের ভূমিকা কৃষকসমাজে থাকে। সংহতিও আনতে পারে, বিভেদও সৃষ্টি করতে পারে —আন্দোলন বা পরিস্থিতি অনুযায়ী তা নির্ধারিত হয়। সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলা গেলেও বিশেষ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সেই সাধারণ সত্য নাও খাটতে পারে। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে সাধারণ নীতি আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতির ও সময়ের কথা ভুললে চলবে না।

এই কৃষক-বিদ্রোহের ও চেতনার একটি স্তরে ধর্মীয় বিদ্বেষ কিছুটা কাজ

করেছে বা তাকে ব্যবহার করা হয়েছে। সৎনামিরা কিছু মুসলিম মসজিদ ধ্বংস করেছে। আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমরা ক্রমশ দেবো। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই মন্দির বা মসজিদ ধ্বংস করা ভারতীয় ইতিহাসে এই সময়ের কোনো বিশেষ ঘটনা নয়। আবহমান কাল থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনরা এরকম কাজ করে আসছে। আসলে এইজাতীয় ধর্মকেন্দ্রগুলি সেই বিশেষ ধর্মের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির কেন্দ্র। ফলে, বিরোধী ধর্মমতকে ঘিরে যখন একটা জঙ্গি গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে, তখন তারা প্রতিপক্ষের সামাজিক প্রতিপত্তির কেন্দ্রকে আক্রমণ করে। আবার, চেতনার ক্ষেত্রে অত্যাচার ও শোষণবিরোধী বলেই এই বিদ্রোহগুলি মূলত চিহ্নিত হয়। যেমন, বান্দার সম্পর্কে কথা প্রচলিত আছে যে, অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে রায়তরা বান্দার কাছে প্রতিকারের জন্যে আবেদন জানান। বান্দা তাদের ওপরেই গুলী চালনার আদেশ দেন এই বলে যে তারা কাপুরুষ, নিজেদের উদ্যোগে অত্যাচারী জমিদারকে শাস্তি দিচ্ছে না।[১২৯]

'সিয়ারে' একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। মহম্মদ আমিন খানের প্রশ্নের জবাবে মৃত্যুপথযাত্রী বান্দা বলেন, "মানুষ যখন এত অসৎ ও দুষ্ট হয়ে যায় যে তারা ন্যায়ের পথ ছেড়ে দেয় এবং সর্বপ্রকার অত্যাচার করে. তখনি ভাগ্যের আদেশে আমার মতো ভগবানের চাবুকের জন্ম হয় অত্যাচারীকে শাস্তি দেবার জন্যে।" (মুন্‌তাখামে হকিকি দর মুকাফাতে আয়মলে আনহ চুন মন্‌ জালিমির মিগুমার।)[১৩০]

সিয়ার-এর রচনাকাল বান্দার বিদ্রোহের অনেক পরে। সমসাময়িক ইতিহাসজ্ঞ মহম্মদ শফি তেহেরা নির রচনায় বা ইংরেজ দূত সুরমানের চিঠিপত্রে এই জাতীয় ঘটনার কোনো উল্লেখ নেই। উপরিউক্ত ঘটনা দুটি সম্ভবত ঐতিহাসিক তথ্য নয়। কিন্তু বান্দার বিদ্রোহ সম্পর্কে এই কল্পকাহিনীগুলি লৌকিক ধারণার পরিবাহী। সেখানে বান্দাকে সাধারণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতিভূ হিসেবেই দেখানো হয়েছে। কোনো ধর্মীয় বিদ্বেষের ছোঁয়া সেই লৌকিক চেতনায় কাজ করেনি। লৌকিক চেতনায় বান্দা নিছক ধর্মীয় নেতা নন, বরং প্রতিবাদী আন্দোলনের নায়ক।

আবার লক্ষণীয় যে, লৌকিক ধারণার বাইরে বান্দা নিন্দার পাত্র। গোঁড়া শিখদের কাছে বান্দার গণমুখী আন্দোলন বা ব্যবহার গৃহীত হয়নি। শিখ সাহিত্যের একটি ধারা অনুযায়ী বান্দা ভ্রাম্যমাণ যোগী ছিলেন বলে শিখদের সব আচরণ মানেন নি। তিনি সুন্দরী নারী বিবাহ করেছিলেন। শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠিত নায়কদের তিনি যথেষ্ট সম্মান দেখাতেন না এবং গুরুগোবিন্দের স্ত্রীর কথা অমান্য করেছিলেন। তাঁর শোচনীয় মৃত্যু তাঁর ঔদ্ধত্যের শাস্তি মাত্র। আসলে বান্দার আন্দোলন সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। তাই শিখ

ধর্মের রক্ষণশীল ঐতিহ্যে বান্দা অশ্রদ্ধেয় পুরুষ।[১৩১]

আরো লক্ষণীয় যে, আন্দোলনের একটি পর্যায়ে বহু সময়েই এই জাতীয় ধর্মবিরোধ কোনো কাজ করে না—আন্দোলন চালাবার বা আন্দোলন দমনের খাতিরে পুরনো শত্রু আজকের মিত্র হয়। যেমন, আওরঙ্গজেবের আমলে যিনি সবচেয়ে বেশি মসজিদ ধ্বংস করেছিলেন, তিনি হলেন রাজপুত সেনানায়ক ভীম সিংহ। তিনি একাই আহমেদাবাদের বিখ্যাত মসজিদ সমেত সাকুল্যে ৩০০টি মসজিদ ভাঙেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ভীম সিংহ আবার নিষ্ঠাভরে আওরঙ্গজেবের হয়ে মারাঠাদের দমন করতে যান এবং আওরঙ্গজেব তাঁকে বিনা আপত্তিতে ৩-৪ হাজার মনসব প্রদান করেন এবং সমতুল্য ওয়াতন জায়গিরও দেন। তাঁর মসজিদ ধ্বংসের কার্যকলাপকে আওরঙ্গজেব উপেক্ষা করেছিলেন, কারণ মারাঠা আন্দোলন দমন করা, ইসলাম ধর্ম প্রচারের চাইতে আওরঙ্গজেবের কাছে অনেক জরুরি ছিল।[১৩২]

আবার, বান্দা সরহিন্দ শহরের মুসলিম মোল্লা ও বড়লোকদের সমূলে বিনষ্ট করলেও তার কর্তৃত্বাধীন এলাকায় মুসলিমরা নির্বিঘ্নে নমাজ পড়ত। মুখলিসপুরে প্রচুর মুসলিম সাধারণ লোক ছিল এবং সবাইকে চটানো বা শত্রু করা বান্দার পক্ষে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়নি। আবার, আখবারাৎ-এর সাক্ষ্য অনুযায়ী বান্দার সপক্ষে ৫ হাজার মুসলিম সৈন্য লড়াই করে।[১৩৩] সুতরাং ধর্মীয় উন্মাদনা বা বিদ্বেষের ভূমিকা কোনো সময় গ্রাহ্য করে নিয়েও আমরা একে বিশেষ পরিবেশ-জাত বলে বিচার করব। বহু সময়েই, কি লৌকিক চেতনায় বা কি বিভিন্ন নীতির প্রশ্নে, ধর্মীয় বিদ্বেষের ভূমিকা অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কাছে নগণ্য হয়ে গেছে। সংনামিরা মসজিদ ধ্বংস করেও গোঁড়া ব্রাহ্মণ ঈশ্বরদাস নাগরের ঘৃণার পাত্র ছিল, কারণ তাদের বিদ্রোহ ছিল মূলত সমাজের নিচুতলার লোকেদের সমর্থনপুষ্ট। তাই, ধর্মীয় বিদ্বেষের ভূমিকা কিছু থাকলেও তা নগণ্য। মূল ঝোঁকটা ছিল শ্রেণীচেতনা বা সংহতির ক্ষেত্রে।

ইসলাম ধর্মমতের আওতাতেও প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলন এবং সশস্ত্র গণ-বিদ্রোহের মধ্যে গাঁটছড়া আমরা দেখতে পাই। রোশনিয়া আন্দোলন ও দাসি কুমির বিদ্রোহের কথা মনে করা যেতে পারে। এই দুটি আন্দোলনই পীরের উদ্ভবের সঙ্গে জড়িত। দুটিতেই নিম্নবর্ণ ও উপজাতির অংশগ্রহণই বেশি। রোশনিয়া আন্দোলনের নায়করা শেষে মুঘল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে গেলেন এবং এই আন্দোলনের বিশেষ কোনো অস্তিত্ব রইল না। ইসলাম ধর্মে এই জাতীয় পীর-কেন্দ্রিক মাহদি আন্দোলনের বৈচিত্র্য সম্পর্কে এঙ্গেলসের কথা বোধহয় স্মর্তব্য। খ্রীস্টধর্মের প্রতিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেছেন যে, এই মাহদি আন্দোলনগুলো মূলত উপজাতি ভিত্তিক—যেখানে স্থায়ী ধর্মমতগুলোর ভিত্তি কৃষ্টিসম্পন্ন উন্নত শহরগুলো। এই উপজাতিগুলো

তাদের দারিদ্র্যের সঙ্গে সমতা রেখে স্থায়ী ধর্মমতের বহিরঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তাদের উৎপত্তিও হয় অর্থনৈতিক কারণে। কিন্তু তারা পুরনো ধর্মমতের অর্থনৈতিক শর্তগুলোকে অক্ষুণ্ণ রাখে; ফলে, কিছুদিনের মধ্যে উপজাতি ও প্রতিবাদী ধর্মমতের নায়করা জয় বা পরাজয়ের মাধ্যমে পুরনো কাঠামোর অংশীদার হয়। কিন্তু খ্রীস্টান মরমিয়া প্রতিবাদী ধর্মমতে পুরনো পিছিয়ে-পড়া অর্থনৈতিক কাঠামোকেও সংহতরূপে আঘাত করা হয় এবং তার ফলে নতুন এক সমাজের বার্তা পাওয়া যায়।[১৩৪]

রোশনিয়া আন্দোলনের গতি-প্রকৃতিতে এঙ্গেলস-এর বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়। এর একটা কারণ বোধহয়, ঐতিহাসিক বিকাশের দিক থেকে উপজাতিরা কৃষিভিত্তিক নগরসভ্যতা থেকে পিছিয়ে থাকা উৎপাদন ব্যবস্থার জগতে বাস করে। ফলে, সেই বস্তুভিত্তি থেকে প্রতিবাদ করলেও তাদের উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার অঙ্গীভূত কোনো-না কোনো সময় থেকেই হয়। উপজাতিদের সঙ্গে বর্ণব্যবস্থা এবং কৃষি-সমাজের দ্বন্দ্ব এশিয়ার ইতিহাসে নতুন নয় এবং এই দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্য ইসলামিক প্রতিবাদী ধর্মমতকে বিশেষ রূপ দিয়েছে। এই বিষয়ে বর্তমান পর্যায়ে জানা তথ্য সুপ্রচুর নয়। রোশনিয়া আন্দোলনের হঠাৎ অবসান ও আন্দোলনের নায়কদের পূর্ণভাবে আগুয়ান মুঘল রাষ্ট্র-কাঠামোয় অংশগ্রহণের তথ্যই উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে মাত্র।

খ. কৃষক বিদ্রোহে যাদুবিদ্যা

আরেকটি বিষয় এই ধর্মীয় উন্মাদনায় প্রভাবিত কৃষক-বিদ্রোহগুলিতে সময় সময় দেখা যায়। তা হলো যাদুবিদ্যার ভূমিকা। কি হিন্দু কি মুসলিম ধর্মে, লৌকিক ক্ষেত্রে এই যাদুবিদ্যা বা অতিলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস এক স্বীকৃত সত্য। হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে তথ্যের অভাব নেই। এমনকি প্রাচীন অথর্ববেদ এই যাদুবিদ্যার ঐতিহ্যবাহী। কিন্তু ইসলাম ধর্মের লৌকিকতার ক্ষেত্রেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। পাঞ্জাবের প্রসঙ্গে লিখিত মহম্মদ খাউসের 'জাওয়াহির-ই-খামসা' ও বাংলা দেশে 'শেক শুভোদয়া'র মতো পীর-সাহিত্যই এর যথেষ্ট প্রমাণ। কৃষি-সমাজে নিয়ত প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে যুদ্ধরত মানুষের কাছে বিশ্বাস ও দৈব-শক্তির ওপর নির্ভর করে বর্তমান প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করার ভরসা তার চেতনার অঙ্গীভূত রূপ এবং তা বহুসময় তাকে শেষ আশার কথা শোনায়। এই জাতীয় চেতনা অবশ্যই এক ধরনের কুসংস্কার, কিন্তু যে কোনো সংস্কারের পেছনেও একটি সামাজিক পরিমণ্ডল কাজ করে, তাকে বোঝা দরকার।

এই ব্যাপক আলোচনার দিকে না গিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা দেখি যে, সশস্ত্র প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যাদুবিদ্যার ধারণা বহু সময়ই দুই পক্ষকে আচ্ছন্ন

করেছে। খুস্তাঘাটে সাফল্য অর্জনকারী কৃষক-সৈন্যদের এক যাদুবিদ্যার অধিকারী বলে মির্জা নাথন মনে করেছেন। জালাল তব্রিজি ও অন্যান্য মুঘল কর্মচারিদের মৃত্যুর পেছনে যাদুবিদ্যা কাজ করেছে বলে বলা হয়েছে। মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে অনেক সময় মাতিয়ারা লড়াই করেছে এই ভেবে যে, মুঘল সৈন্যের অস্ত্র তাদের ধর্মগুরুর প্রভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে। সৎনামিদের মধ্যেও নাকি এরকম বিশ্বাস ছড়িয়েছিল যে, একজন যাদুকরীর প্রভাবে মুঘল অস্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং একজনের মৃত্যু হলে সেই জায়গায় আরো ৮০ জনের জন্ম হবে।

ঈশ্বরদাস নাগরের এই সাক্ষ্যকে খাফি খানও সমর্থন করেন। খাফি খান লিখেছেন, একথা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হতো (আজ অনকে শহরৎ তামাম ইয়াফতে) যে—সৎনামিদের উপর তরোয়াল, তীর বা গোলার কোনো প্রভাব নেই, অথচ তাদের অস্ত্রাঘাতে রাজকীয় সৈন্যের দুই-তিনজন মারা যাবে। যাদুঘোড়ার (অসপে জাদু) পিঠে উপবিষ্ট মহিলার কথাও ছড়িয়ে পড়েছিল। মুঘল সৈন্যবাহিনীও তাদের মোকাবিলা প্রথমে করতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত আলমগির 'জিন্দাপীর' নিজের হাতে সৈন্যবাহিনীর নিশানে পাল্টা তুকতাকের চিহ্ন লিখে দিলেন—যাতে করে সৎনামিদের যাদুবিদ্যা ব্যর্থ হয়ে যায়। অনুরূপ ঘটনা বান্দার নেতৃত্বে শিখ-বিদ্রোহের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। লোহাগড়ে শিখদের প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও এই বিশ্বাস কাজ করেছে যে, বান্দার যাদুর প্রভাবে গোলা দিকভ্রান্ত হবে এবং মুঘল অস্ত্র ভোঁতা হয়ে যাবে। বান্দা নাকি এতবড় যাদুকর যে, তিনি বাছুরকেও কথা বলাতে পারেন। এবং শিখ-সাহিত্যের একটি ধারা অনুযায়ী বান্দা মারা যাননি, তিনি যাদুবলে পালিয়ে যান; সময় হলে আবার ফিরে আসবেন। এই জাতীয় বিশ্বাস শিখদের মরণপণ যুদ্ধ করতে প্রণোদিত করেছিল।

এখানে মনে হয় দুটো জিনিস কাজ করেছে। বান্দার নেতৃত্বে বা সৎনামি বিদ্রোহে শক্তিশালী মুঘলসৈন্যের প্রাথমিক পরাজয় কৃষকদের কাছে বিরল অভিজ্ঞতা। তাই, এই বিজয়কে তারা নিজেদের নিত্য নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করতে পারে না। মুঘলবাহিনী একদিক থেকে কৃষকসমাজ থেকেই আহরিত লোকদের নিয়েই সংগঠিত হয়েছে। ফলে, তাদের কাছেও বিদ্রোহী কৃষকসৈন্যের জয় অন্য এক ধরনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ফলে, এইসব বিদ্রোহে সাফল্যের ব্যাখ্যা কৃষকের লৌকিক অভিজ্ঞতার বাইরে থেকে যায়। তারা অতিলৌকিক ক্ষমতার প্রেক্ষাপটে এই জয়লাভগুলোকে ব্যাখ্যা করে। এখানে যেন চেনা জগৎ উল্টে গেছে; এতদিন ধরে যে সামাজিক নিয়ম চলছিল, তা সম্পূর্ণ উল্টোদিকে মোড় নিয়েছে। ফলে, সাধারণ চেতনার স্তরে এরকম সাফল্য অলৌকিক মনে হয়। এমনকি বিশ শতকের তৃতীয় পাদে চীনের কম্যুনিস্ট সেনানায়ক চু-তে চীনের কিছু কৃষকদের কাছে অলৌকিক শক্তির

অধিকারী বলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে অনুরূপ অন্যান্য বিদ্রোহেও এর ভূরিভূরি উদাহরণ পাওয়া যাবে। এই বীরেরা তাই মরেন না। এঁদের অমর হয়ে বেঁচে থাকার ঐতিহ্য নিপীড়িত কৃষকদের মনে আশা জোগায়, নতুন বিদ্রোহের ক্ষেত্রে তাঁরা আবার নতুন নামে ফিরে আসেন।

অন্যদিকে এই অলৌকিক বিশ্বাস পিছিয়ে থাকা সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নিপীড়িত কৃষক-জনতার সশস্ত্র প্রতিরোধে বিস্ফোরণের মতো কাজ করে। শক্তিশালী ও চিরজয়ী মুঘল বাহিনীর সামরিক শক্তির মোকাবিলা করতে গেলে এতদিনকার শোষিত নিপীড়িত এবং নানাভাবে দুর্বল কৃষক সৈন্যবাহিনীকে শক্তি জোগায়—এই যাদুবিদ্যা বা লৌকিক সংস্কারজাত বিশ্বাস। তাদের চেতনায় এই যাদুবিদ্যাই এই ধারণা এনে দেয় যে তারা অজেয়। মুঘল সামরিক শক্তির তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে মাতিয়া, সৎনামি ও শিখদের তীব্র প্রতিরোধ এবং শত প্রলোভন ও অত্যাচারের মধ্যে নিজের বিশ্বাসে ও আদর্শে অটল থাকার কথা সরকারি ইতিহাসজ্ঞরাও স্বীকার করেছেন। কৃষক-চেতনায় এই আদর্শ ও বিশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এই যাদুবিদ্যা ও লৌকিক সংস্কার। এর ওপর ভিত্তি করেই তারা আপাত বাস্তবকে অস্বীকার করে, মোকাবিলা করে, তাকে বদলাতে চায়। তাদের সবচেয়ে বড়শক্তি হচ্ছে গুরুর ক্ষমতায় তাদের অগাধ আস্থা, যার কাছে মুঘল-ই-আজমের সকল শক্তি তুচ্ছ হয়ে যায়। অবশ্য এই প্রশ্নাতীত আনুগত্য বা বিশ্বাস একদিক দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক স্তরভিত্তিক সামাজিক মূল্যবোধেরই প্রতিফলন। রাজা বা সম্রাটকে মানার পরিবর্তে গুরু বা পীরকে মানা হয়। সেই 'সাচ্চা বাদশার' প্রতিভূ হয়। এবং এই চেতনা নিয়ে বিদ্রোহ যদি সফলও হয় তা জন্ম দেয় আরেক সামন্ততন্ত্রের। বান্দা নিজে রাজকীয় উপাধি নেন ও ক্রিয়াকলাপ শুরু করেন। ফলে, তদ্‌খালসা কাহন সিং ও সিরি সিং-এর নেতৃত্বে বেরিয়ে যায়। সুতরাং এই জাতীয় যাদু-বিদ্যায় আস্থাশীল নেতৃত্ব—সাবিক সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা, পরিবেশের ও অর্থনীতিরই ফল।

গ. বিদ্রোহে গুজব

এই লৌকিক সংস্কার বা ধ্যানধারণা তাই রাজকীয় ধ্যানধারণায় প্রতিবাদী রূপে কাজ করে, যদিও ঐ চেতনার ভিত্তিমূলে পাল্টা অর্থনৈতিক শক্তির বিকাশ না থাকলে তা শেষ পর্যন্ত অস্পষ্ট ও কল্পলোকের কুয়াশায় আচ্ছন্ন থেকে যায়। সেইরকম সংবাদ আদান-প্রদান বা লৌকিক চেতনা প্রচারের ক্ষেত্রে গুজব দারুণ কাজ করে। যে কোনো কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের মতো মুঘলরাষ্ট্রও সঠিক সংবাদ সরবরাহের ওপর গুরুত্ব আরোপ করত। খুফিয়ানবিশ, ওয়াকাইনবিশেরা মুঘল সাম্রাজ্যের চারপাশে ছড়িয়ে থাকত এবং নিয়মিত কেন্দ্রে সঠিক খবর পাঠাবার

দায়িত্ব বহন করত। সাধারণ লোকেদের হাতে এইরকম কোনো সংগঠন ছিল না। কিন্তু গুজব লোকেদের মুখে মুখে ছড়াত। সৎনামির মধ্যে যাদুকরীর আবির্ভাব বা বান্দার অলৌকিক ক্ষমতা লোকের মুখে মুখেই ছড়িয়েছিল। দারা বা সুজার আগমনের কথা নিয়ে লোকেরা মিথ্যে জল্পনা-কল্পনা করত এবং তা নিয়ে ক্ষুদে বিদ্রোহও দেখা গেছে। আসলে অনেক সময়ই গুজবগুলো জনগণের সুপ্ত ইচ্ছা বা বাসনার পরিচয় এবং গুজবের ওপর রাজকীয় কর্তৃত্বের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ফলে দ্রুত এগুলো জনগণের ইচ্ছাগুলোকে রূপ দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ও বিক্ষোভের আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে।

অবশ্যই গুজবের নানা চরিত্র আছে। মানুচ্চি বা বার্নিয়েরের রচনায় আমরা যেসব বাজারি খোসগল্প বা গুজবের চরিত্র পাই, তার সঙ্গে কৃষক বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত নায়কের সম্বন্ধে গল্পের ফারাক আছে। বাজারের খোসগল্পে অধিষ্ঠিত মুঘল সম্রাটের বিশ্বাসঘাতকতা, নিষ্ঠুরতা বা যৌনাচার প্রাধান্য পেয়েছে। মাঝে মাঝে হয়তো রোমান্সের ছোঁয়া লেগেছে। মোট ছবিটা খুব প্রীতিপদ নয়। বিপরীত দিকে, কৃষক-বিদ্রোহের নেতারা অলৌকিক শক্তিধর। ফলে আবার লৌকিক চেতনার স্তর রাজকীয় ইতিহাস থেকে আলাদা। রাজকীয় ইতিহাসের মহিমময় সম্রাটরা লৌকিক চেতনায় নিন্দনীয় ও উপহাসের পাত্র হন। রাজকীয় ইতিহাসের নারকীয় বিদ্রোহীরা লৌকিক চেতনায় হন বীর ও নিন্দনীয় পুরুষ। এখানে ঐতিহাসিক তথ্যের যথার্থতা বিচার একদিক থেকে অবান্তর, কারণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে দুটি বিপরীত চেতনার স্তর আছে, এবং সেই স্তরে ধ্যান-ধারণা পরস্পরের ক্ষেত্রে একেবারে উল্টো। এদিক থেকে বাজারে প্রচলিত লৌকিক গালগল্প বা গুজব ইতিহাসের অন্য যে কোনো পাথুরে তথ্যের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা মানুচ্চির রচনাতে এই দুটি প্রক্রিয়ারই আভাস পাই। এক জায়গায় মানুচ্চি মুঘল রাষ্ট্র-কাঠামোয় গুপ্তচর ও সংবাদ সংগ্রহের গুরুত্বের কথা স্পষ্ট-ভাবেই বলেছেন। তাঁর ভাষায়—"রাজত্বশাসনের সবচেয়ে ভালো অস্ত্র, রাজাদের কাছে হলো নির্ভরযোগ্য গুপ্তচর।...যথার্থভাবে একথা বলা যায় যে, অন্য কোনো রাষ্ট্রের চাইতে রাজ্যে কি হচ্ছে তা জানবার জন্যে দক্ষ লোকদের সাহায্য পাওয়া থেকে মুঘলরাষ্ট্র পিছিয়ে নেই।...তাঁর সমস্ত রাজত্বকালে আওরঙ্গজেবের এমন দক্ষ গুপ্তচর ছিল যে তারা মানুষের চিন্তাভাবনা পর্যন্ত জানত। তাঁর রাজত্বে সর্বোপরি শহর দিল্লিতে তাঁর অজ্ঞাতসারে কোথাও কিছু ঘটতে পারত না।"

ঠিক এর বিপরীত দিকে আগ্রার এক ফৌজদারের কার্পণ্যের বিরুদ্ধে জনগণের গল্প নিয়ে তিনি স্পষ্টই বলেছেন: "এখানকার জনগণ নানা ধরনের বিদ্রূপ রচনায় ভাষার ক্ষেত্রে লাগামছাড়া হয়ে যায়।"[১৩৫]

আধুনিক আরেকটি গবেষণায় দেখি যে, আখবারাৎ বা খাফি খানের বর্ণনায় পাপ রায় জঘন্য ডাকাত। কিন্তু পাপ রায়কে কেন্দ্র করে তেলেগু ভাষায় রচিত গাথায় পাপ রায়ের চরিত্রায়ণ ভিন্ন। সেখানে সে নিষ্ঠুর, কিন্তু বীর ও অসম সাহসিক কার্যে নিয়োজিত, তার জন্ম নীচকুলে হলেও সে রাজোচিত গুণের অধিকারী।[১৩৬]

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, বহুসময় এই কৃষক-বিদ্রোহে মুঘল রাজবংশের লোকদের নাম করেই দাবিদাররা নেতৃত্ব দিত। কোলিদের মধ্যে বা মাতিয়াদের মধ্যে এরকম নিদর্শন আমরা দেখেছি। তবে এ নিদর্শন অন্যক্ষেত্রেও আদৌ বিরল নয়।[১৩৭] অর্থাৎ তখন বহু জায়গায় কৃষক-মানসিকতায় অত্যাচারের পরিবর্তনের অর্থ রাজাবদল, কাঠামোর পরিবর্তন নয়। মুঘল রাজতন্ত্র এদিক থেকে গোটা কৃষক-মানসিকতায় যে গভীর ছাপ ফেলেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বহুদিন বাদে সিপাহি বিদ্রোহের সময়। তখন মুঘল বাদশাহের নাম করেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় কৃষক লড়েছিল।

ঘ. কৃষক বিদ্রোহে দণ্ড

আবার, নানা ধরনের কৃষক-বিদ্রোহের প্রতি মুঘল রাষ্ট্রনীতির মনোভাবও নানা ধরনের ছিল। সাধারণ অর্থে কৃষক-বিদ্রোহ দমনে যে নীতি অবলম্বন করা হতো তার বর্ণনা মানুচ্চি দিয়েছেন। তিনি লিখছেন: "যদি গ্রামবাসীরা পরাস্ত হতো, তাহলে যাদেরই পাওয়া যেত তাদেরই মেরে ফেলা হতো এবং তাদের বউ ছেলে মেয়ে ও গোরু নিয়ে যাওয়া হতো। সুন্দরী মেয়েদের বাদশাহের হারেমে পাঠানো হতো এবং বাদবাকিদের ফৌজদার প্রভৃতি কর্মচারিরা ভোগ করত।"[১৩৮]

বিদ্রোহ দমনের জন্যে এজাতীয় অত্যাচারের বিক্ষিপ্ত উদাহরণ ছড়িয়ে আছে প্রচুর। সম্রাট আকবর নিজে আথগড় গ্রামের অবাধ্য কৃষকদের ব্যাপকভাবে হত্যা করেন এবং তারা যখন ঘরে আশ্রয় নেয় তখন বাদশাহের আদেশ অনুযায়ী (বে মৌজিবে হুকামে) ঘরের চালা (সকফে খনে) তুলে ফেলা হয় এবং ভেতরে আগুন (আতশ) ফেলে দেওয়া হয়। ন্যায়পরায়ণ বলে খ্যাত জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালেও অনুরূপ ঘটনার নিদর্শন আছে।[১৩৯] বিদ্রোহী জমিদার পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া ও অনুসন্ধানকারী দলের নায়ককে হত্যা করার জন্যে গ্রামবাসীদের মেরে ফেলা হয়। তারপর জাহাঙ্গিরের নিজের ভাষায়: "এদের স্ত্রী ও মেয়েদের বন্দী করা হয়। (জনান ওয়া দখতরানে আনহ ব বন্দ গেরেফতার মিগারদান্দ)। গোটা গ্রামে 'এমনভাবে' আগুন লাগানো হয় যে ভস্মস্তূপ (খাকিস্তার) ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না। ওই অঞ্চলে বসতির (আবাদানি) কোনো চিহ্নই থাকল না।"[১৪০] আবার, বান্দার ও তার অনুগামীদের ওপর

নৃশংস অত্যাচারের তুলনা নেই। জন সুরমানের ভাষায়: "তারা বাবার সামনেই ছেলেকে ছিন্নভিন্ন করল এবং মাংসগুলো তার মুখে ফেলে দিল। পরে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরো-টুকরো করে কাটল।"[১৪১]

অনেক সময় যদি জমিদাররা কৃষক-বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতেন, আন্দোলন যদি উচ্চতর শ্রেণীর কিছু সুবিধে আদায়ের জন্যে হতো, তখন মুঘলরাষ্ট্র বিপাকে পড়লে অপেক্ষাকৃত নরম-নীতি নিত। শিখ-বিদ্রোহে গুরুগোবিন্দের প্রতি মুঘলদের মনোভাব এক্ষেত্রে বিচার্য। বৈজংপুরি জমিদারের সমর্থক কৃষকদের ধ্বংস করলেও জাহাঙ্গির পরে জমিদারকে ক্ষমা করে দেন। মাহাদজী সিন্ধিয়াও প্রথমে নৃশংস রোহিলা সর্দার গুলাম কাদিরকে তোয়াজ করেছিলেন। শাহ আলমের নির্দেশে তিনি তাকে হত্যা করতে বাধ্য হন। কিন্তু যদি আন্দোলন বিশুদ্ধ নিম্নবর্ণ ও কৃষকদের বিদ্রোহ হতো—তবে তার কোনো ক্ষমা ছিল না। বাহাদুর শাহের মতো আপোষপন্থী সম্রাট বান্দাকে বন্দী করা সম্ভব হয়নি বলে মুনিম খানের মুখদর্শন করেন নি। রুকাৎ-ই-আমিনউদ্দৌলা অনুযায়ী তিনি বেদিন (হিন্দু) ও 'নানক পরসত'দের মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন এবং দাড়িওয়ালা শিখদের সমূলে উচ্ছেদে ব্রতী হন। কারণ তখন শিখ-বিদ্রোহের চরিত্র পাল্টে গেছে। কৃষক-বিদ্রোহের ক্ষেত্রেও কৃষকদের নিজস্ব প্রতিশোধ স্পৃহা কম ছিল না। বাকর খানের প্রতি খুস্তাঘাটের রায়তদের ব্যবহার একটি নিদর্শন। বান্দার নেতৃত্বে সব হিন্দু শহরে ধনী সম্প্রদায়ের ওপর কৃষক সৈন্যের আক্রমণ, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও বিপুল হত্যাকাণ্ড তীব্র বিদ্বেষের সঞ্চার করেছিল। সরহিন্দের ফৌজদার ৮০ বছরের বৃদ্ধ ওয়াজির খানের মৃতদেহ শিখরা গাছের সঙ্গে লটকে দিয়েছিল। কথিত আছে, শিশুদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। ধনীদের বাড়ি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। মুসলিম ইতিহাসবিদদের রচনায় এইসব ঘটনা 'কোতলগরাহি' বলে উল্লিখিত হয়েছে।

সিন্ধু প্রদেশে মক্কাচা উপজাতিরা হিন্দু ও মুসলিম নির্বিশেষে তহশিলদারদের হত্যা করে, তাদের মৃতদেহ কেল্লার কুয়োয় ফেলে দেয় ও পরে সেগুলোকে মাটির সঙ্গে সমান করে দেয়। তার প্রত্যুত্তর মুঘল রাষ্ট্রশক্তিও দিয়েছিল। বিদ্রোহের পরের বছরে উপজাতিদের নেতাদের বন্দী করে কয়েকজনকে হাতির পায়ের তলায় ফেলে হত্যা করা হয়। (ওয়া দর সাল দিগর মুকদ্দমান কাকার রা মুকয়িদ ওয়া মহবুস গারদানিদে ইয়েক দু কস রা জিরে পয়ি ফিল হালাক কারদান্দ।)[১৪২]

রাষ্ট্রের সঙ্গে কৃষক-বিদ্রোহের সংঘাত হিংসা ও প্রতিহিংসার স্থান প্রসঙ্গে সুন্দর বর্ণনা মানুচ্চির রচনায় আছে। বিদ্রোহীদের প্রতি মুঘলদের শাস্তি দেবার পদ্ধতির নিজস্ব অভিজ্ঞতা মানুচ্চি এইভাবে বর্ণনা করেছেন। "প্রত্যেক সময় একজন সেনাপতি যখন বিজয়ী হয় তখনই সাফল্যের নিদর্শনরূপে আগ্রার

শাহী চবুতরায় গ্রামবাসীদের কাটা মাথা সম্পদ হিসেবে পাঠানো হতো এবং লোকেদের সামনে প্রদর্শন করা হতো। চব্বিশ-ঘণ্টা পরে এই মাথাগুলো শাহী সড়কে পাঠানো হতো। সেগুলো হয় গাছের সঙ্গে ঝোলানো হতো, অথবা এইজন্য নির্মিত স্তম্ভের খোপে রেখে দেওয়া হতো। একটা স্তম্ভে একশোটা (কাটা) মাথা রাখা যেত। আমি শহরে অনেক সময় গ্রামবাসীদের মাথার স্তূপ দেখেছি। এক সময় আমি দশহাজার মাথার স্তূপও দেখেছি। কামানো মাথা ও প্রায়ই রক্তিম গোঁফ দেখে তাদের চেনা যেত। মুঘলরাষ্ট্রে যে ৩৪ বছর আমি বাস করেছি, তখন আমাকে প্রায়ই আগ্রা থেকে দিল্লি যেতে হয়েছে। (প্রত্যেকবার) আমি পায়ের ধারে নতুন মাথা দেখেছি···প্রায়ই রাহীরা মৃতদেহের উৎকট গন্ধ থেকে বাঁচার আশায় নাক বন্ধ করত ও জীবনের তাড়নায় দ্রুত চলে যেত।"[১৪৩]

মুঘলদের শাস্তির প্রথাও লক্ষণীয়। বিদ্রোহীদের শাস্তি জনসমক্ষে দেখানো হতো। বিদ্রোহীদের শরীর ধ্বংস করা হতো। এর ফলে অন্যান্য বিদ্রোহীদের যাতে দমন করা যায়—এটাই ছিল উদ্দেশ্য। এছাড়া প্রত্যেকটি বিদ্রোহই কোনো-না কোনো ভাবে রাজকীয় কর্তৃত্বের অবমাননা। বিদ্রোহীকে শারীরিক-ভাবে ধ্বংস করে সেই কর্তৃত্বকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হতো। শাস্তির মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টি করার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। গোকলা জাঠের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন করে তাকে হত্যা করা হয়, কারণ তাহলে অন্য হাঙ্গামাকারীরা সতর্ক হবে। (বে দিগর ফিতান বরদাজান ইবরৎ গারদাদ।)" রাজারাম জাঠের মাথা 'চবুতরে কোতোয়ালিতে' ঝোলান হলো।[১৪৪] রোশনিয়া আফগানদের মৃতের মাথা নিয়ে স্তূপ করে মুঘলরা তাদের বিজয়বার্তা জাহাঙ্গিরের সময় ঘোষণা করেছিল। মধ্যযুগীয় শাস্তির মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব জাহিরের তাৎপর্য বিস্তারিত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

কিন্তু নিছক প্রতিহিংসা বা আক্রোশের মধ্য দিয়ে কৃষকদের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করা বোধহয় আংশিক। রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতা চরম শাস্তি দেওয়া। মনুসংহিতায় দণ্ডকে রাষ্ট্রশক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে। তাই যখন কৃষকরা সুযোগ পেয়েছে, তারা তখন অত্যাচারীকে নিজেদের মতো করে দণ্ড দিয়েছে। তারা রাষ্ট্র নির্ধারিত আইন ও ব্যবস্থার মাধ্যমে দণ্ড দেয় এবং এর মধ্যে নিয়ম আছে, একটি ঐতিহ্যও আছে। আবুল ফজলের বর্ণনায় বা ইনশা-ই-হরকারানে মুঘল ফৌজদারের লেখায় আমরা বিদ্রোহী কৃষকদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, পরিবারদের বন্দী করা ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার রীতি দেখেছি।

মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণু দিনগুলিতে হরিয়ানাতে রাজস্ব দিতে অনিচ্ছুক সোনেপাথ-রোহতাক ইত্যাদি গ্রামে নাজিবউদ্দৌলার ব্যবহার কিন্তু আকবর ও জাহাঙ্গিরের আমলের নীতিকে অক্ষরে অক্ষরে এদিক থেকে অনুসরণ করেছে।

কারণ মুঘলরাষ্ট্র তার শাস্তি দেওয়ার অধিকারকে, অন্য কোনো রাষ্ট্রের মতো, শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে থাকবে। বিপরীত দিকে কৃষক-আন্দোলন জঙ্গি, মারমুখী ও শ্রেণীবিদ্বিষ্ট হলেই নিজেরা এই অধিকার দাবি করবে এবং সাধ্যমতো প্রয়োগ করবে। অস্ফুট, পাল্টা রাষ্ট্রক্ষমতার বীজ তাই এই শাস্তিদানের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। নিছক প্রতিহিংসা এই ধরনের ব্যবহারকে ব্যাখ্যা করে না। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে : হরগোবিন্দের চিরশত্রু চান্দু হলেন রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান। তাঁকে সবার সামনে হাজির করা হচ্ছে এবং শহরের লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর গায়ে বিষ্ঠা, লোষ্ট্র নিক্ষেপ করেছিল ও গালিগালাজ দিয়েছিল। কানুনগো সুচানন্দের নাকে লৌহশলাকা বিদ্ধ করা হয়, রাস্তায় ঘোরানো হয় এবং সে সকলের কাছে প্রাণভিক্ষা করে। সবাই তাকে ক্রমানুসারে প্রহার করে এবং তার ফলেই সে মারা যায়। আবার, বহু সময় পরাজিত শত্রুকে হাতের কাছে না পেলে কৃষকরা পরিহাসের মাধ্যমে তার সামাজিক মর্যাদাকে আঘাত করে এবং সেভাবেই শাস্তি দেয়।

১৭৬৫ সনে রোহতাক ও ভিয়ানি গ্রামের কৃষকরা ১০ হাজার সৈন্য-সামন্তের ফৌজদার সীতারামকে হারিয়ে দেয়। তার ফলে সীতারামের ফেলে যাওয়া কামান, দাঁড়িপাল্লাতে চাপিয়ে 'রাজা সীতারামের' প্রতীক তৈরি করে এবং উল্লাস করতে থাকে। কারণ সীতারাম আসলে নাকি ধানবিক্রেতা মহাজন ছিল। এখানে আমরা বোধহয় আধুনিক কুশপুত্তলিকা দাহের মধ্যযুগীয় সংস্করণ পাই।

হিংসা বা প্রতিহিংসা তাই কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একদিক থেকে কৃষকদের কাছে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যে হিংসা ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না। দ্বিতীয়ত—দীর্ঘদিনের নিপীড়ন ও শোষণ ক্ষোভের অন্য কোনো বহিঃপ্রকাশের পথ খোলা রাখেনি। ফলে, ক্ষোভের প্রকাশ যখন হতো তখন তা হিংস্র আক্রোশের রূপ নিয়েই ফেটে পড়ত। তৃতীয়ত—শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে ন্যায়বিচারও শ্রেণীর দোহাই দেয়। তাই, জমিদার ও অন্যান্য সামন্তদের বিদ্রোহ ক্ষমা করা হলেও নিম্নবর্গের মানুষের বিদ্রোহকে ক্ষমা করা হয় না। তা কোনো-না কোনোভাবে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধে আঘাত হানে, কারণ তার ভিত্তিই হলো প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে, ভগবান ও ভক্তের মধ্যে প্রশ্নাতীত আনুগত্যে। এই আনুগত্যের ক্ষেত্রে কোনোরকম আপোষ চলে না, এর বিরুদ্ধে যারাই প্রশ্ন করবে তারাই ধ্বংস হবে।

৬. বিদ্রোহ ও ব্যবহারবিধি

আবার, কৃষক-বিদ্রোহে আচরণবিধি বা ভাষাও বদলে যায়। বিদ্রোহের সঙ্গে আচরণবিধির পরিবর্তন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বান্দা নাকি ফারসি ভাষার ব্যাকরণই বদলে দিয়েছিলেন এবং শব্দের অশুদ্ধ প্রয়োগকেই শুদ্ধ বলে চালিয়ে

ছিলেন। শিষ্ট সম্মানবোধক শব্দাবলীর পরিবর্তে অশিষ্ট শব্দ প্রয়োগের তিনি নির্দেশ দেন। আবার, এর মধ্যে পাল্টা ক্ষমতা জাহির করার ঝোঁক দেখা যায়। মুঘল রাজকীয় ভাষার ব্যাকরণের বিপরীত আরেক ব্যাকরণ চালু করাকে সমসাময়িক ইতিহাসবিদ অশিক্ষার চাইতে ঔদ্ধত্যের পরিচয় হিসেবেই মনে করেছিলেন। বান্দার অনুচরদের সামনে সম্পদশালীরা সারিবন্দী ও জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে থেকে খাজনা দিতেন, যেভাবে আগে ঐসব দরিদ্র কৃষকরা জমিদারদের খাজনা দিত। এখানেও খাজনা দেওয়ার ব্যবহারবিধি গরিবরা বড়লোকদের প্রতি প্রয়োগ করেছেন। দাতা ও গ্রহীতার ভূমিকা একেবারে পাল্টে গেছে। প্রচলিত সমাজে ব্যবহারবিধি ও কর্তৃত্বের ধারণা পাল্টানো হলো। এক্ষেত্রেও পাল্টা ক্ষমতা জাহির করার অভিলাষ দেখা যায়। ফলে, কৃষক বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকদের আচরণ ঠিক নিছক প্রতিহিংসা গ্রহণের পর্যায়ে সীমিত থাকে না, এবং পাল্টা 'রাজ' বা 'শাসন' কায়েমের পরিপ্রেক্ষিতেই সেগুলোকে বিচার করতে হবে।[১৪৫] মুঘল দলিলে বিদ্রোহী কৃষকের বহুল ব্যবহৃত প্রতিশব্দ হচ্ছে 'সর কশত'। এটা এক ধরনের ব্যবহারবিধির দ্যোতক। 'সর' অর্থ হচ্ছে 'মাথা' ও 'কশত' অর্থ হচ্ছে 'টানা'। অর্থাৎ যে কোনোদিন মাথা বাঁকায় না, টান করেই রাখে। রাজস্ব দেওয়ার সময় বা পদস্থ কর্মচারির কাছে নতশির হওয়াই সামন্ত সমাজের ব্যবহারবিধি। এই ব্যবহারবিধির ব্যতিক্রমই বিদ্রোহ। তাই এরকম আচরণ যারা করে, তারাই বিদ্রোহী। শাসকশ্রেণীর চোখেও তাই ব্যবহারবিধি পাল্টে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহও সমার্থক হয়ে যায়।[১৪৬]

মানুচ্চির বর্ণনায় দুটি ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা এখানে উল্লেখযোগ্য। আগ্রার জাঠ কৃষকরা আকবরের সমাধি আক্রমণ করে ব্যাপক লুঠতরাজ করে এবং আকবরের দেহাবশেষ খুঁড়ে বার করে জ্বালিয়ে দেয়। ফুতুহাতে এবং আখবারাতে ১৬৮৮ সনে জাঠদের দ্বারা সেকেন্দ্রার সমাধি ও শাহজাহানের সমাধির সন্নিকটস্থ গ্রামগুলিতে লুঠতরাজের কথা আছে, তবে সরাসরি আকবরের দেহাবশেষের অবমাননার কথা নেই। কিন্তু ফারসি লেখকদের রচনায় রাজানুকূল্যের জন্যে সীমাবদ্ধতা এবং মানুচ্চির রচনাতে পুনরুক্তি দেখে ঘটনাটিকে একেবারে অসম্ভব বলে বাতিল করা যায় না।

মানুচ্চি বলেন—"গ্রামবাসীরা তাদের প্রথম শত্রু আকবরের বিরুদ্ধে জীবিত অবস্থায় প্রতিশোধ নিতে পারেনি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে তারা তাঁর হাড়ের উপর শোধ নিয়েছিল।... অন্য সময়ে তারা কর প্রদান না করেই সন্তুষ্ট থাকত। এই সময় তারা তৈমুরলঙ্গের বংশধরদের প্রতি চরম অবমাননা প্রদর্শন করল। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুরে আওরঙ্গজেবের উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তারা তাঁর ক্ষমতা, নীতি বা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের পরোয়া করল না। শাসনকর্তা ও ফৌজদারের রাজস্বের দাবিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে তাদের অনেক

জমায়েৎ হয়ে সেই মহান সম্রাট আকবরের সমাধিতে যাত্রা করল। জীবিত অবস্থায় তাঁকে তারা কিছুই করতে পারেনি। অতএব তারা তাঁর কবরের উপর প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করল, তারা লুঠতরাজ শুরু করল।…দামী পাথর, সোনা ও রূপার পাত খুলে নিল এবং যা নিতে পারল না তা ধ্বংস করল। আকবরের হাড় খুঁড়ে বার করে নিয়ে তারা ক্রোধের সঙ্গে আগুনে ফেললো ও পুড়িয়ে দিল।"[১৪৭]

শিখ-বিদ্রোহেও আমরা সমাধির এরকম অবমাননার প্রমাণ পাই। তাই মানুচ্চি কৃষক-বিদ্রোহে কৃষকদের এই ব্যবহারকে কোনো অবাস্তব ঘটনা বলছেন না। এছাড়া বর্ণনার ভাষাটাও বিশ্বস্ত ও জীবন্ত। আসলে এইসব সমাধিগুলো সম্রাটের মহিমার দ্যোতক, উচ্চ সম্মানের প্রতীক। সমাধির আড়ম্বর রাজশক্তির গৌরব জাগিয়ে রাখে, সম্রাট মৃত হলেও তার শাসন-ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখে। মৃত সম্রাটের স্মৃতি জাইয়ে রেখে শাসকশ্রেণী সমাজের মানসিকতায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করে।

অপরপক্ষে নাম না-জানা অগুনতি কৃষকের কাছে মহিমময় সম্রাটের স্মৃতি হয়তো ঠিক বিপরীত ধারণা বহন করে। বিদ্রোহী কৃষকের চেতনায় সম্রাটের মহিমার সঙ্গে তাল দিয়ে চলে তার অত্যাচার। তার সমাধিগুলো সেই অত্যাচারেরই স্মৃতিস্তম্ভ। মানুচ্চির বর্ণনায় খুব স্পষ্ট যে, শুধুমাত্র অত্যধিক রাজস্বের দাবি নয়, লুঠতরাজ নয়, সমাধির ধনসম্পদ নয়,—আকবরের বিরুদ্ধে আত্যন্তিক ক্রোধও আগ্রার কৃষকদের উদ্দীপ্ত করে তাঁর সমাধি আক্রমণে। জ্ঞানত বা অজ্ঞানত এ আক্রমণ একটা প্রতীকী রূপ নেয়, কারণ মুঘল বংশের মহান সম্রাটের বিরাট সমাধি কৃষক-আক্রোশের শিকার হয়। সাধারণ লোকের চোখে মুঘল মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়। এই আক্রমণে, এই প্রতিশোধ স্পৃহায় যেন দুটি ইতিহাস চেতনা মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শাসকশ্রেণীর ইতিহাস চেতনা ও কৃষক-জনতার ইতিহাস চেতনা। মানুচ্চির বিবরণ যদি সত্যি হয়, তবে আমরা মুঘলযুগে দুটি বিপরীতমুখী চৈতন্যের সামাজিক উপস্থিতি পাই। এর বহিঃপ্রকাশ হয়তো অধিকাংশ সময়ই অস্ফুট, প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের আওতার বাইরেই বেশিরভাগ সময় থেকে গেছে।

আরেকটা দিকে মুঘল রাষ্ট্র-কাঠামোর চরিত্রের জন্যেই বোধহয় হিংসার ব্যবহার গোটা সমাজের সার্বিক চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করেছিল। সে চেতনার অংশীদার শাসক ও শোষক উভয়েই যদিও সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যহেতু উভয়ের আক্রোশের শিকার, স্বভাবতই পারস্পরিক অর্থে বিপরীতমুখী। মানুচ্চি আগ্রার কৃষক-বিদ্রোহ দমনে মুঘল ফৌজদার মুলতাফাৎ খানের গল্প কাহিনী বলেছেন। মনে রাখা দরকার যে, মাসির-ই-আলমগিরিতেও জাঠ কৃষক-বিদ্রোহ দমনে মুলতাফাৎ খানের ভূমিকা ও মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু মাসির-ই-আলমগিরি সংক্ষিপ্ত কাল ও ঘটনাপঞ্জির ধরনে লেখা, সেখানে বিস্তারিত বিবরণ কিছু নেই। তাই মানুচ্চির মূল কাহিনীর কাঠামো সত্য—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কাহিনীর বিস্তারে তার অন্য কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। ফলে এখানেও মানুচ্চির বর্ণনা সম্ভাব্যতার স্তরে সীমাবদ্ধ—এটা স্বীকার করতেই হবে।

তিনি লিখেছেন—"আওরঙ্গজেব দিল্লিতে প্রত্যাগমনের পর এইসব লোকেরা (আগ্রার কৃষকরা) বিদ্রোহী হলো এবং রাজস্ব পাঠাতে অস্বীকার করল। ১৬৮১ সনে আগ্রার ফৌজদার মুলতাফাৎ খান বিদ্রোহ দমনে প্রেরিত হলেন। যে গ্রামে গোঁয়াররা জমায়েৎ হয়ে নিজেদের প্রতিরক্ষা গড়ে তুলেছে সেখানে আসবার পর তিনি গ্রামের বয়োবৃদ্ধ ও প্রতিপত্তিশালী লোককে ডেকে পাঠালেন।… তিনি তাকে সানন্দে অভ্যর্থনা করলেন, বসতে দিলেন এবং খুব নম্রভাবে জানালেন যে তিনি একটি প্রাণীরও ক্ষতি করতে আসেন নি বা তাদের শত্রু বলে মনে করেন না, বরং তাদের তিনি পুত্র ও ভাই বলেই মনে করেন। কিন্তু তিনি বললেন রাজস্ব দিতেই হবে। সুতরাং জীবনের ঝুঁকি নেওয়া বা মৃত্যু বা দুর্ভাগ্য ডেকে আনার চাইতে শান্তিপূর্ণভাবে রাজস্ব দিয়ে দেওয়াই শ্রেয়।" মুলতাফাৎ খান গ্রামবৃদ্ধকে অনুরোধ করলেন যে, গ্রামবৃদ্ধ যদি সব গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে বিনা উপদ্রবে রাজস্ব দিয়ে দেয় তবে তিনি রাজদরবারে গ্রামবৃদ্ধের জন্যে অনেক তদবির করবেন। গ্রামবৃদ্ধটিও তাঁকে আশ্বাস দিল যে সে চেষ্টার ত্রুটি করবে না, তবে অজ্ঞাত গ্রামবাসীদের ব্যবহার সম্পর্কে কোনো নিশ্চয়তা নেই। পরে গ্রামে ফিরে গিয়ে "সে সমস্ত গ্রামবাসীদের উত্তেজিত করল এই বলে যে রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায় স্বীকৃতি দেওয়ার চাইতে যুদ্ধ করে মরাও ভালো। এই প্রাচীন নীতিকে সবাই যেন আঁকড়ে থাকে। রাজস্ব প্রদানের বিরুদ্ধে মরণপণ করে তারা সকলে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে এলো। এমন মরীয়া হয়ে তারা লড়ল যে, তারা মুলতাফাৎ খানের সেনাদের ধ্বংস করল ও খানকে বন্দী করল। তারা তাকে আপাদমস্তক জুতো পেটা করে ছেড়ে দিল এবং তাকে সরে পড়তে বলল। তারা তার জীবন নিল না, কারণ তারা আবিষ্কার করল যে, সে মেয়ে, সৈনিক নয়। এই ঘটনার কথা সম্রাটের কানে পৌঁছল এবং তিনি মুলতাফাৎ খানের কাছে একজন লোক দিয়ে বিষ পাঠালেন। কারণ সবার সামনে অসম্মানের বোঝা নিয়ে মরার চেয়ে লোকের অগোচরে সম্মানের সঙ্গে মরা অনেক শ্রেয়।"[১৪৮]

মনে রাখা ভালো যে মানুচ্চি অন্য জায়গাতেও বলেছেন, যে যত মুখ বুজে মার সহ্য করে কিন্তু রাজস্ব দেয় না, সে কৃষি সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি। আবার, অপর পক্ষে তারিখ-ই-শেরশাহির সাক্ষ্য অনুযায়ী রাজস্ব অনাদায়ের বিদ্রোহ দমনের সময় কোনো বোঝাপড়া করাটা শের শাহ্ আদৌ সঠিক বলে মনে করেন

নি। পরন্তু এই বোঝাপড়াকে তিনি 'অরাজকতার উৎস' বলেই বর্ণনা করেছেন। তাতে সেইসব দুষ্টবুদ্ধি ও ঠকবাজ' লোকেরা প্রশ্রয় লাভ করে।[১৪৯] এই পরিপ্রেক্ষিতে মাহুচ্চির ঘটনা বিদ্রোহের ব্যবহারবিধিকে চিত্রায়িত করে। সামন্ত সমাজে নিয়ন্ত্রণ সরাসরিভাবে রাজনৈতিক। কৃষক-বিদ্রোহে তার প্রকাশ হয়। সামরিক শক্তির দমন অভিযানে কৃষকরাও হিংসাত্মক প্রতিরোধ দ্বারাই সেই ক্ষমতাকে অস্বীকার করে। রাজস্ব প্রদান কৃষকদের এবং তাদের নেতা মুকদ্দম ও জমিদারদের কাছে কেবল অর্থনৈতিক শোষণই নয়, মুঘলরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও আধিপত্য স্বীকার করা। এই জন্যেই গ্রামবৃদ্ধ বিদ্রোহ করার পুরনো সম্মানিত প্রথার দোহাই পেড়ে গ্রামের জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেন। এই ঐতিহ্য বা প্রথার ওপর গুরুত্ব আর বিদ্রোহগুলিকে অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সীমায় আবদ্ধ রাখে না বরং তাকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে। দ্বিতীয়ত—গ্রামবাসীদের অভিজ্ঞতায় বিদ্রোহের প্রত্যুত্তরে মুঘল ফৌজদার সশস্ত্র অভিযান চালায়। বোঝাপড়া বা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান বিদ্রোহ চলাকালীন অবস্থার সাধারণ রীতি নয়। তাই মুলতাফাৎ খান তাদের চোখে হাস্যাস্পদ হয়, তার ব্যবহারকে তারা কাপুরুষতা মনে করে। কারণ, মুঘল কর্তৃপক্ষের বিদ্রোহ দমনে ব্যবহাররীতি সম্পর্কে তাদের নির্দিষ্ট ধারণা আছে। মুলতাফাৎ খানের ব্যবহার সেই ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না। সম্রাটের চোখেও মুলতাফাৎ খানের প্রতি বিদ্রোহীদের আচরণ চরম অবমাননাকর. মুঘল ওমরাহ শ্রেণীর সম্মানের প্রতি আঘাত বিশেষ। তাই তাকে শাসকশ্রেণীর চোখেও হেয় হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নির্দিষ্ট কাজের সঙ্গে জড়িত সম্মানবোধ সমাজের সর্বস্তরের চেতনায় মিশে থাকে, প্রত্যেকটি ব্যবহারবিধি নির্ধারিত থাকে। কৃষক-বিদ্রোহ দমনে নিষ্ঠুর দণ্ড প্রয়োগই রীতি। সেখানে মুলতাফাৎ খানের বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমঝোতার চেষ্টা শাসক বা শোষিত উভয়ের চোখেই উদ্ভট বলে মনে হয়, উভয়ের হাতেই তাকে নিগৃহীত হতে হয়।

মুঘল কৃষক-বিদ্রোহের ব্যবহারবিধি ও চৈতন্য নিয়ে এই আলোচনার তথ্য ভিত্তি যে বিস্তৃত নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু যে কোনো বিদ্রোহে কোনো-না কোনো সীমিত স্তরে চেতনার স্থান থাকে, যদিও সরকারি সাক্ষ্যে সেগুলো এড়িয়ে যায়। বিদ্রোহের কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ চলাকালীন বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবহার ও চেতনার জগৎ ইতিহাসবিদের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়— আলোচনার ক্ষেত্রে একথা স্বীকার করা হয়েছে মাত্র।

চ. কৃষক বিদ্রোহে লুঠতরাজ

মুঘলযুগের বিক্ষোভে লুণ্ঠন একটা স্থান অধিকার করেছিল। প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, আমাদের উৎস হলো সরকারি ইতিহাস। ফলে যে কোনো হাঙ্গামাকেই লুঠতরাজ বলে অভিহিত করা খুবই স্বাভাবিক। সরকারি ইতিহাসবিদের কাছে সব বিদ্রোহীই লুঠেরা। দ্বিতীয়ত—মুঘলযুগে সামাজিক প্রেক্ষাপটে অপরাধ ও দণ্ডবিধি এবং বিচারব্যবস্থা নিয়ে কোনো ব্যাপক গবেষণা হয়নি। তাই লুঠতরাজ নিয়ে বক্তব্য ভবিষ্যতের গবেষণার ইঙ্গিত হিসেবে লেখা হচ্ছে। মুঘলযুগে যে অপরাধের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হতো তা হলো রাহাজানি বা সার্থবাহদের সম্পদ লুণ্ঠন। বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার সঙ্গে সঙ্গে শাহী রাস্তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা ফৌজদারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আওরঙ্গজেবের আমলে খয়রাবাদের নবনিযুক্ত ফৌজদারকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে "তুমি প্রধান ও শাখা পথগুলিকে নিরাপদে রাখতে চেষ্টার ত্রুটি করবে না, যাতে পথযাত্রীরা স্বস্তিতে পথ চলতে পারে এবং তাদের জীবন ও সম্পত্তির কোনো ঝুঁকি না নিতে হয়।" আকবরনামায় বা তুজুকের সাক্ষ্যানুযায়ী গ্রাম ধ্বংস করার আগে সেইসব অধিবাসীদের বিরুদ্ধে রাজস্ব অনাদায়ের সঙ্গে ডাকাতির অভিযোগও আনা হতো। তাই মঘল কর্তৃত্ব ও গ্রামীণ সংঘর্ষের মধ্যে লুঠতরাজ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল।

একটা স্তরে লুণ্ঠনে জমিদাররা অংশগ্রহণ করত এবং তার পেছনে ফৌজদারদের সময়মতো সমর্থনও থাকত। স্থানীয় ক্ষমতাসীন গ্রামীণ কর্তৃত্বের আয়ের অন্য উৎস ছিল লুঠতরাজ করা। বায়েসওয়ার বা ভাদুরিয়া জমিদার গোষ্ঠীর লুঠের কথা ইনশা-ই-রোশনে কলাম, তুজুক-ই-জাহানগিরি অথবা বিভিন্ন আখবারাতে ছড়িয়ে আছে। মাসির-উল-উমারায় জাঠদের সম্পর্কে বলাই হয়েছে যে যদিচ জাঠ কোনো কৃষিকাজে নিয়োজিত, এবং তাদের এলাকা 'ঘনবসতিপূর্ণ এবং শক্তিশালী দুর্গ সমন্বিত" তাদের কাজই হলো "আগ্রা থেকে দিল্লির সীমান্ত পর্যন্ত চুরি ও ডাকাতি করা।"[১৫০] এই জাতীয় লুঠতরাজের সাংগঠনিক নেতৃত্ব বোধহয় জমিদাররা দিত এবং সেখানে বর্ণের ভূমিকাও থাকত। দ্বিতীয়ত—অষ্টাদশ শতকে উঠতি সামন্তশক্তিদের তুলনামূলক দুর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তি তাদের সামরিক ব্যবস্থায় লুঠেরাদের একটি স্থান নির্ধারিত করে দিয়েছিল। মারাঠা সামরিক ব্যবস্থায় শিলাদারি প্রথা ও পরে পিণ্ডারিদের উদ্ভবের পেছনে কারণ ছিল লুণ্ঠনের ভাগের মাধ্যমে সেনাবাহিনী পোষা। অন্যদিকে পাল পাট্টির মাধ্যমে তারা মারাঠা সেনাপতির আয়ও বাড়িয়ে দিত। জাঠ সৈন্যদের ও শিখদের মিসলদের পারস্পরিক লড়াইতে বেতনের পরিবর্তে দল-নায়করা অনুচরদের লুঠতরাজের অবাধ অধিকার দিত। ১৭৫১ সনের 'জাঠ গর্দি' এবং

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের আগে মারাঠাদের 'ভাও গর্দি' কুখ্যাত হয়ে আছে। কিন্তু এইসব লুঠতরাজের সঙ্গে কৃষক-বিদ্রোহের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। এই কাজ কায়েমি স্বার্থের শক্তিকে বৃদ্ধি করে মাত্র। এইসব সামন্ত নেতৃত্বের আয়ত্তাধীন আন্দোলন 'লুঠের' ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়।

মাতিয়া বিদ্রোহে লুণ্ঠনের কোনো প্রমাণ নেই। ঈশ্বরদাস নাগর সৎনামিদের লুঠতরাজের কথা উল্লেখ করেছেন। নারনুল শহরের মসজিদ ও কবরখানা তারা নাকি ধ্বংস করে। বান্দার শিখ বিদ্রোহের পেছনে শ্রেণীঘৃণা ও ধর্মীয় উন্মাদনা কাজ করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃষক-বিদ্রোহের হাঙ্গামায় ডাকাতদের যোগ দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। শিখ-বিদ্রোহে আমরা বিধিয়া বলে একজন ডাকাতের কথা জানতে পারি।

তাছাড়া, নিরুপায় কৃষকের কাছে বাঁচার একমাত্র উপায় লুণ্ঠন। মারাঠাদের লুঠতরাজের ফলে লুণ্ঠিত কৃষকই পিণ্ডারিতে রূপান্তরিত হতো, কারণ তার কাছে বাঁচার অন্য কোনো পথ নেই। এখানে লুণ্ঠন অর্থনৈতিক অবস্থার ভয়াবহ রূপ ও কৃষকের সামাজিক প্রতিবাদের সীমাবদ্ধতার দ্যোতক মাত্র।

আবার অনেকের কাছে লুঠতরাজ আরেকটা স্বতন্ত্র অধিকারের সঙ্গে যুক্ত। আকবরনামায় ইউসুফজাই ও অন্যান্য উপজাতিদের বিদ্রোহের (সরতবি) সঙ্গে 'রাহাজানি' অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। আফ্রিদি প্রমুখ উপজাতিদের এককাট্টা করে জালাল রোশনিয়া, কাবুল থেকে পেশোয়ারের পথ প্রায় বন্ধ করে দিত এবং খাইবার-পথ দিয়ে কেউ যেতে পারত না। পরবর্তীকালেও আফ্রিদি বা খটকরাও এইভাবে বিদ্রোহ করত। এইসব অঞ্চলে কৃষি থেকে আয় হতো সামান্য। বাণিজ্যপথ থেকে শুল্ক সংগ্রহ এইসব উপজাতিদের জীবিকার অন্যতম উপায়। আফ্রিদিদের বা অন্যসব উপজাতিদের এই অধিকার মুঘলরা সময় সময় স্বীকার করেছে, আবার সময় সময় স্বীকার করেনি। উপজাতিদের কাছে বাণিজ্যপথ থেকে কর নেওয়া হলো প্রথাসিদ্ধ আয় বা 'রসুমে মোকরারি'। ফলে মুঘলদের আইনের বিরোধিতা করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না এবং মুঘলরাও এইসব উপজাতিদের 'ডাকাত' বলেই মনে করত। 'রাহাদারি' বাতিল করার জন্যে ও শাহি সড়ককে উন্মুক্ত রাখার জন্যে মুঘল কর্তৃত্বের ধারণা এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যৌথভাবে উপজাতিদের চুক্তি-কর নেবার অধিকারের ধারণার সঙ্গে সংঘাত হতো এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ইউসুফজাই বা আফ্রিদিদের মুঘল ইতিহাসবিদরা সীমান্ত-পথের লুঠতরাজের দায়ভাগী বলে চিহ্নিত করেছেন। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না থাকলেও পাহাড়ের মেওয়াটি বা পাঞ্জাবের লাখি-জঙ্গলের ডোগরা বা গুজরদের যৌথ লুঠতরাজের পেছনেও তাদের নিজস্ব এলাকার অনুর্বরতা ও তজ্জনিত অভাব কাজ করেছিল বলে মনে হয়।

আবার, লুঠতরাজের সঙ্গে মুঘল রাজশক্তির কর্তৃত্বকে সরাসরি নাকচ করার স্পৃহাও থাকতে পারে। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পাহাড় সিং গাউর ইন্দ্ররাখির জমিদার, শাহাবাদের ফৌজদার ও দেড়হাজারি মনসবদার। তিনি বেশ দক্ষতার সঙ্গেই এ অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখছিলেন। রাজা অনিরুদ্ধ সিং হাড়ার বিরুদ্ধে জমিদার লাল সিংকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি সম্রাটের বিরাগভাজন হন। রাজসমীপে তাঁকে ডাকা হয়। তখন বাদশার আদেশ পাহাড় সিং অমান্য করছেন এবং বাধ্যতার পথ ছেড়ে দিয়ে শত্রুভাবাপন্ন হলেন। জনগণের সম্পত্তির ওপর তিনি লুঠতরাজের হাত প্রসারিত করলেন।' পূর্বতন সাহসী ফৌজদার বিদ্রোহী ডাকাতে রূপান্তরিত হলেন এবং তার কারণই হলো সম্রাটের আদেশকে অমান্য করা। এখানে বিদ্রোহীর কাছে লুঠ করা একটি আচরণসম্মত বিধি বলে দেখা দিয়েছে। এবং এই গাউর বিদ্রোহ দীর্ঘস্থায়ীও হয় এবং তার পেছনে লোকের সমাবেশও ছিল। পাহাড় সিং-এর ছেলে ভগওয়ান্ত সিং-এর কার্যাবলীই তার প্রমাণ।

"বেশ কিছু সংখ্যক গ্রামবাসীদের জোগাড় করে সে গোয়ালিয়ার অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পরগনা লুঠ করে সে অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর অত্যাচার করে এবং বাদশাহী সেনার পথ বন্ধ করে দেয়।"[১৫১] আবার বলা হয়েছে যে, তার সৈন্যবাহিনীর লোকেরা বাদশাহী সৈন্যের তাঁবু লুঠ করে যে যার মৌজায় ফিরে যায়।

অর্থাৎ এখানেও গাউর বিদ্রোহে স্থানীয় গ্রামবাসীরা যোগ দিয়েছে ও লুঠতরাজের সুবিধা ছিল। এক্ষেত্রে জাঠ বিদ্রোহ ও গাউর বিদ্রোহ-এর মধ্যে কোনো অমিল নেই। ঈশ্বরদাস নাগরও দুই বিদ্রোহের লুঠতরাজের ফল সম্পর্কে একই উপমা ব্যবহার করেছেন। তা হলো "পথ দিয়ে একটি চড়ুই পাখিও উড়ে যেতে পারত না।"[১৫২] লুঠ ও বিদ্রোহের ভেদরেখা এক্ষেত্রে ক্ষীণ হয়ে যায়।

ডাকাতি, লুঠতরাজ বা রাজস্ব প্রদানে বিরোধিতা এসব ক্ষেত্রে বিদ্রোহের নামান্তর। আকবরের সমাধি লুঠ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও সম্মানকেই ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। ফলে দাক্ষিণাত্য থেকে অসম সাহসী বিদর বখতকে জাঠদের শায়েস্তা করার জন্যে ডাকা হয়। এখানে বিদ্রোহ ও ডাকাতির সীমারেখা প্রায় মুছে যায়। এতাবৎকাল অবশ্য রঘু ডাকাত জাতীয় কোনো সর্দারের হদিশ ফারসি দলিলে পাওয়া যায়নি মধ্যযুগে এরকম ডাকাত ছিল কিনা, না থাকলে তার অনুপস্থিতির কারণ কি, এই বিষয় বিশদ গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

ছ. কৃষক বিদ্রোহ ও শ্রেণী-বিন্যাস

সর্বশেষ বিচারে বলা যেতে পারে যে, কৃষক-বিদ্রোহের তীব্রতা ও গতিমুখ নির্ভর করে বিদ্রোহে শ্রেণীর অংশগ্রহণের ওপর। আমরা জানি যে, জমি-

দারদের মতো কৃষকদের মধ্যেও নানা ভাগ আছে। দুঃখের বিষয়, এই অংশীদারদের শ্রেণী বিশ্লেষণ করার মতো প্রচুর তথ্য ফারসি ঐতিহাসিক রচনায় নেই। ফারসি ও মারাঠি ইত্যাদি স্থানীয় ভাষায় লিখিত একেবারে তলার স্তরে গ্রাম সম্পর্কিত দলিল-দস্তাবেজে এ জাতীয় তথ্য পাওয়া গেলেও যেতে পারে। আপাতত বলা যায় যে, আফগান উপজাতি আন্দোলনে নেতৃত্ব ছিল পেশকশি উপজাতি নায়কের ওপর। ফলে, সেখানে সামন্ততান্ত্রিক কোন্দল, দ্বন্দ্ব ও স্বার্থ অনেক বেশি স্থান পেয়েছে। জাঠ ও মারাঠা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল উচ্চাভিলাষী জমিদাররা। একটা পর্যায়ে প্রাথমিক জমিদার ও গ্রামীণ মুকদ্দমরা আন্দোলনের পক্ষে এগিয়ে আসে। এরা একদিকে আবার খুদকশত রায়তের পর্যায়ভুক্ত। ফলে, এরাও গ্রামীণ সমাজের একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী, কিন্তু এদের সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির বিরোধ অপেক্ষাকৃত তীব্র এবং এদের পক্ষে নিজেদের স্বার্থের জন্যেই তলাকার কৃষকদের সমর্থন সংগ্রহ করা অনেক সহজ হয়। আবার, সবচেয়ে জঙ্গি আন্দোলনগুলোতে ব্যাপকভাবে কৃষক ও কারিগরদের সমাবেশ দেখা যায়। পাইক ব্যবস্থার বিশেষ বৈচিত্র্যের জন্যে সনাতন নিজে 'সর্দার' পর্যায়ভুক্ত হলেও তাঁর পেছনে রায়তদের ব্যাপক সমর্থন ছিল। হাতিখেদা সৎনামি বা রোশনিয়া আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে সরাসরি-ভাবে নিম্নবর্ণ এবং খেটে-খাওয়া কৃষকের দলই এসেছে। বান্দার নেতৃত্বে শিখ-বিদ্রোহেও আমরা কৃষি সমাজের একেবারে নিম্নবর্গের লোকদের অংশগ্রহণ দেখতে পাই। ফলে, এইসব আন্দোলনে তীব্রতা, উন্মাদনা ও জঙ্গি মনোভাব অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক বেশি। এই আন্দোলনের তাৎক্ষণিক নায়কদের আর মুঘল রাষ্ট্র-কাঠামোর অংশীদার করা হয়নি, তাদের একেবারে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। দাসি কুমি ও বান্দার নেতৃত্বের আন্দোলনের মধ্যে সুস্পষ্ট রাষ্ট্র-বিরোধিতার সঙ্গে অস্পষ্টভাবে মধ্যবর্তী জমিদারদের বিরোধিতার আভাসও পাওয়া যায়। কারণ, গ্রামীণ সমাজের উঁচু মহলের নেতৃত্বের ও অংশগ্রহণ এই বিশেষ পর্যায়ে প্রকট নয়। বর্তমান আলোচনায় পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে এর বেশি কিছু আপাতত বলা যাচ্ছে না। ভবিষ্যতের গবেষণা এদিকে আলোক-সম্পাত করবে মনে হয়।

আবার এটাও মনে রাখা দরকার যে, জমিদার বিদ্রোহেরও প্রকারভেদ আছে। পুরনো জমিদার বংশগুলি তাদের পুরনো অধিকার বজায় রাখার জন্যে লড়াই করত। রাজপুত ও বুন্দেলা বিদ্রোহ তার উদাহরণ। সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে এরা তুলনামূলক ভাবে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে জাঠ ও মারাঠা বিদ্রোহে উঠতি জমিদারগোষ্ঠীর একাংশ অংশগ্রহণ করে। তাদের লড়াই নতুন অধিকার পাওয়ার জন্যে এবং নিজেদের ক্ষমতাকে বিস্তার করার জন্যে। ফলে এই লড়াই অনেক বেশি আগ্রাসী, অষ্টাদশ শতকের

রাজনীতিতে এদের ভূমিকাই তুলনামূলক ভাবে জোরদার। যেহেতু এরা অপেক্ষাকৃত নিচুতলা থেকে সগু উঠে আসছে, জনতাকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও এদের সুবিধা তুলনামূলক ভাবে বেশি। জমিদার ও কৃষকের বিদ্রোহের তুলনামূলক ব্যাপকতা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর উঠতি জমিদারদের নেতৃত্বেই সম্ভবপর হয়েছিল বলে মনে হয়।

সাম্প্রতিক কালে একটি প্রবন্ধে ইরফান হাবিব মতপ্রকাশ করেছেন যে, মুঘলযুগে ভারতীয় কৃষক বিদ্রোহে কৃষকদের শ্রেণী হিসাবে চেতনা প্রকাশ পায়নি। বেশির ভাগ বিদ্রোহই জমিদারদের স্বার্থচেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন থেকেছে। মুঘল যুগে কৃষক-বিদ্রোহের ব্যাপ্তির পেছনে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রসারের কথা বলা হয়েছে এবং কৃষক প্রতিরোধে তার ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়েছে। এই জাতীয় অস্ত্রের ব্যবহার বিদ্রোহে গ্রামের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের কথাই প্রমাণ করে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে গ্রামের সম্পন্ন চাষী ও দরিদ্র চাষীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বের বাস্তব শর্ত উপস্থিত ছিল না। তোডরমল সরাসরি বলেছেন "গ্রামের মাথামোটা জারজেরা নিজেদের অংশ রেখে দিয়ে সবকিছু ক্ষুদে চাষীদের (রেজা রাইয়া) উপর চাপিয়ে দেয়।" তথাপি গ্রামে কৃষক চেতনায় এই দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয় না।[১৫৩] হাবিব এইরকম অবস্থার একটা কারণ নির্দেশ করেছেন। বর্ণবিভেদ ও সামাজিক বিন্যাস এত ব্যাপক ছিল যে আত্মচেতনার কোনো বাস্তব ভিত্তিই ছিল না।

হাবিবের এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তোলা যায়। যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে যে, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ও বর্ণভেদ পাঞ্জাব বা দোয়াবে ব্যাপক ছিল। কিন্তু শিখ বা সৎনামি বিদ্রোহে শ্রেণীচেতনার প্রাথমিক উন্মেষের কথা হাবিবও স্বীকার করেছেন। সেখানকার ঐরকম ধর্মীয় উন্মাদনা কোন বাস্তব পরিস্থিতি থেকে রসদ সংগ্রহ করেছিল? আবার মধ্যযুগের ইংল্যাণ্ড বা চীনের কৃষক-বিদ্রোহের সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গেই হাবিব এইকথা বলেছেন। কিন্তু কসমনস্কি বা হিলটন; ভিনসেণ্ট শি বা সেনোর রচনায় এমন কোনো কথা নেই যে ইংল্যাণ্ড বা চীনের সমসাময়িক কৃষকদের মধ্যে সামাজিক বিন্যাস ভারতীয় কৃষকদের তুলনায় কম অনগ্রসর ছিল। বরং যেখানে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে সেখানেই বিদ্রোহ ও বিক্ষোভে শ্রেণীদ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। সেখানকার কৃষকচৈতন্যে বারবার পুরনো উপজাতি সমাজের নানা স্মৃতি, স্বর্গরাজ্যের কল্পনা ইত্যাদি নানা ধর্মীয় চেতনা ঐক্যের সন্ধান দিয়েছে। ঐসব স্বপ্নের অস্তিত্ব ছিল কৃষকের স্মৃতিচেতনায় ও সংগ্রামের ঐতিহ্যে। দ্বিতীয়ত—গ্রামীণ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চিহ্ন যে একেবারেই নেই, একথা ঠিক নয়। হাবিব নিজের রচনাতেই সেরকম নিদর্শন উল্লেখ করেছেন। ওয়াকাই-ই-আজমিরিতে আছে যে, একজন গুজর রাজপুতদের

বেগার খাটতে অস্বীকার করে ও তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়।[১৫৪] জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সাধারণ কৃষকরা সরকারের কাছে আবেদন পাঠাত।

মনে হয়, ব্যাপক জমিদার বা গ্রামীণ শোষক বিরোধী সংগ্রামের দানা না বাঁধার অন্যতম সম্ভাব্য কারণ হলো বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক প্রসঙ্গে কৃষকদের ধারণা। কৃষকগোষ্ঠীর কাছে সামন্ততান্ত্রিক ও আমলাভিত্তিক কেন্দ্রীভূত মুঘল রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বা হুকুম একক ও বাইরের বস্তু। সেই কর্তৃত্বের দাবি এত বেশি ছিল যে, কৃষকের ঘৃণা মূলত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতিভূদের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। দোয়াবের কৃষক-বিদ্রোহের আক্রোশের প্রধান শিকার মহম্মদ-বিন তুঘলকের আমলারা হয়েছিল। খাফি খান রাজস্ব আদায়কারী আমলাদের সম্পর্কে সাধারণের মনোভাব নিজের জবানিতেই বলেছেন।

"রাজস্ব কর্মচারিদের এতই বদনাম ছিল" যে রাজস্ব আদায়কারী আমলাদের কাজের চাইতে কুকুরের রক্ষণাবেক্ষণ করা ও শুওর চরানোর (সাগবানি ওয়া খুগচরায়ি) কাজও অধিকতর সম্মানজনক।"[১৫৫] ক্রিয়া বারনিও রাজস্ব কর্মচারির বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের সার্বিক ঘৃণার কথা উল্লেখ করেছেন। এই মনোভাবের কাছে অন্য ধরনের আক্রোশ অনেক স্তিমিত হয়ে গেছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ভয়াবহতার কাছে গ্রামীণ কর্তৃত্ব হয়তো নিস্তেজ বলে মনে হয়েছে।

দ্বিতীয়ত—নানা ধরনের সামাজিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক গ্রামীণ কর্তৃত্বকে হয়তো কৃষকদের কাছে অনেক সহনীয় করে তুলেছিল। বর্ণব্যবস্থা যে আপাত সমঝোতার বাতাবরণ সৃষ্টি করে তা বারবার বলা হয়েছে। এছাড়া প্রতিবাদের নানা রূপ আমরা দেখেছি। আবেদন পাঠানো, রাজস্ব না দেওয়া, পালিয়ে যাওয়া, বিদ্রোহ করা ইত্যাদি রূপ নানাভাবে নানা স্তরে প্রতিরোধের ধারণাকে বোঝায়। বুলান মণ্ডল-এর পালানোর মধ্যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। কৃষকরা সমবেতভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা করছে এবং তার পরে, যৌথভাবে কালকেতুর এলাকায় আসছে। মুঘলরাষ্ট্র শ্রেণীশোষণের প্রধান হাতিয়ার এবং তাই কৃষক-বিক্ষোভের ধারা কেন্দ্রীয় আমলাদের বিরুদ্ধে ধাবিত হয়েছে। স্থান ও কালভেদে তার বহিঃপ্রকাশ নানাভাবে হয়েছে মাত্র। কৃষক-সমাজে নানা স্তর, সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতা ও কেন্দ্রীয় ক্ষমতার পারস্পরিক টানা-পোড়েন এই বহিঃপ্রকাশগুলির রূপ নির্ণয় করে মাত্র।

৯

উপসংহার

মুঘলযুগের ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতির সামগ্রিক আলোচনার শেষে আমরা মুঘলযুগকে অবশ্যই প্রাক-ধনতান্ত্রিক যুগের একটি পর্যায় বলে অভিহিত করতে পারি। কিন্তু এর সঠিক চারিত্র কি, এটা কি সামন্ততন্ত্র না আর কিছু, তাই নিয়েই বিতর্ক চলে।

এখন আমাদের কতকগুলো তাত্ত্বিক ধারণা স্পষ্ট করা দরকার। প্রত্যেকটি সমাজব্যবস্থাই নিয়ত পরিবর্তনশীল। ফলে, শ্রেণীগুলির গঠন ও পারস্পরিক সম্পর্ক এবং উৎপাদন শক্তিগুলোর বিকাশও পরিবর্তিত হয়। আবার, প্রত্যেক সামাজিক ব্যবস্থায় উৎপাদিকা শক্তির ওপর নির্ভরশীল চালিকাশক্তি (law of motion) থাকে। সেটা একটি ব্যবস্থাকে অন্যান্য সমাজব্যবস্থার থেকে ইতিহাসে পৃথক করে রাখে। সেই চালিকাশক্তির মৌলচরিত্র একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়ে দীর্ঘসময় ধরে একই থাকে। সেই চরিত্রই সেই সমাজের মৌল লক্ষণ এবং তা দিয়েই সেই সমাজব্যবস্থা ইতিহাসে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে। এই চালিকাশক্তি নির্ণয় করার জন্যে আমরা সেই বিশেষ সমাজব্যবস্থায় শ্রম-নিয়োগের পদ্ধতি এবং উদ্বৃত্ত সম্পদ আহরণ ও বণ্টনের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি।

প্রত্যেক দেশের বৈশিষ্ট্য আছে। তবে একদেশের ইতিহাস ও সমাজব্যবস্থা

যে একই সময়ে অন্যদেশের ইতিহাস ও সমাজব্যবস্থার ফটোকপি—তার কোনো মানে নেই। এক্ষেত্রে সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি সমাজের উপরি-কাঠামোর বিভিন্ন অঙ্গের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বলাভ করে। কিন্তু কোনো সমাজব্যবস্থার চরিত্র নির্ধারণে এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যকে স্বীকার করলেও প্রথমে মূল চালিকা-শক্তিকে নির্ণয় করতে হবে। আর, সেই ভিত্তিতেই আমরা কোনো সমাজ-ব্যবস্থাকে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক প্রকারে (category) অভিহিত করতে পারি। এই ঐতিহাসিক প্রকার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় প্রযোজ্য। আবার, সেই প্রত্যেকটি দেশের সমাজব্যবস্থা নিজের ঐতিহাসিক বিকাশের বৈশিষ্টের জন্যে একই ঐতিহাসিক প্রকারের আওতায় এসেও কতকগুলো বিশেষ লক্ষণে চিহ্নিত হতে পারে। কোনো দেশের পরিস্থিতিতে আমরা যখন কোনো সমাজব্যবস্থার প্রকারে বিচার করব তখন তার বিশেষ ও সাধারণ লক্ষণ -দুটো দিকেরই আলোচনা করব।

সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণ ও চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে আরেকটি সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক। প্রত্যেকটি সমাজেই অতীত ব্যবস্থার রেশ ও আগামী ব্যবস্থার ভ্রূণ নিহিত থাকে। দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অতীত দিনের ব্যবস্থা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও আগামী দিনের সমাজব্যবস্থার বীজ বিকশিত হয়। একটি সমাজব্যবস্থার গোটা বিবর্তন ধারায় এই পিছুটান ও আগুবাড়ার প্রক্রিয়া অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে। তাই বিশেষ কোনো অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে বিচ্ছিন্নভাবে গুরুত্ব আরোপ করলে আমরা সেই সমাজের প্রকৃত চিত্রায়ণ সম্পর্কে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপটেই বিশেষ বিশেষ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিচার করতে হবে এবং সামগ্রিক গতি পরিবর্তনের প্রধান প্রবণতার দিকে নজর রেখেই গোটা সমাজ-ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করতে হবে।

এই আলোচনার পরে বলা যেতে পারে, পশ্চিম ইয়োরোপে সামন্ততন্ত্রের মূল সাংগঠনিক রূপ হলো 'ম্যানর' (manor)। ম্যানরের সাধারণত দুটি ভাগ—সামন্তপ্রভুর খাসজমি ও খাজনার বিনিময়ে তার ভূমিদাস কর্তৃক অধিকৃত জমি। এই দুটির পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সামন্ততন্ত্রের বাহ্যিক রূপ বজায় ছিল। এখন মনে রাখা দরকার যে, সামন্ততন্ত্রের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত সম্পদ মূলত কৃষিক্ষেত্র থেকে আহরিত হতো। যে কোনো প্রাক-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই একথা সত্য। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় পরিবর্ধিত কৃষকের মৌল বৈশিষ্ট্য আছে; সে দাস নয়, কিন্তু ভূমিদাস। উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা ভূমিদাসের। একজন দাসের উৎপাদনের উপকরণের ওপর কোনো মালিকানা থাকে না। সে নিজেই প্রভুর কাজে উৎপাদনের উপকরণ মাত্র। ভূমিদাস তাই দাস থেকে আলাদা, তার স্বতন্ত্র সামাজিক অস্তিত্ব আছে। কিন্তু জমির সঙ্গে

তার অস্তিত্ব বাঁধা, সে ইচ্ছামতো জমি ছেড়ে চলে যেতে পারে না ; ম্যানরের অর্থনৈতিক বন্ধন তাকে নাগপাশে জড়িয়েই রাখে।

অন্যদিকে প্রভুর সঙ্গে ভূমিদাসের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলা যায়, সেখানে প্রভুত্ব রাখা হয় আনুগত্যের ভিত্তিতে। নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক ক্ষেত্রটা রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপ, তার মাধ্যমেই অর্থনৈতিক শোষণটা হয়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রাথমিক উৎপাদকের কাছে অভিজাতরা জমির উদ্বৃত্তের ওপর বিশেষ অধিকার দাবি করে। কৃষক রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির চাপে সেই দাবি স্বীকার করে এবং জমির উপরে নিজের ভোগদখলি স্বত্ব ও নিরাপত্তার বিনিময়ে অভিজাতকে খাজনার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত সম্পদের ফসল তুলে দেয়। নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, দাসের জীবন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-প্রক্রিয়ায় মালিকের অধিকার সমভাবে বর্তায়। সামন্ততন্ত্রে মালিক ভূমিদাসের সামাজিক ও জীবন-প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ রাখে। ফলে, শ্রম-প্রক্রিয়াতেও তার কর্তৃত্ব প্রসারিত হয়। এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মালিক শ্রম-প্রক্রিয়াতে আগে তার কবজা আনে। ফলে, সে শ্রমিকের সামাজিক জীবনেও তার ক্ষমতা কায়েম করে।

তাই আমরা উৎপাদনের উপকরণের মালিকানার ভিত্তিতে এবং উদ্বৃত্ত সম্পদ আহরণের জন্যে নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল লক্ষণচিহ্ন নির্ধারিত করলাম। উদ্বৃত্ত এখানে হলো খাজনা। মুনাফার পরিবর্তে এখানে খাজনার মাধ্যমেই মানুষের শ্রমের সব উদ্বৃত্ত মূল্য গৃহীত হচ্ছে। অবশ্য এই খাজনা নানাভাবে নেওয়া যেতে পারে—শ্রমের মাধ্যমে. উদ্বৃত্ত পণ্যের মাধ্যমে বা অর্থের মাধ্যমে। কিন্তু তাতে কৃষকের ভূমিদাসত্ব বা নিয়ন্ত্রণের চরিত্র বদলায় না।

এই সাধারণ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে মুঘলযুগের অর্থনীতিকে বিচার করতে পারি। আমরা মুঘলযুগে কোনোরকম ম্যানরের অস্তিত্ব পাই না। তখন সেরকম কোনো সংগঠন ছিল না। মুঘলযুগের কৃষকরা একক জোতের অধিকারী ছিল। তাদের ভোগদখলি স্বত্ব ছিল। কিন্তু তারাও জমির সঙ্গে জড়িত। কৃষিকাজ তাদের করতেই হতো। ভূমির সঙ্গে বাঁধা থাকা তাদের ভাগ্য। উৎপাদনের উপকরণের মালিকানাও তাদের ছিল। দ্বিতীয়ত—নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়েও শোষকশ্রেণীরা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই তাদের কর্তৃত্বকে প্রথম কায়েম করত, সেখান থেকেই অর্থনৈতিক শোষণের জোর কায়েম হতো। রাষ্ট্র বা জমিদার, উভয়েই কতকগুলো নির্দিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ওপর ভিত্তি করে। সামাজিক সম্পদের ওপর উদ্বৃত্ত দাবি করত। রাষ্ট্র বা জমিদার কেউ সরাসরি উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করত না ; সেই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তারা উদ্বৃত্ত সম্পদও আহরণ করত না। তাদের নিয়ন্ত্রণ আসত সমাজজীবনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক শক্তির মাধ্যমে। সেখান

থেকেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রসারিত হতো। সুতরাং এই নিরিখে মুঘল কৃষি-অর্থনীতি অবশ্যই সামন্ততান্ত্রিক বলে আমরা মনে করতে পারি।

জমির ওপর মালিকানার কথাও একটু অন্যদিক থেকে বিচার করা উচিত। জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ফল। জমির জন্যে বাজার প্রতিযোগিতায় মূল্য নির্ধারণ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির হাতবদল ইত্যাদি অর্থনৈতিক নিয়ম ও আইনগত ধারণা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। এইসব ধারণাকে ব্যবহার করে মুঘলযুগের জমির মালিকানা বিচার করাটা বিভ্রান্তিরই জন্ম দেয়। আসলে মুঘলযুগে মূল দ্বন্দ্বটা ছিল জমি থেকে জাত উদ্বৃত্ত ও জমিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে। জমির ওপরে নানা ধরনের অধিকার ছিল। এক ধরনের অধিকার অন্য ধরনের অধিকারকে সীমিত করত। এই সীমিত ও পরস্পরবিরোধী নানাধরনের অধিকারের সহাবস্থান সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থারই পরিচয় দেয়। সম্পত্তির একক ব্যক্তিগত নিরঙ্কুশ অধিকার একমাত্র ধনতন্ত্রেই সম্ভব। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, মুঘল আমলে আইন, উত্তরাধিকার ইত্যাদি নিয়ে কাজ এখনো কিছু হয়নি। বণিকদের ও হস্তশিল্পীদের মধ্যে সম্পত্তির ধারণা কি ছিল, সেই বিষয়ও এখনো অনুসন্ধান সাপেক্ষ। তবে এদিকে আলোচনা করতে গেলে, আমাদের প্রশ্নের ধারা বদলাতে হবে, সম্পত্তি সম্পর্কে বর্তমান ধারণা নিয়ে জবাব খুঁজলে ভুল জায়গায় পৌঁছাব।

মুঘলযুগের সামন্ততন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বোধহয় রাষ্ট্রের ভূমিকা। এখানে মূল উদ্বৃত্ত সম্পদ ভোগ করে রাষ্ট্র। তার শোষণের মূলরূপ হচ্ছে রাজস্ব সংগ্রহ। জমির ওপর তার কোনো মালিকানা স্বত্ব না থাকলেও রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে রাজস্বই এখানে উদ্বৃত্ত সম্পদের মূলরূপ। রাষ্ট্র জমিদারের স্বত্ব স্বীকার করে নেয়। কিন্তু তার পরিবর্তে তাকে নানকার ইত্যাদি অংশ সে নির্দিষ্ট হারে দেয়, বাকিটা রাজকোষে যায়। সুতরাং রাজস্বের এই ব্যাপকতাও উদ্বৃত্ত সম্পদে খাজনার অংশের স্বল্পতা মুঘল সামন্ততন্ত্রকে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক করেছে। রাষ্ট্রের মূল শাসকশ্রেণী এখানে আমলা বা মনসবদাররা। তারা মূলত একটি সামরিক অভিজাততন্ত্র। এই অভিজাততন্ত্র কিন্তু তাদের শোষণের আইনানুগ সমর্থন আদায় করছে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে। ব্যক্তিগত ভাবে মুঘল সম্রাটের প্রতি তাদের আনুগত্য নাও থাকতে পারে। কিন্তু মুঘল-ই-আজমের প্রতি তাদের আনুগত্য অপরিসীম। উপরি-কাঠামোর সেই আনুগত্য তাদের শোষণের ক্রিয়াকলাপকে আইনসম্মত করে তোলে। এইজন্যে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ফাররুখশিয়ারকে হত্যা করেও নিজেরা সিংহাসন দখল করেন না, বরং চাঘতাই বংশের আরেকজনকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। আলিবর্দি নিজের ক্ষমতায় সরফরাজকে বাংলার সুবাদারি থেকে সরিয়েও দিল্লির বাদশাহের কাছে নতুন

পদের জন্যে ফরমান চান। এরকম অজস্র ঘটনা প্রমাণ করে যে, মুঘল রাজতন্ত্রের ঐতিহ্য কিভাবে একটা শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল এবং বিভিন্ন ধরনের অভিজাতরা কিভাবে সেই ঐতিহ্যকে স্বীকার করেন। এটা সম্ভব হয়েছিল, কারণ একটা পর্যায়ে মুঘল আমলাতান্ত্রিক অভিজাতদের স্বার্থ এবং মুঘল রাষ্ট্রের স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে মুঘলরাষ্ট্র আমলাতান্ত্রিক সামরিক অভিজাতদের স্বার্থেরই প্রতিভূ ছিল। এবং এই আমলাতান্ত্রিক চরিত্রের জন্যেই মুঘলরাষ্ট্রে কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক এত বেশি। এই বৈশিষ্ট্যই মুঘল-ভারতের সামন্ততন্ত্রকে নিজস্ব লক্ষণে ভূষিত করেছে।

ঐতিহাসিক কারণেই বোধহয় ভারতে রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্রের পাশাপাশি তলা থেকে উঠে-আসা আঞ্চলিক ও স্থানীয় সামন্তশক্তির অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই। জমিদারদের অস্তিত্বই এর প্রমাণ। এই দুই ধরনের সামন্ততন্ত্রের বোঝাপড়া ও সংঘাত মুঘল আমলে ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। সময় সময় আমলাতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্র জোরদার হয়েছে, সে চেষ্টা করেছে আঞ্চলিক সামন্তদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অঙ্গীভূত করতে। আবার, ঐ রাষ্ট্রীয় নিগড়কে তুচ্ছ করে তলাকার সামন্তশক্তি আঞ্চলিকভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে।

তলাকার এই উঠে-আসা সামন্তশক্তির বাহ্যিকরূপে অবশ্য অনেক প্রকারভেদ আছে। আলা সিংহের মতো পাঞ্জাবের চৌধুরি শক্তিশালী স্থানীয় ক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়। এরা মুঘল শাসনব্যবস্থা থেকেই জাত। আওরঙ্গজেবের সময় থেকে পুরনো জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্যে মুঘল সনদপ্রাপ্ত জমিদারদের উৎসাহ দেওয়া হতো। এই ধরনের জমিদাররা নানা আঞ্চলিক, প্রাদেশিক ও মুঘল ক্ষমতার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে, নানা সুযোগ ব্যবহার করে আঞ্চলিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। আলা সিংহ সবার সঙ্গে শত্রুতা করেছেন, আবার সবার সঙ্গেই মিত্রতা করেছেন। আলা সিংহ একক বিচ্ছিন্ন উদাহরণ নয়। পূর্ব-ভারতে কানুনগো মানস রায় ও তাঁর বংশধর বলবন্ত সিংহের নেতৃত্বে বেনারস রাজবংশের উত্থান একই প্রক্রিয়া জাত। প্রাদেশিক ক্ষমতার সঙ্গে যোগাযোগ এবং পূর্বতন স্থানীয় ক্ষমতাকে ছলে-বলে সরিয়ে নিজের আধিপত্য বিস্তার করাই এইসব ভুঁইফোড় রাজাদের উদ্দেশ্য ছিল। এদের অভ্যুত্থান অবশ্য একক নিরঙ্কুশ ব্যক্তি-ক্ষমতার বিকাশ ও রাজকীয় বংশ স্থাপনের মধ্য দিয়েই চরিতার্থ হয়েছে।

অন্যদিকে জাঠ 'থপ', শিখ 'মিসল' সর্দারদের অভ্যুত্থানে গোষ্ঠীগত সামন্ত ক্ষমতার বিকাশ দেখা যায়। এই রাষ্ট্রগুলিতে একক নেতার দক্ষতা বা নৈপুণ্যের স্থান থাকলেও রাজনৈতিক কাঠামোয় গোষ্ঠী বা যৌথ-নায়কদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সমঝোতা প্রধান ভূমিকা নেয়।

আবার সাদৎ খান, নিজাম-উল-মুলক বা মুর্শিদকুলি খাঁর মতো উচ্চাভিলাষী মুঘল সুবাদাররা মুঘল শাসকের প্রতিবিম্ব হিসেবে কিছু কিছু এলাকায় নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন।

লক্ষণীয় এই যে, এই শক্তিগুলোর পেছনে নতুন কোনো উৎপাদিকা শক্তি কাজ করছিল না। মুঘল সাম্রাজ্যের মতো বিশাল এলাকার সম্পদের অধিকারীও এরা নয়। এদের অর্থনৈতিক ভিত নড়বড়ে। ফলে, আঞ্চলিক শক্তিগুলো বারবার চেষ্টা করলেও মুঘলদের মতো সর্বভারতীয় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চেও নিজেদের ক্ষমতা স্থায়ীভাবে দীর্ঘদিন নিরঙ্কুশ রাখতে পারে না। তাই, একদিকে আঞ্চলিক ক্ষমতা মুঘল সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যের আনুকূল্য খুঁজেছে, অন্যদিকে স্থানিক ক্ষমতার সঙ্গে কখনো সংঘর্ষ, কখনো বোঝাপড়া করে নিজেদের ভিতকে জোরদার করার চেষ্টা করেছে। মুঘল কেন্দ্রীয় ক্ষমতা, প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ক্ষমতা এবং স্থানিক ক্ষমতার টানা-পোড়েনেই অষ্টাদশ শতকের সামন্ত রাজনীতির মর্মবস্তু এবং সেখানে রাজনৈতিক উদ্যোগ কেন্দ্রীয় ক্ষমতার কাছ থেকে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ক্ষমতার নেতাদের হাতে চলে এসেছে।[১]

এই দুই দ্বন্দ্বের মধ্যে কৃষক-বিদ্রোহের আবর্তন নিজের ভূমিকা পালন করেছে। দুই ধরনের সামন্ত শোষণের সঙ্গেই কৃষকদের বিরোধ বর্তমান। কিন্তু যেহেতু উদ্বৃত্ত সম্পদের মূল ভাগীদার রাষ্ট্র, কৃষক-বিদ্রোহের মূল বর্শামুখ সেদিকেই ধাবিত হয়েছে। এই কৃষক-বিদ্রোহের সঙ্গে নানা ধরনের ধর্মীয় বা নিছক সামাজিক উচ্চাভিলাষী গোষ্ঠীর স্বার্থও জড়িয়ে থাকত। কৃষক-বিদ্রোহের আবর্তনে রাষ্ট্রীয় কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ত এবং আঞ্চলিক নানা পুরনো ও নতুন সামন্তশক্তি মাথা চাড়া দিত। তাই রাষ্ট্রীয় কাঠামো জোরদার হয়েছে, কৃষকদের বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহের ধারাবাহিকতা চলেছে, আঞ্চলিক সামন্তরা সংকটের সময় বড় আমলাতান্ত্রিক সামন্তদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে কৃষক-বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছে; অথবা বিদ্রোহ থেকেই নতুন এক সামন্তগোষ্ঠীর জন্ম হচ্ছে—এটাই ভারতের মুঘল আমলে শ্রেণীসংগ্রামের চিহ্ন বলে মনে হয়।

এছাড়া আরো অনেক দ্বন্দ্বও থাকতে পারে। আঞ্চলিক সামন্তদের মধ্যে নিজস্ব দ্বন্দ্ব তো ছিলই। যেসব জমিদাররা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে সহযোগিতা করে চৌধুরি ও কানুনগো অধিকার পেয়েছিল এবং তা যারা পায়নি—তাদের বিরোধের ভূমিকা মারাঠা বা শিখ বিদ্রোহের এক পর্যায়ে আমরা দেখেছি। রাজসভার সঙ্গে যুক্ত আঞ্চলিক সামন্তরা এবং তার আওতার বাইরে থাকা ক্ষুদে ক্ষুদে ভূঁইয়াদের সঙ্গে বিরোধের কাহিনী সাম্প্রতিক গবেষণাগুলিতে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ঐ উঠতি উচ্চাভিলাষী ক্ষুদে ভূঁইয়া বা গ্রামের মুকদ্দমরা কৃষক-বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল—এ তত্ত্ব বোধহয় ব্যাপক গবেষণার দ্বারা ভুল প্রতিপন্ন হবে না। এরাই আবার অনেকেই ছিল খুদ-কশত রায়ৎ।

এদের মধ্যে বর্ণসংহতির কথা আগেই বলা হয়েছে। পাহিকশ্‌ত, রেজা রেইয়া প্রভৃতির ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য অতি অল্পই জানা যায়, তাই কৃষকসমাজের নিজস্ব দ্বন্দ্বের চরিত্র এখনো আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার নয়।

কৃষক-বিদ্রোহের ফলে গ্রামীণ সম্পন্ন কৃষকরা বোধহয় লাভবান হয়েছিল। সামন্ত প্রভুদের চোখ দিয়ে কবি সৌদা লিখেছেন—"বড় বড় অভিজাতরা অসহায় ও খুব গরিব। তাদের রায়তরা বছরে দু'বার ফসল তোলে, কিন্তু তাদের প্রভুরা সেগুলো চোখেও দেখে না। ধনী কৃষক যেভাবে মহাজনদের হাতে বন্দী থাকে, অভিজাতদের কর্মচারিরাও কৃষকের হাতে বন্দী। আইন ও শৃংখলার এতদূর অবনতি হয়েছে যে যদি কৃষকরা সোনার ফসল ঘরে তোলে, মালিক একটা খড়ের টুকরোও চোখে দেখবে না।"[২]

এখন আমরা গ্রামীণ সমাজের ধারণাকে বিচার করতে পারি। একথা ঠিক যে, মার্কসীয় গবেষকদের এই গ্রামীণ সমাজের অস্তিত্বকে আক্ষরিক অর্থে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা নিষ্ফল। এঙ্গেলস নিজে পরবর্তীকালে ভারতীয় সমাজে নানা পরিবর্তনের আভাস দেখতে পেয়েছিলেন।[৩] নানা ধরনের স্বত্বের অবস্থান, শ্রেণীদ্বন্দ্ব, একটি পর্যায় পর্যন্ত কৃষির বাণিজ্যকরণ ইত্যাদি গ্রামীণ সমাজের তথাকথিত ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে। অর্থনীতি বা সমাজে যে ধরনের যৌথ প্রচেষ্টার উল্লেখ আমরা পাই—তা ইয়োরোপীয় সামন্ততন্ত্রের গ্রামগুলিতেও পাওয়া যায়। ইয়োরোপে যৌথ চারণক্ষেত্রের অবস্থিতি, যৌথ প্রচেষ্টায় কৃষি-ক্ষেত্রের প্রসার ঘটানো, গ্রামীণ রীতিনীতি ও আইন-কানুনের দোহাই দিয়ে সামন্তদের দরবারি আইনকে অগ্রাহ্য করা ইত্যাদি আজকের দিনের মার্কসীয় ইতিহাসজ্ঞদের গবেষণায় সুপ্রমাণিত।[৪]

আমার মনে হয়, ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের গুরুত্ব অন্য একটি ক্ষেত্রে অপরিসীম। গ্রামীণ হস্তশিল্পী ও কৃষির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, গ্রামের ভূমিজ ভুঁইয়াদের সামাজিক ভিত্তিতে খুব বড় একটা চিড় ধরায় নি। যে কোনো কৃষি অর্থনীতিতে গ্রামীণ হস্তশিল্পীদের স্বনির্ভরতা ও স্বকীয়তা এক ধরনের বৈপ্লবিক শক্তির জন্ম দেয়। যদি তারাও পণ্য উৎপাদনের ক্ষুদে ব্যবস্থার আওতাতেই পড়ে, তথাপি তারা দূর বাজারের যোগাযোগ ও স্বকীয় স্বাধীনতার খাতিরে বহু সময়ই গ্রামের নিজস্ব অর্থনীতিতে তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে এবং গ্রামের নিজস্ব কায়েমি স্বার্থকে আঘাত হানে। ইয়োরোপীয় সামন্ততন্ত্রের শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ইতিহাস এটাকে প্রমাণিত করে। আমরা সৎনামি ও শিখদের বিদ্রোহের এক পর্যায়ে হস্তশিল্পীদের ভূমিকা দেখেছি। সেই আন্দোলনে লড়াইও অনেক মারমুখী, জঙ্গি ও সমাজে নিম্নবর্গের লোকেদের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃষি ও হস্তশিল্পের এই অবিচ্ছেদ্য বাঁধন গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে একতা ও সংহতি দিয়েছিল—তাই ছিল ভূমিজ ভুঁইয়াদের

সবচেয়ে জোরদার ভিত্তি। এই সামাজিক ভিত্তির জন্যেই আঞ্চলিক সামন্তশক্তি, রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক সামন্তশক্তির সব চাপকে অগ্রাহ্য করতে পেরেছিল এবং টিঁকে গিয়েছিল। এই ছকে বিচার করলে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের অস্তিত্ব সামন্তবাদের অস্তিত্বের বিরোধী নয়। ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের দ্বন্দ্বের অন্যতম মূলশক্তি, আঞ্চলিক সামন্ততন্ত্রের জোর এই গ্রামীণ সমাজের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। এবং এই দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্যের অন্যতম কারণ ছিল—ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ।

ভারতীয় বণিক ও নগরের ভূমিকা এই সামন্ততন্ত্রের ছকেই করতে হবে। মূল অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভূমিকা নিশ্চয় অনেক কম। অধিকাংশ লোকই কৃষিকাজে নিয়োজিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুঘল আমলে নিঃসন্দেহে তুলনামূলকভাবে বাণিজ্য ও মুদ্রা-অর্থনীতির প্রসার হচ্ছিল এবং তার কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়ে গেছে। প্রথমে ধরা যাক, সামাজিক সম্পদের আহরণের জায়গা। কাশ্মীর বা উড়িষ্যা ইত্যাদি কয়েকটি জায়গা ব্যতীত 'জবত' বা নস্‌ক ব্যবস্থার মাধ্যমে নগদ অর্থেই রাজস্ব আদায় করা মুঘলরাষ্ট্রের নীতি ছিল। এর অর্থ, কৃষককে তার উৎপাদনের ব্যাপক অংশ বাজারে পাঠাতে হতো। এই বাজারে পাঠানোর তাগিদ এবং রাষ্ট্রের নগদ অর্থে রাজস্বের চাপ পরস্পর নির্ভরশীল।

মুহম্মদ হাসিমের প্রতি আওরঙ্গজেবের ফর্মানে ৮নং ধারার ভাষ্যে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, শস্য কাটার সময় রাজস্ব দাবি করতে যাতে কৃষকরা অবিচলিতভাবে শস্যের একাংশ বাজারে বিক্রি করে (জিরায়ৎ ব ফুরুশি) রাজস্ব মেটাতে পারে। 'জবত' ব্যবস্থায় আবার প্রত্যেকটি শস্যের ১০ বছরের গড়পড়তা বাজারদাম নির্ধারণ করা হতো। এবং রাজস্বের মাধ্যমেই শোষণ আমলাতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্রের মূলভিত্তি ছিল। তাই বাজারের ভূমিকা ও মুদ্রা-অর্থনীতির অস্তিত্ব মুঘল আমলাদের শোষণের রূপ বজায় রাখার পক্ষে অপরিহার্য। অন্যদিকে বাজারের প্রসার হচ্ছিল রাষ্ট্রীয় রাজস্ব কাঠামোর জন্যে। করমণ্ডলের চাষীরা অনেক সময়ই জমিতে বেশি করে বাণিজ্যিক পণ্য তুলা বুনত যাতে করে সে সেই তুলো বিক্রি করে রাষ্ট্রের চাহিদা মেটাতে পারে। এবং টাকায় রাজস্ব সংগ্রহের চাহিদা অবশ্যই মহাজনি ও গ্রামের ব্যবসায়ীদের ভূমিকা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং উদ্বৃত্ত সামাজিক সম্পদে তারাও তাদের ভাগকে বাড়িয়ে নিত। সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে বহু দস্তুর-ই-আমলে গ্রামের জমিদারি ব্যবস্থায় ভাঙন ও ইজারাদারি ব্যবস্থার উদ্ভব প্রসঙ্গে এদের কথা বলা হয়েছে। তাই এই শোষণের রূপে আমরা বাণিজ্যিক মূলধন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর এক ধরনের গাঁটছড়া দেখতে পাচ্ছি।

সাম্প্রতিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, ইয়োরোপীয় আমদানিকৃত দ্রব্যের

সীমিত চাহিদা ছিল। ভেনিসের জিনিস, উলের কাপড়চোপড় ইত্যাদি মুঘল সামন্তরা পছন্দ করতেন। সিংহলের হাতি বা মোখার কফিরও চাহিদা ছিল রাজদরবার ও অভিজাতদের কাছে। ইতিহাসজ্ঞরা এমনও ইঙ্গিত করেছেন যে, সপ্তদশ শতকের শেষে মনসবদারদের জীবনযাত্রার মান ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল এবং ফলত টাকার জন্যে তাদের খাঁইও বাড়ছিল।

এই বহির্বাণিজ্যের সঙ্গে তাল রেখে সোনা আমদানি হতো ভারতে এবং তার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যেত। দামের ওঠানামার সঙ্গে মুঘল কৃষি-অর্থনীতির সংকটে কোনো যোগ ছিল কিনা, ভাববার বিষয়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষদিকে মুদ্রার সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এর সঙ্গে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বর্ণ আমদানি ও যুদ্ধের খাতিরে আওরঙ্গজেবের রাজভাণ্ডার শূন্য করার নীতিকে দায়ী করা হয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিসের দাম বাড়বে। ফলে, সৈন্যের পেছনে খরচা ও নিজের জন্যে খরচাও বাড়বে। অর্থাৎ মনসবদাররা আরো বেশি করে 'হাসিল' করতে চাইবে। 'জায়গিরদারি' সংকটের পেছনে বাজারে মুদ্রাস্ফীতির কোনো সম্ভাব্য ভূমিকা আছে কিনা, ভাববার কথা।

আবার, ভারতীয় সামুদ্রিক বণিকদের ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের রাষ্ট্রের ওপর চরম নির্ভরশীলতা সত্যিই লক্ষণীয়। নগরের ও বাণিজ্যের স্বতন্ত্র অধিকারের সনদ নিয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বণিককুলের সশস্ত্র সংগ্রামের কাহিনী ভারতীয় ইতিহাসে নেই। রাষ্ট্রীয় রাজস্বের চাপে বাণিজ্যকরণ এবং তার পরে নির্ভরশীল হয়েছিল ভারতীয় বণিকদের সমৃদ্ধি—এটা একটা কারণ হতে পারে। আবার, ভারতীয় সামুদ্রিক ও নগর-বণিকদের সঙ্গে ভারতীয় গ্রামীণ উৎপাদনের খুব সরাসরি যোগ ছিল না। ফলে, সংঘর্ষের সামাজিক ভিত্তিও বণিকদের দিক দিয়ে মজবুত ছিল না। তাই, বাণিজ্যের প্রসার ও নানা ধরনের বাণিজ্যিক কৃষি-পণ্যের চাহিদা মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা 'জবত'কে প্রসারিত করেছিল। জগৎ শেঠ প্রভৃতির মতো মহাজনদের কাজ ছিল আঞ্চলিক সামন্তদের রাজস্ব নিজেদের হুণ্ডির মাধ্যমে রাজকোষে জমা দেওয়া ও তার পরিবর্তে বাট্টা নেওয়া। মুদ্রা-অর্থনীতি ও বাণিজ্যের প্রসার তাই রাষ্ট্রীয় সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকেই সুদৃঢ় করেছিল।

প্রসংগত মনে রাখতে হবে যে, বাণিজ্যিক পুঁজি ও ধনতান্ত্রিক শিল্পে নিয়োজিত মূলধনে গুণগত প্রভেদ আছে। ভারতীয় বৃহৎ বণিকদের পুঁজি মূলত বিনিময় ক্ষেত্রেই সঞ্চালিত হয়েছে। বিভিন্ন বাজারের জিনিসের দামের প্রভেদ এবং চাহিদা ও জোগানের খেলাকে ব্যবহার করে বণিকরা তাদের পুঁজিকে বাড়াত। কিন্তু এই পুঁজি উৎপাদন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত ও সংগঠিত উপায়ে বিনিয়োগ করা হয়নি। অর্থাৎ পুঁজি প্রকৃত অর্থে মূলধনে রূপান্তরিত হয়নি, চক্রাবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদিকা শক্তির গুণগত পরিবর্তন সাধনে এই পুঁজির

কোনো ভূমিকা ছিল না। ফলে সামন্তশক্তির নিজস্ব লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বণিকরা স্বতন্ত্র কোনো ভূমিকা নিতে পারেনি। দুটি ধরনের রাষ্ট্র কাঠামোর সঙ্গেই তারা মোটামুটি সমঝোতা করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। বুজি বোহরা বা জগৎ শেঠের অর্থের অভাব ছিল না, বরং বাণিজ্যও মুঘল আমলে পুরোদমে চলেছে। কিন্তু কৃষিসমাজের দ্বন্দ্ব ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বৈশিষ্ট্যের জন্যে বাণিজ্যিক পুঁজির বিকাশ ধনতন্ত্রের সূচনা করেনি।[৫]

এদিক থেকে বিচার করলে, মুঘল আমলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বীজ যে ভারতে বিস্তার লাভ করছিল তা বলা যায় না। সুসংগঠিত আমলাতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্রই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তার ফলে বাজার, মুদ্রা ও নগরের পরিবর্ধন হয়েছিল এবং সেগুলো আবার সেই আমলাতন্ত্রকে জোরদার করতে সহায়তা করেছিল। কিন্তু এই আমলাতন্ত্রের সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল ভূমিজ ক্ষুদে সামন্তদের সংঘর্ষ ও সমঝোতা অহরহ চলছিল। কৃষক বিদ্রোহের ঝড় শেষ পর্যন্ত এই দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে তুলল। একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়ে ক্ষুদে ভুঁইয়াদের বিক্ষোভ ও সাধারণ কৃষকদের প্রতিরোধ একই সময়ে যুক্ত হলো। জায়গিরদারি সংকটের জন্যে মুঘল মনসবদারদের অভ্যন্তরীণ বিরোধও তীব্র হলো। ফলে, মুঘল আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাইরের প্রতিরোধ আন্দোলনের ধাক্কা সহ্য করতে পারল না। তার জায়গায় আঞ্চলিক ক্ষমতাগুলো কায়েম হলো।

আধুনিক ভারতের ইতিহাসের ঐতিহ্য বিচারে এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার তাৎপর্য বুঝতে হবে এবং কয়েকভাগে আমরা তার আলোচনা করব; যথা, ক. রাজনৈতিক ক্ষেত্র, খ. অর্থনীতির জগৎ, গ. কৃষক বিদ্রোহের ধারা।

ক. রাজনৈতিক ক্ষেত্র ॥ এটা মনে রাখা দরকার যে, মুঘল আমলের শাসনতান্ত্রিক ঐক্য ও ভারতীয় অর্থনীতিকে একটি সুদৃঢ় বন্ধনের আওতায় বাঁধার চেষ্টা করে ভারতীয় সমাজের নানা স্তরের লোককে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। কতকগুলো বিক্ষিপ্ত উদাহরণ দেওয়া যাক। মাহাদজি সিন্ধিয়া আঞ্চলিক সামন্তদের একজন প্রতিভূ। তিনি প্রথমে মির্জা নজফ খানের অনুচরদের কবল থেকে ও পরে রোহিলা সর্দার গুলাম কাদিরের হাত থেকে অন্ধ, হতাশ ও নিপীড়িত শাহ আলমকে রক্ষা করেন। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজে সম্রাট না হয়ে দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে প্রধান উজিরের পদকে স্বীকার করে নিয়ে নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করছেন। এবং ১০ বছর ধরে সেই পদেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। অশক্ত দিল্লির সম্রাটের আনুষ্ঠানিক অনুগ্রহের মহিমা তখনো এত বিপুল।

আবার, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রতিনিধি লর্ড লেকের আচরণও বিচার করা যেতে পারে। ওয়েলেসলির সময় থেকেই সরকারি ইংরেজি চিঠিপত্রে

শাহ আলমকে 'সম্রাট' বলে অভিহিত করার রীতি উঠে যায়। আবার, লর্ড লেক নিজে খুবই কাঠখোট্টা প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর নিজের মধ্যে কল্পনার ছাপ মাত্র ছিল না। ১৮০৩ সনে অন্ধ ও বৃদ্ধ শাহ আলমের অবস্থা মুঘল সাম্রাজ্যের পুরনো গরিমার কথা বারবার বিজয়ী সেনাপতি লর্ড লেককে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে। রসকষহীন লর্ড লেকের চিঠিগুলো শাহ আলমের বর্ণনায় আবেগাপ্লুত হয়ে উঠেছিল। আরো পরে, ভারতীয় কৃষকরা ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহে জড়পুতুল বাহাদুর শাহের নাম করেই কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ধ্বজা তুলেছিল। এর মানে অবশ্য এই নয় যে, ভারতীয় কৃষকদের সঙ্গে মুঘল রাষ্ট্রের কোনো বিরোধ ছিল না। বরং আমরা জানি ঘটনা তার বিপরীত। কিন্তু কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে পাল্টা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বলতে তাদের কাছে মুঘল শাসনব্যবস্থাই আদর্শ ছিল। সামন্তরাও তার নামেই জিগির তুলেছিল। উৎপাদন ব্যবস্থায় জড়িত পিছিয়ে-পড়া মানসিকতার অধিকারী ক্ষুদ্র কৃষকরা তাই মুঘল শাসনের ঐতিহ্যকেই ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে ব্যবহার করেছিল। সেই ঐতিহাসিক ক্ষণে তাদের কাছে অন্য কোনো উন্নত ব্যবস্থার ধারণা করা সম্ভব ছিল না। তাই মুঘল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সুসংবদ্ধতা সমাজের রাজনৈতিক চেতনায় কোনো-না কোনো ভাবে একটা ছাপ ফেলেছিল, একথা অনস্বীকার্য।

খ. অর্থনীতির জগৎ ॥ আঞ্চলিক শক্তির অবস্থিতি ও আঞ্চলিক অর্থনীতির সঙ্গে কেন্দ্রীভূত অর্থনীতির দ্বন্দ্ব আজও ভারতের শ্রেণীদ্বন্দ্বের অন্যতম মূলদিক। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ তার নিজের স্বার্থেই স্থানীয় সামন্তদের নিজেদের অধীনে জীইয়ে রেখেছিল, বদলেও দিয়েছিল, তবে একেবারে নিশ্চিহ্ন করেনি। পরে নতুন কতকগুলো শক্তি আরো অনেক পরিবর্তন এনেছে। কিন্তু ভারতের গ্রামাঞ্চলে কায়েমি ভূমিজ স্বার্থরা আজও শক্তিমান। তাদের প্রকৃতির সঙ্গে মুঘল আমলের ক্ষুদে ভূঁইয়াদের পার্থক্য নিশ্চয় অনেক। কিন্তু খাদ্যশস্যের দাম নির্ধারণে, কৃষিজাত পণ্যের বাজার সুরক্ষায় বা বাজেটে নিজেদের কোলে ঝোল টানার প্রচেষ্টার—এই স্বার্থগোষ্ঠী ভারতীয় বৃহৎ শিল্প পুঁজিপতিদের সঙ্গে এক ধরনের অহরহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এই ধরনের দ্বন্দ্বের আবর্তন বা পুনরাবর্তনের অস্তিত্ব মুঘল আমলের সামন্তবাদের দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতা কিনা, বা সে ধারাবাহিকতা বজায় থাকাটা আধা-সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির অস্তিত্বকে প্রমাণ করে কিনা, সে বিষয়ে বিশদ আলোচনার দায়িত্ব আধুনিক ভারতের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণারত বুদ্ধিজীবীদের। এছাড়া, রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত কর্মীরা আরো ভালোভাবে এ বিষয়ে বলতে পারবেন।

গ. কৃষক-বিদ্রোহের ধারা ॥ কৃষক-বিদ্রোহের ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে বলতে পারি যে, ঔপনিবেশিক শাসনে আমরা যে অজস্র কৃষক-বিদ্রোহ দেখতে পাই,

তার একটি ধারাবাহিকতা মুঘল আমলে, চাই কি আরো আগে, সুলতানি আমল (মহম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনকালে দোয়াবের কৃষক-বিদ্রোহ) থেকেই ছিল। অবশ্য ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কৃষক-আন্দোলনে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। কারণ, কোম্পানির শোষণ বা মহারাণীর আমলে ব্রিটিশ শিল্প-পুঁজির শোষণ এবং মুঘল রাষ্ট্রযন্ত্রের শোষণের মধ্যে পার্থক্য অনেক। ঔপনিবেশিক আমলে রাষ্ট্র কাঠামোয় ত্রিমূর্তির সমন্বয় হলো। সরকার, সাহুকার ও জমিদারদের জোট সেখানে অনেক বেশি সুদৃঢ়। ফলে বিদ্রোহের গভীরতা ও ব্যাপকতাও বেশি, মহাজন-বিরোধী আন্দোলন অনেক সুস্পষ্ট। বিভিন্ন ঢেউয়ের মতো কৃষক আন্দোলনগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে এবং একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছে। তবুও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের প্রতিরোধ আন্দোলনে মুঘল আমলের কৃষক-বিদ্রোহের ঐতিহ্য নানাভাবে কিছুটা অনুসৃত হয়েছে। এই বিষয়ও বিশদ আলোচনাযোগ্য, তবে বর্তমান প্রসঙ্গে কতকগুলো বিক্ষিপ্ত উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে।

উড়িষ্যার খুর্দা পাইক-বিদ্রোহের নেতা বখশি জগবন্ধুর অভাব-অভিযোগ সংবলিত পত্রের সঙ্গে মুঘল আমলের পাইক-বিদ্রোহের নেতা সনাতন সর্দারের দাবিদাওয়ার এক মিল পাওয়া যায়। যেমন—"মেজর ফ্লেচার আমাদের সমস্ত দাবি অগ্রাহ্য করেছেন এবং আমাদের সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করেছেন। আমাদের একটা বোরখাও নেই, বা এক বিঘা জমিও নেই।…সমস্ত অঞ্চল ইজারাদারদের দেওয়া হয়েছে। যেখানে সম্পদ পাঁচটাকার, সেখানে ইজারাদাররা পনের টাকা দাবি করছে। রায়তদের অবস্থা এত অসহনীয় যে তারা শুধু জল ও গাছের শিকড় খেয়ে আছে এবং তাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই জল খাবার একটি পাত্র আছে।"[৬]

পাইকদের নিষ্কর জমিতে বংশানুক্রমিক স্বত্ব ফিরিয়ে দেওয়া ও সাধারণ রায়তদের অত্যাচার বন্ধ করার দাবিতেই পাইক-বিদ্রোহ হয়।

মেদিনীপুরের চুয়াড়-বিদ্রোহও অনুরূপভাবে জঙ্গলমহলের ওপর খাজনা চাপানো ও তহশিলদার পাঠানো এবং পাইকদের নিষ্কর জমি বাতিল করা ইত্যাদি কারণ থেকেই জন্ম নিয়েছিল। প্রাথমিক যুগের ঔপনিবেশিক-বিরোধী বিদ্রোহ নানা কারণে জমিদারদের ভূমিকা ও নেতৃত্বও লক্ষণীয়। চুয়াড়-বিদ্রোহে জমিদার দুর্জন সিংহ ও কর্ণগড়ের রানী শিরোমণির সহযোগিতা বিশেষভাবে কাজ করেছিল, কারণ তখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিপ্রেক্ষিতে পুরনো জমিদার-দের মধ্যে যাঁরা নিজেদের জমিদারি স্বত্ব হারাচ্ছিলেন তাঁরা প্রজাবিদ্রোহে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।[৭] তারও আগে রংপুর বিদ্রোহেও কৃষক-আন্দোলনে উৎপীড়িত জমিদারদের ভূমিকা দেখি। রাজবংশী কবি রতিরাম দাস

বিরচিত রংপুরের জাগের-গানে ইটাকুমারীর বৈদ্য জমিদার শিবচন্দ্র ও অন্যান্য নিপীড়িত জমিদাররা দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রায়তদের প্রতিরোধ-আন্দোলনে শলা-পরামর্শ দিচ্ছেন—এমন ইঙ্গিত আছে।[৮] রংপুর বিদ্রোহের অন্যতম নেতা মণ্ডল দিরজি নারায়ণ। তাঁকে নেতা নির্বাচনের অন্যতম সম্ভাব্য কারণ এই যে, তাঁর পূর্বপুরুষ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অনুরূপ একটি কৃষক-প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৯]

এছাড়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে তথাকথিত 'বেআইনি' নুনের ব্যবসা, হাট বা গঞ্জ বসানোর অধিকার ইত্যাদি নিয়ে মুঘল জমিদারদের সঙ্গে ইংরেজদের রেষারেষির অন্ত ছিল না এবং জমিদাররা এসময় নিজেদের স্বার্থেই তা মলঙ্গি ইত্যাদির প্রতিরোধ-আন্দোলনে নানাভাবে মদত দিয়েছে।[১০]

অসহ্য অত্যাচারের মুখে গোষ্ঠীগতভাবে অন্য জায়গায় যাবার কথা বিশ শতকে পাওয়া যায়। ১৯৩০ সনে গুজরাটের কয়রা জেলায় আন্দোলনের সময় পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে দলে দলে পাশের অঞ্চল বরোদায় গিয়েছিল। এই রকম চলে যাওয়াকে বলা হতো হিজরৎ। কংগ্রেস সংগঠনের সক্রিয় নেতৃত্বে ৬৬টি গ্রাম থেকে প্রায় ১৫,৪২৪ লোক এইরকম হিজরতে গিয়েছিল।[১১]

ঔপনিবেশিক শাসনে অবশ্য এইরকম যাবার মধ্যে অসহায়ত্বের ভাব বেশি ছিল, কারণ জমির উপর চাপ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল ও পালিয়ে যাবার জায়গাও হ্রাস পায়। উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত দ্বারভাঙ্গার রায়তরা খাজনা বেশি হলে জঙ্গলে পালিয়ে যেত। কিন্তু বিংশ শতকে সে সুযোগ ছিল না, কারণ আবাদি জমি অনেক বেড়ে গিয়েছিল।[১২] তথাপি অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে রাজার কাছে আবেদনের মূল ধারাটা অক্ষুন্ন থেকে গেছে। "মহাবীর রাজা কর ভাঁড়ু দত্ত লইয়া" বা "ভাঁড়ু যত পীড়া করে কে তাহা সহিতে পারে, না জানি পলাইয়া যাব কথি" ইত্যাদি বাক্যাংশের মধ্যে এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করার আভাস আমরা দেখতে পাই। ব্রিটিশ শাসনকালে এই জাতীয় আবেদনের মধ্যে হতাশ বা কাকুতি-মিনতির ছাপ অনেক বেশি। তবে আবেদনের পদ্ধতি একই থেকে যায়।

সাঁওতাল পরগনার ভূস্বামী বনাইয়ের রাজা ইন্দ্রনারায়ণ দে-ও নানা ধরনের আবওয়াব ও বেগারের দ্বারা কৃষকদের জর্জরিত করে ফেলেছিল। সেই অঞ্চলের কৃষকরা ঘটিবাটি বিক্রি করে ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিশ সরকার বাহাদুরের কাছে আবেদন করতে এসেছে। তাদের আবেদনের ভাষা এরকম—"আমাদের মতো গরিব ও অসহায় রায়তরা বুঝতে পারছে না কি করে রাজার এরকম নিষ্ঠুর ক্রিয়াকলাপ দয়ালু ও নিরপেক্ষ সরকারেরর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না··· শেষ উপায় হিসেবে অনেক খরচার পর আমরা গরিব কৃষকরা সরকার বাহাদুরের সমীপে এসেছি···বনাই রাজা জানতে পারলে প্রবল অত্যাচার করবে এবং তাতে

আমাদের মতো গরিব নিরুপায় কৃষকদের ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।"[১৩]

এই আবেদন অত্যাচারী জায়গিরদার ও জমিদারের বিরুদ্ধে মুঘল রাষ্ট্রের কাছে কৃষকদের আর্জির সঙ্গেই তুলনীয়। একথা অবশ্য কখনোই যেন না মনে হয় যে ব্রিটিশ শাসনে কৃষকরা শুধুমাত্র আবেদন-নিবেদন করেছে। মারদাঙ্গার উদাহরণ প্রচুর আছে এবং সেই বিক্ষোভগুলিতে প্রচলিত ব্যবহারবিধি উল্টে দেবার নিদর্শনও আছে।

নীলকর বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি প্রাসঙ্গিক দলিলের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কুমিল্লার ব্রাহ্মণবেড়িয়া অঞ্চলে একানগর গ্রামে নীলকর ওয়াইস-এর (Wise) বিরুদ্ধে তিন বছর ধরে কৃষক-বিদ্রোহ চলেছিল। বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় একটি সরেজমিন তদন্ত করেছিলেন। মনে রাখতে হবে যে, এ আন্দোলন শুধুমাত্র নীলের দাদন নেবার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি, বরং নীলকর-জমিদার ওয়াইসের খাজনার হার বৃদ্ধির বিরুদ্ধেই এই আন্দোলনের বর্শামুখ ধাবিত ছিল। সেখানে ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় তদন্তে আসতেই কৃষকরা সপরিবারে জমায়েত হলো এবং নীলকরদের বংশ তুলে শ-কার ব-কার গালাগাল দিতে লাগল।

বাবুর ভাষায়—"তারা নীলকরদের অকথ্য গালাগাল দিতে লাগল… প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখপাত্র, তাদের আচরণে ও কথাবার্তায় শিষ্টতা ও শৃংখলা প্রশ্নাতীত… এইসব অভিযোগ এবং তার মাঝে মাঝেই কুঠির অনুগত লোকদের প্রতি অকথ্য গালিগালাজ বর্ষণ করা হলো। ওয়াইস-এর দু'জন লোক আমার সঙ্গে ছিল। কিন্তু তারা মুখ খুলতে ভরসা পেল না।"[১৪]

গোলমাল মিটিয়ে ফেলবার অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, তারা ওয়াইস ও তার চাকরদের সরকারি কর্মচারির তুল্য সম্মান করবে ও গালাগালি দিতে পারবে না। এখানে খুব স্পষ্ট যে, বিদ্রোহের সঙ্গে কৃষকদের ব্যবহারবিধি পাল্টে গেছে, গৃহীত সম্বোধনের রীতি ভঙ্গ করে কৃষকরা বাছা-বাছা শব্দ প্রয়োগ করছে। বাবুর বা নীলকরদের চোখে কৃষকদের এরকম ব্যবহার শিষ্টতা বহির্ভূত। ফলে মিটমাটের শর্ত হিসেবে 'ভদ্র ব্যবহারবিধি' ফিরিয়ে আনা গুরুত্ব পাচ্ছে। বিদ্রোহের সঙ্গে ব্যবহারবিধি পাল্টে যাওয়া স্বাভাবিক। এদিক থেকে মুঘল-যুগের কৃষক-বিদ্রোহের চেতনা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ যুগের কৃষক-বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় বিদ্রোহী কৃষক-নেতাদের চেতনাতেও। প্রাথমিক প্রতিরোধ-আন্দোলনে ইজারাদার প্রভৃতিদের বিরুদ্ধেই কৃষকরা বিদ্রোহের বর্শামুখ ধাবিত করেছিল এবং যে ন্যায়নীতির দোহাই পেড়েছিল, তার পেছনে ছিল মুঘলরাষ্ট্র সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ধারণা। অত্যাচারী ইজারাদারকে মুঘলরাষ্ট্র কৃষক-বিদ্রোহের চাপে সময় সময় অপসারিত করত। তাই গ্রাম্য

কবি রতিরামের চোখে বিষ্ণুর প্রসাদে রাজ্য পেয়ে ইংরেজ কোম্পানি সুবিচার করল ও অত্যাচারী দেবী সিংহের বিরুদ্ধে তদন্ত করল এবং তাকে আটকে রাখল। বখশি জগবন্ধুও মুঘলরাষ্ট্রের নীতি অনুসরণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে যে, আগে জঙ্গলে পালালে মুঘলরা তদন্তের জন্যে 'ভকিল' পাঠাত। তাই তারা চাষবাস বন্ধ করে ইংরেজ শাসনের সঙ্গে অসহযোগিতা করল, যাতে করে কোম্পানি তাদের অভাব-অভিযোগের দিকে দৃষ্টিপাত করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে সরাসরি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। ইংরেজ প্রেরিত নতুন কমিশনার বিদ্রোহী নেতার কাছে মুঘলরাষ্ট্র প্রেরিত প্রতিনিধির ভূমিকাতেই এসেছেন। সুতরাং ঔপনিবেশিক আমলে কৃষক-বিদ্রোহের একেবারে প্রাথমিক স্তরে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বিদ্রোহের নেতারা মুঘলরাষ্ট্রের অনুজ শাসন-ব্যবস্থা হিসাবে অনেক সময় মনে করত এবং সেইভাবেই কোনো কোনো সময়ে বিদ্রোহ পরিচালিত করেছে। ঔপনিবেশিক শোষণের তীব্রতা ও রূপান্তর, সবশেষে জাতীয়তাবাদ ও সাম্যবাদ বিদ্রোহের নেতাদের চেতনাকে পরে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল।

স্থান ও কালের মধ্যে প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও কিছু সময়ে বিদ্রোহী ঐতিহ্য ফিরে আসে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ছত্রিশগডের চামারদের মধ্যে ঘাসি দাস সৎনামি ধর্ম প্রচার করেন।[১৫] কথিত আছে, তিনি উত্তর-ভারতের সৎনামি সম্প্রদায়ের মত থেকেই নিজের ধর্ম প্রচার করেন। ব্রাহ্মণ ও ঠাকুরদের সামাজিক প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে চামারদের বিক্ষোভ ছিল। তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল বেগার ও খাজনার বিরুদ্ধে চামার প্রজাদের ক্ষোভ। এই উনিশ শতকের শেষভাগে চামার কৃষক ও মজুর গোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ এই সৎনামি আন্দোলনে রূপায়িত হয়। এক্ষেত্রে নিম্নবর্গের প্রতিবাদী আন্দোলনে মুঘলযুগের ঐতিহ্যের সঙ্গে উনিশ শতকের ঐতিহ্যের যোগসূত্র থাকলেও থাকতে পারে।

সবশেষে বোধহয় আর একটি কথা বলা দরকার। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারের পটভূমিতে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রাজপুত সর্দার দুর্গাদাস বা রাজসিংহকেই মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের নায়ক করে হিন্দু সাজাত্যবোধের ঐতিহাসিক ভিত্তি দিতে চেয়েছিলেন এবং যদুনাথ সরকার তাঁর রচনায় দুর্গাদাসকে রাজপুত শৌর্যের শ্রেষ্ঠ পুষ্প বলে অভিহিত করেছেন। এইসব দাবির ঐতিহাসিক যথার্থতার বিচারে না গিয়েও আমরা বলতে পারি যে, আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের উদ্দীপনা ও চেতনার জন্যে প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলের প্রতিরোধ আন্দোলনের যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যবহার করা হয়েছে তার নায়করা বেশির ভাগই হিন্দু সামন্তপ্রভু—প্রতাপাদিত্য, প্রতাপসিংহ, শিবাজী বা রাজসিংহ—এদের

ওপরেই ইতিহাসের আলো গিয়ে পড়েছে। এরকম হওয়ার পেছনে যথেষ্ট কারণও আছে। কিন্তু মুঘল আমলে প্রতিরোধ আন্দোলনের আর একটি গণমুখী ধারা আছে। সেই ধারার নায়ক এক সনাতন সর্দার, এক গরিবদাস হাডা বা বান্দা বাহাদুর বা দাসি কুর্মি।

একথা ঠিক যে, এদের একক কর্মধারা সম্পর্কে তথ্য কম থাকবে। কারণ, ঐতিহাসিক উপাদানের প্রতুলতা বা অপ্রতুলতাও সামাজিক প্রক্রিয়া জাত। কিন্তু ইতিহাসে বিক্ষিপ্তভাবে নিম্নবর্গের লোকদের সমর্থনপুষ্ট আন্দোলনের সামগ্রিক আভাস পাওয়া অসম্ভব নয়। সে আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় দুর্ভিক্ষের সময় শহরের অধিবাসীদের খাদ্যের দাবিতে হাঙ্গামার কথায়। তার রূপ পাওয়া যায় ফৌজদারের অত্যাচারে পীড়িত ক্ষুদে বণিকদের হরতাল বা প্রতিবাদ-মিছিলের মধ্যে।[১৬] তার স্ফুরণ দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে কৃষক ও প্রাথমিক জমিদারদের সশস্ত্র গণবিদ্রোহে। মুঘলযুগের এইসব গণবিদ্রোহের নায়ক বান্দা বাহাদুর, সনাতন পাইক বা দাসি কুর্মির সরাসরি ঐতিহ্যবাহী অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতে বখশি জগবন্ধু বা কেনা সরকার। বিশ শতকে সেই ঐতিহ্য নব রূপান্তরে জাতীয় আন্দোলনে বাবা রামচন্দ্র বা মাদারি পাসির মধ্যে পাওয়া যাবে। ১৯৪৭ সনের পরবর্তী ভারতে নতুন স্তরের আন্দোলনের মধ্যে আমরা সেই প্রতিরোধের অনুসরণ খুঁজে পাই এক ভেমপাতু সত্যনারায়ণ, কিম্বা গৌড়. পুল্লা ভুমাইয়া, অথবা এক বাবুলাল বিশ্বকর্মার মধ্যে।

শে ষ ক থা ?

সহৃদয় পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, বহু প্রশ্নের জবাব দেওয়া হলো না। ফাঁক রয়ে গেল। যেমন, যদি মুঘলরাষ্ট্রের রাজস্বের হার অতই বেশি হবে, তবে সম্পূর্ণ খুদ-কশত রায়ৎ বা 'হালে মির'দের অস্তিত্ব কিভাবে অষ্টাদশ শতকে অতটা স্বচ্ছল ছিল ? আবার, অন্তর্বাণিজ্যের সঙ্গে বহির্বাণিজ্যের যোগাযোগের ছবি ততটা পরিষ্কার নয়। আর্মেনিয়ান বণিকদের ওপর কোনো গবেষণা সে ছবিকে হয়তো আগামী কিছুদিনের মধ্যেই পরিষ্কার করবে। পঞ্চদশ শতকে পোর্তুগিজ বাণিজ্য থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের স্থানীয় বাণিজ্য নিয়ে নতুন তথ্য সংগ্রহে রত হয়েছেন তরুণ গবেষকরা। হারিকেলের মুদ্রার আলোচনা হয়তো আদি-মধ্যযুগের বাংলা দেশ সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে অনেকাংশেই বদলে দেবে।

অষ্টাদশ শতকের আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলির অর্থনীতি ও সমাজ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। সেগুলোর ফলাফল আমাদের মুঘল-সাম্রাজ্যের পতনের প্রক্রিয়ার পরে

দেশীয় সমাজে নতুন শক্তির বিকাশের কোনো সম্ভাবনা ছিল কিনা বুঝতে হয়তো আরো সাহায্য করবে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ নিয়েও উৎসুক হয়ে উঠেছেন তরুণ ইতিহাস লেখকরা। কাজ হয়েছে সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলা দেশের স্থাপত্যের ওপর, রাজপুত ও কাংড়া চিত্রকলার ওপর। সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভারতচন্দ্রের মানসিকতা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ও প্রচার এবং সামাজিক ভূমিকা নিয়ে গবেষণাও শুরু হয়েছে।

আবার, আজও মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায় নিয়ে যতটা আলোচনা হয়েছে, গোড়ার দিক নিয়ে আলোচনা নিতান্তই স্বল্প। আকবরের ওপর সর্বাঙ্গীণ একটা জীবনী লেখার প্রয়োজন আমি উপলব্‌ধি করি। আনন্দের বিষয়, গত দু-দশক ধরে প্রাক ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাস রচনার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। প্রতি বছরই কিছু-না কিছু নতুন তথ্য সংবলিত প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। তাই আজকে যে প্রশ্নের জবাব দেওয়া গেল না, অথবা আলোচনায় স্ববিরোধিতা রইল—সেগুলোর সমাধান আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমার সহকর্মী ও বন্ধুরা বা ছাত্ররা তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে সম্ভব করে তুলবেন। আমাদের বর্তমান জ্ঞানের ঘাটতি সম্পর্কে তাই অবহিত থাকা সত্ত্বেও এই আশা নিয়েই অসম্পূর্ণ বইখানি লেখা হয়েছে এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ক্ষীণ চেষ্টা করা গেছে।

প রি শি ষ্ট : ১

জমিতে রাজস্বের পরিমাণ নির্ণয় করা আরেকটি স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। এই সম্পর্কে নীতি আলোচ্য সময়ে যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে। সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বোধহয় বলা দরকার। 'গল্লে-বখশি' বা শস্য উৎপাদিত হলে ভাগাভাগি করে নেওয়ার একটা ব্যবস্থা ছিল। কৃষকরা এই ব্যবস্থা পছন্দ করত, কারণ এতে তাদের অজন্মা জনিত ঝামেলা অনেক কম পোহাতে হতো। কিন্তু যেহেতু এই ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ছিল, শাসনব্যবস্থা এর পক্ষপাতী ছিল না। জমি ও শস্য পরিমাপের সবচেয়ে সোজাসুজি ব্যবস্থা ছিল হসত্ ও বুদ্। অর্থাৎ সরাসরি সরকারি আমলা গিয়ে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জমির পরিমাপ করে একটি সামগ্রিক উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করত এবং তার ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারিত হতো। অনেক সময় লাঙলের ভিত্তিতেও রাজস্ব নির্ধারিত হতো। আরেকটি ব্যবস্থার নাম ছিল 'কানকুথ' বা 'দানাবন্দী'। এতে করে প্রথমে নির্ধারিত জমি মাপা হতো। পরে সেই জমিতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাপ নির্ণয় করে, সেই হার সেই নির্ধারিত শস্য উৎপন্নকারী জমিগুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে রাজস্ব নির্ণয় করা হতো।

কিন্তু মুঘল শাসনব্যবস্থায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নির্ণয় পদ্ধতি হচ্ছে 'জব্‌ত'। এই ব্যবস্থার বীজ শের শাহের আমলে উপ্ত হলেও তোডরমলের রাজস্বনীতি

একে পরিপূর্ণ রূপ দেয়। এটাই হলো বিখ্যাত 'আইন-ই-দহসালা'। শেরশাহের আমলে জমিকে উৎপাদন ক্ষমতা হিসেবে তিন ভাগে ভাগ করা হতো—ভালো, মাঝারি ও খারাপ। তারপরে প্রতি শস্যে এই তিন ধরনের জমির উৎপাদন ক্ষমতার গড়পড়তা হিসেব করে গড়পড়তা উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ সাধারণত রাষ্ট্রের রাজস্ব বলে নির্ধারিত হতো এবং এর সঙ্গে সঙ্গে একটি আর্থিক মূল্যমানও বেঁধে দেওয়া হতো। এর নাম ছিল 'দস্তুর'। কিন্তু বিভিন্ন সুবায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 'দস্তুর' চালু থাকার ফলে প্রচুর অসুবিধে দেখা যায়। ফলে 'জবত' ব্যবস্থাকে পূর্ণরূপ দেবার চেষ্টা করা হয়। ইতিহাসবিদ মোরল্যাণ্ড এই ব্যবস্থাকে বর্ণনা করেছেন ১০ বছরের উৎপন্ন শস্যের মূল্যমানের গড়পড়তা হার হিসেবে রাষ্ট্রের রাজস্ব নির্ণয় করা।

আবুল ফজল লিখেছেন, "এই নতুন ব্যবস্থায় উত্তরণের মূলকথা হলো এই যে প্রত্যেক পরগনায় উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর (অর্থাৎ জমির বিভিন্ন ভাগ) এবং দামের স্তর নির্ণয় করে ১০ বছরের অবস্থার পরিমাপ নেওয়া হলো এবং তার ১০ ভাগ তার বার্ষিক রাজস্ব হিসেবে ঠিক করল।"—(আইন-ই-আকবরী, ব্লকম্যান সম্পাদিত। পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৮২-৮৩)। অর্থাৎ প্রথমে প্রত্যেক জায়গার জন্যে গত ১০ বছরের উৎপাদনের হারের গড়পড়তা হিসেব করে শস্যের উৎপাদনের হার নির্ণয় করা হলো। তারপরে গত ১০ বছরের শস্যের গড়পড়তা আর্থিক মূল্যমান শস্যের প্রকৃত উৎপাদনের হারের সঙ্গে সমতা রেখে ঠিক করা হলো। এটাই হলো সেই অঞ্চলের দস্তুর। এখন সমস্ত অঞ্চলের উৎপাদিত শস্যের গড়পড়তা হারকে এই দস্তুর দিয়ে গুণ করে 'জমা-ই-দহসালা' নির্ধারিত হলো। সমস্ত রাজস্বের মূল্য নির্ধারিত হতো শস্যের আর্থিক মূল্যমানে। উত্তরভারতের সমতলভূমি এই জবত-ব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল। জবত-ব্যবস্থায় তাহলে তিনটি স্তর ছিল; ভূমির পরিমাপ করা, শস্যের উৎপাদনের হার নির্দিষ্ট করা, এবং মূল্যমানের হারে রূপান্তরিত করে রাজস্বের দাবি ঠিক করা।

আরেক ধরনের রাজস্বব্যবস্থা 'নসক্'-এর প্রকৃতি সম্পর্কে খুব নিশ্চিন্ত হওয়া যায়না। খুব সম্ভবত, পরিমাপ ও শস্যবণ্টন ব্যবস্থার মাঝামাঝি কোনো একটি উপায়ের নাম 'নসক্'। নসকের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হলো এই যে, এর নির্ধারিত মাপকে সময় সময় পুনর্বিবেচনা করার কোনো বন্দোবস্ত ছিল না; অনেকটা স্থায়ী বন্দোবস্তের মতোই থোক রাজস্ব নির্ধারিত হতো। এখন সাধারণত এই সমস্ত ব্যবস্থারই মূল পরিমাপের একক ছিল ব্যক্তিগত কৃষকের জোত। কিন্তু নানারকম অসুবিধার জন্যে অনেক সময়ই গ্রামকে রাজস্ব পরিমাপের প্রাথমিক একক ধরা হতো। দ্বিতীয়ত—কৃষক তার রাজস্ব অর্থে বা শস্যে দিতে পারত। কিন্তু শাসনব্যবস্থা অর্থের মাধ্যমেই রাজস্ব সংগ্রহে আগ্রহী ছিল। তৃতীয়ত—সব ব্যবস্থাতেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দায়দায়িত্ব ছিল কৃষকের উপরেই। কারণ

'জবত' ব্যবস্থাতেও যতদিন পর্যন্ত না নতুন পরিমাপের ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন 'দস্তুর' স্থায়ীভাবেই নির্ধারিত হতো। চতুর্থত—স্থানিক বৈশিষ্ট্যের কথাও মনে রাখতে হবে। যেরকম সুবে বাংলায় 'নসক' ব্যবস্থা চালু ছিল এবং রাজস্বের পরিমাণ কৃষকের পরিবর্তে জমিদারদের ওপরই নির্ধারিত হতো। [তথ্যসূত্র : কেয়ামুদ্দিন আহমেদ—*Aspects of Land Revenue in the Mughal Period* ; R. S. Sharma সম্পাদিত *Land Revenue in India*. Delhi, 1971 ; ইরফান হাবিব —*Agrarian...* ; পূর্বোল্লিখিত, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ; Moreland—পূর্বোল্লিখিত, appendix—2]

সাধারণত রাষ্ট্রের ধার্য কর তিন ধরনের ছিল। কৃষি ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্যের হারকে বিচার করে দেয় করের নাম ছিল 'মাল'। মাল অর্থ ভূমিরাজস্ব। বিভিন্ন কারিগরদের ওপর ধার্য করের নাম ছিল জিহাৎ। পরে এই জিহাৎ ভূমি-রাজস্বের অংশবিশেষ হয়। কারণ তখন ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের জন্যে রাষ্ট্রের আমলাদের অতিরিক্ত খরচার দায় গ্রামের সাধারণ কৃষকদের বহন করতে হতো। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে মালওয়া জিহাৎ এই অর্থেই প্রযুক্ত হতো। বাজার, হাট, বাণিজ্য ইত্যাদি করগুলোকে বলা হতো সয়ের-ই-জিহাৎ।

কিছু বিক্ষিপ্ত উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো যায় যে, এই অতিরিক্ত করগুলো মূল ভূমিরাজস্বের বোঝাকে কিভাবে ভারাক্রান্ত করেছিল। ১৬৯৪ সনে সিয়াকনামায় গণেশপুর গ্রামের জমাবন্দীর বা সামগ্রিক রাজস্ব নিরূপণকে এইভাবে ভাগ করা হয়েছে।

সামগ্রিক জমা—	মাল—	জিহাৎ—	সয়ের জিহাৎ—
১০৬-৯ আনা	৮৮—২ আনা=	৪—৭ আনা=	১৩ টাকা ১৫ আনা
	(৮৩%)	(৩%)	(১৩%)

বাংলা দেশে আকবরের সময় পরগনা আকবরশাহী সরকার আলুমবারের ভূমি-রাজস্বের হিসাব এইরকম—

সামগ্রিক জমা	—	মাল	—	জেহাৎ ও সয়ের জেহাৎ
১৯,৫০৬-৬	—	১৩,৫০৭	—৪-৯—	৫৯৯৯
		(৬৯%)	—	(৩০%)

এইসব করগুলোর বেশির ভাগ আমলাদের ভোগে যেত। সিয়াকনামায় নির্ধারিত করগুলোর মধ্যে আছে—শানাগি (শস্য পাহারা দেওয়ার জন্যে চৌকিদারের আয়), টপ্পাদারি (টপ্পা কর্মচারির দেয় ধার্য), তলবানা (কর প্রাপ্তি স্বীকারের দলিল পাওয়ার জন্যে প্রদত্ত ধার্য) বা সরফ-ই-সিক্কা (অপ্রচলিত বা কমপ্রাপ্ত

মুদ্রায় রাজস্ব দেওয়ার বাট্টা) ইত্যাদি। বাংলা দেশে এই জাতীয় করের মধ্যে আমরা নাম পাই ফোতাদারি বা দিদারি, অর্থাৎ গ্রামে প্রেরিত সরকারি রাজস্ব কর্মচারির প্রাপ্ত ধার্য। কাগজি বা রাজস্বের দলিলপত্র তৈরি করার জন্তে কাগজের খরচাও গ্রামের লোকেদের দিতে হতো। মনে রাখতে হবে, এগুলি সবই আইনসিদ্ধ ধার্য। আবওয়াব বা অসিদ্ধ ধার্য জিহাৎ বা সয়ের জিহাৎ-এর আওতার মধ্যে পড়ে না। একটি হিসাব অনুযায়ী বিবিধ খাতে ধার্যের পরিমাণ ভূমি-রাজস্বের প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ ছিল। (বিশদ আলোচনার জন্তে: N. A. Siddiqi, পূর্বোল্লিখিত ; পৃ. ১৫৪-৬১। সমস্ত সংখ্যাতথ্যের ভগ্নাংশ শতকরা হিসেবের সময় বাদ দেওয়া হয়েছে।)

এই ধার্যের মধ্যে একটি খরচ ছিল সে-বন্দী বা ভাড়াটে পাইকদের খরচা। শস্য কাটার সময় কয়েক মাস বা দিন হিসেবে এই ভাড়াটে পাইক ও সওয়ারদের নেওয়া হতো এবং বর্ষাকালে এদের বরখাস্ত করা হতো। পরবর্তীকালে রচিত দিওয়ান-ই-পসন্দের সংখ্যাতথ্যে আমরা মহল খরচার মধ্যে সাময়িকভাবে নিয়োজিত সে-বন্দীদের পেছনে ব্যয়ের হিসাব পাই এবং সেগুলো গ্রামবাসীদের কাছ থেকেই নেওয়া হতো। একটি হিসাব অনুযায়ী ১৩ হাজার টাকা মহল খরচার মধ্যে সে-বন্দীর পেছনে ব্যয় হতো ৫,৫০০ টাকা, অর্থাৎ মোট খরচার শতকরা ৪২ ভাগ। সে-বন্দীর ব্যবহারের কথা বাবরের আত্মজীবনীতেও আছে। সুতরাং দিওয়ান-ই-পসন্দের সংখ্যাতথ্যকে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করা না গেলেও আমরা মহল খরচায় এবং রাজস্ব আদায়ে সে-বন্দীর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। অর্থাৎ দূর গ্রামেও রাজশক্তি সশস্ত্র ক্ষমতার ওপর কিভাবে নির্ভরশীল ছিল – তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। (দিওয়ান-ই-পসন্দ ; পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৮৪)

প রি শি ষ্ট : ২

মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে বোধহয় কয়েকটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মুঘলরা সারা ভারতে একজাতীয় মুদ্রাব্যবস্থা চালু করলেও সেটা ছিল তিনটি ধাতুর তৈরি—সোনা, রুপো ও তামা। এছাড়া যে কেউ টাঁকশালে ধাতু নিয়ে যেতে পারত এবং একটি নির্দিষ্ট অর্থের পরিবর্তে সেই ধাতুকে মুদ্রায় রূপান্তরিত করতে পারত। ফলে, মুদ্রাগুলো যে ধাতুতে তৈরি হতো তার ওজনই মুদ্রার মূল্যকে নির্ধারিত করত এবং কোন হারে এক ধাতুর মুদ্রার সঙ্গে অন্য ধাতুর মুদ্রার বিনিময় হবে, তা বাজারে সেই ধাতুর মূল্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল; তাতে রাষ্ট্রের কোনো হাত ছিল না। ফলে, এখানে সরাফ ও মহাজন মুদ্রার ধাতুমূল্য নিরূপণ করত বা বিনিময় হার নির্ধারিত করত, কারণ বেশি ব্যবহারে মুদ্রার ধাতুক্ষয় হবার আশংকা থাকে। এছাড়া, সাধারণত যে সম্রাট রাজত্ব করতেন তাঁর রাজত্বে টাঁকশালে নির্মিত মুদ্রাকেই 'সিক্কা' বলা হতো। কিন্তু রাজা বদলের সঙ্গে সঙ্গেই আগের রাজার আমলে চালু 'সিক্কা' টাকার মূল্য কমে যেত এবং সরাফদের বাট্টা দিয়ে সেটা নতুন 'সিক্কা' টাকায় রূপান্তরিত করতে হতো। বাংলাদেশে প্রতি ৩ বছরে 'সিক্কা' টাকা 'সনত্'তে পরিণত হতো এবং তার মূল্য কমে যেত।

এছাড়া বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় মুদ্রাও কিছু কিছু প্রচলিত

ছিল। বাংলায় 'আর্কট' টাকা প্রচুর আসত এবং সেগুলোর বিনিময় হার ঠিক করার ভারও ছিল সরাফদের ওপর। নিছক মহাজন ও নিছক সরাফদের কথা মনে রেখেও বলা যেতে পারে যে, ক্রমশই একই লোক দুটি কাজে নিয়োজিত হতো এবং কাঁচা টাকার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই মহাজন তার ক্ষমতা গড়ে তুলেছিল। মুদ্রাব্যবস্থা এর প্রধান সহায়ক ছিল। সপ্তদশ শতকে রৌপ্য মুদ্রাই ভারতে প্রধানত চালু ছিল। এর সঙ্গে ইয়োরোপ থেকে বিপুল রৌপ্য আমদানির সম্পর্ক থাকতে পারে।

[মুঘল মুদ্রা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য—Hodivala : *Historical Studies in Mughal Numismatics*. Calcutta 1933. Irfan Habib : "Monetary System and Prices", In : *The Cambridge Economic History of India*, vol. 4, পূর্বোল্লিখিত। N. K. Sinha : *Economic History of Bengal*, vol. I, chap. 8. Calcutta. 1965]

—